আমার জন্মভূমিঃ স্মৃতিময় বাঙলাদেশ

ধনঞ্জয় দাশ

নিবেদন

আমার মত একজন সামান্য কর্মীর এবং নগণ্য সংস্কৃতিসেবীর 'স্মৃতিকথা' লেখার সার্থকতা কি, এ-প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই উঠতে পারে। কিংবা, আয়ুর যে-সিঁড়িতে পা ডুবিয়ে একজন সার্থক মানুষ স্মৃতি-চারণায় আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, সেই পক্ককেশ বৃদ্ধের দলেও আমি নই। তবু জীবনে বোধ হয় এমন এক-একটা সময় আসে যখন সব হিসেব ভণ্ডুল হয়ে যায়। ঠিক এমনি এক মুহূর্তে, পঞ্চাশ না-পেরুতেই, মধ্য-চল্লিশে প্রবেশ করে যা কোনো দিন কল্পনা করি নি, সেই কাজে আমাকেও হাত লাগাতে হলো। স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাঙলাদেশের উজ্জ্বল মূর্তি সম্মুখে রেখে, পুনর্বার আত্মানুসন্ধানে অগ্রসর হয়ে আমাকেও লিখতে হলো আমার জন্মভূমির স্মৃতিময় অতীত ইতিহাস।

চল্লিশের দশকের প্রারম্ভ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত পূর্ববাঙলার গণ-আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে কারাগারের মধ্যে এবং তার বাইরে আমি যে-সব দেশপ্রেমিক নেতা ও কর্মীর সংস্পর্শে এসেছিলাম, নিজের চোখে বিভাগ-পূর্ব এবং বিভাগোত্তর কালে বিভিন্ন দল, সংগঠন ও ব্যক্তিমানুষকে যে-ভূমিকা আমি পালন করতে দেখেছি, স্বাধীন বাঙলাদেশের সেই রাজনৈতিক পশ্চাৎপটকেই যথাসাধ্য নিরপেক্ষ মন নিয়ে আমি এই বইতে বিধৃত করতে চেয়েছি। আমার বিশ্বাস, আজকের স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাঙলা-দেশকে বুঝতে হলে বিভাগ-পূর্ব ও বিভাগোত্তর পূর্ববাঙলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পর্ব থেকে পর্বান্তর যাত্রার সেই অলিখিত ইতিহাস একান্তভাবে জানা প্রয়োজন। কারণ, একটা জাতির ইতিহাস হঠাৎ ক্রান্তি-কালকে স্পর্শ করে না ; শ্রেণী-মানুষের ক্রম-বিবর্তিত দ্বন্দ্ব-সংঘাতই তাকে পৌঁছে দেয় পরিমাণগত ও গুণগত উল্লম্ফনের সীমানায়। আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাঙলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

প্রকৃতপক্ষে, এই 'স্মৃতিকথা' রচনার সময় আমি কোনো গ্রন্থের সাহায্য বিশেষ একটা গ্রহণ করতে পারি নি। কারণ, পূর্ববাঙলার রাজনৈতিক আন্দোলনের যে-আদি পর্বের কথা আমি এই বইয়ে লিখেছি সে-সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোনো উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আমার দৃষ্টিগোচর হয় নি। আমার কারা-জীবনের স্মৃতি যে-পাঁচটি খাতায় লিপিবদ্ধ ছিল মূলত তার থেকেই সংগৃহীত

হয়েছে এই বইয়ের রসদ। আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী গীতা দাশ দীর্ঘ ১৭ বৎসর খাতা পাঁচখানি সযত্নে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। বস্তুত, তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতা ভিন্ন এ-বই লেখা সম্ভব হ'তো না। এ-ছাড়া রাজশাহী জেলের ঘটনা সম্পর্কে ঐ জেলের প্রাক্তন-বন্দী নিখিল ভারত অধ্যাপক সমিতির সম্পাদক শ্রীঅমিয় দাশগুপ্ত, বাঙলাদেশের প্রখ্যাত মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী শ্রীরণেশ দাশগুপ্ত, খুলনার প্রাক্তন ছাত্রনেতা শ্রীস্বদেশ বসু ও বগুড়ার তৎকালীন কৃষকনেতা শ্রীফটিক রায় আমাকে কিছু তথ্য সরবরাহ করে সাহায্য করেছেন। এঁদের কাছে আমি

আমার সৌভাগ্যবশত বাঙলাদেশের কিংবদন্তীর নায়ক প্রবীণতম কমিউনিস্ট নেতা শ্রীমণি সিং এবং আমার কারা-জীবনের বন্ধু শ্রীঅজয় রায়-এর সঙ্গেও অতীত রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে ইতিমধ্যে কিঞ্চিৎ আলোচনার সুযোগ ঘটেছে। তাঁরা দুজনেই অনেক বিস্মৃত কাহিনী আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে এই 'স্মৃতিকথা' রচনায় প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদের উভয়ের কাছেই আমি ঋণী।

এই বই লেখার সময় আমার বন্ধু-সাহিত্যিক শ্রীসত্যপ্রিয় ঘোষ, শ্রীমিহির সেন, শ্রীতরুণ সান্যাল এবং আরও অনেক শুভানুধ্যায়ী বন্ধু নানা পরামর্শ ও উৎসাহদানে আমাকে যেভাবে সাহায্য করেছেন তাও ভুলবার নয়। শ্রীমতী বেণু সোম কিছু তথ্য-দলিলের প্রতিলিপি রচনার কাজে এবং শ্রীশম্ভু মল্লিক প্রেসের কাজে সহায়তা দান করে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এই বই প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে 'মুক্তধারা'-র কর্তৃপক্ষ যে-স্বদেশপ্রেম, মুক্তবুদ্ধি-চেতনা এবং ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছেন তার কোনো তুলনা নেই। তাঁদের এই সৎ ভূমিকার কথা আমি শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণ করি।

পরিশেষে নিবেদন, কোনো বিশেষ দলের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয় এবং তা একক মানুষের সাধ্যাতীতও বটে। আমার জানা এবং সংগৃহীত এই তথ্যাদি ভবিষ্যতে যদি কোনো ঐতিহাসিক ও গবেষকের প্রয়োজন সিদ্ধ করে তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

ধনঞ্জয় দাশ

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রসঙ্গে

দুই বাঙলার সুধী পাঠকের সহৃদয়তায় এই বইয়ের দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হচ্ছে। কোন্ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে আমি এ-বই লিখতে শুরু করেছিলাম এবং মাত্র দু-মাসের মধ্যে কিভাবে এর প্রকাশ ঘটে প্রথম সংস্করণের 'নিবেদন'-অংশে তা কিঞ্চিৎ বিবৃত হয়েছে। বাঙলাদেশের মুক্তি-সংগ্রাম সে-সময় প্রবল আকার ধারণ করলেও তখনও তার সম্মুখে ছিল অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। কিন্তু সকল অনিশ্চয়তা এবং সকল সংশয়ের অবসান ঘটিয়ে এ-বই প্রকাশের দু-মাসের মধ্যেই বাঙলাদেশের মুক্তি-সংগ্রাম রক্তমূল্যে জয় করে এনেছে চরম সাফল্য। যা-ছিল আমার স্বপ্ন-কামনা, আজ তা পরম সত্য এবং বাস্তব ঘটনা। আর, এই মুক্তি-যুদ্ধের সফল পরিণতির জন্য আমার স্বদেশভূমি ভারতবর্ষ এবং মহান সোভিয়েত দেশের গৌরবময় অবদানের কথাও আজ আমি সগর্বে স্মরণ করি।

এইসব ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর তাৎপর্য ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করতে-না-করতেই বাঙলাদেশ থেকে সংবাদ এলো—মুদ্রিত বই নিঃশেষিত। পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশক-বন্ধুরাও জানালেন, তাঁদের কাছেও আর কোনো বই নেই। সুতরাং যা অবশ্যম্ভাবী তাই ঘটলো। প্রকাশক-বন্ধু আমাকে ভাবনা-চিন্তার কোনো অবকাশ না দিয়েই দ্বিতীয় মুদ্রণ শুরু করে দিলেন।

অথচ আমার ইচ্ছা ছিল, প্রথম প্রকাশকালে অতি-দ্রুততার জন্য এ-বইতে আমি যেসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ভালোভাবে সংযোজন বা বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারিনি দ্বিতীয় সংস্করণে সেই অভাব সাধ্যমত দূর করবো। বিশেষ করে রাজশাহী জেলের বন্দী-বন্ধুদের ঘটনাবহুল বৈপ্লবিক জীবনকে আরও বিস্তারিত-ভাবে প্রকাশ করা সত্যিই উচিত ছিল। একদা রাজবন্দী, কমরেড শান্তি সান্যাল, তাঁর তেরো পৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ চিঠিতে এ-সম্পর্কে যে-প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন ভবিষ্যতে তা কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি প্রদান ছাড়া দ্বিতীয় মুদ্রণ যেভাবে শেষ হচ্ছে তাতে অন্য কিছু করা আর সম্ভব নয়। এজন্য আমি সত্যিই দুঃখিত।

মূলত, দ্বিতীয় মুদ্রণে আমি কিছুই সংযোজন করতে পারলাম না। শুধুমাত্র প্রুফ দেখার সময় প্রথম সংস্করণের দু-একটি মুদ্রণ-প্রমাদ এবং সামান্য তথ্যঘটিত ত্রুটি-সংশোধন ভিন্ন আর কিছুই করার ছিল না। ইতিমধ্যে সংঘটিত কিছু

ঘটনাকে সর্বশেষ প্রাপ্ত-সংবাদের আলোকে তুলে ধরার জন্য আমাকে কয়েকটি পাদটীকা সংযোজনের বিড়ম্বনাই শুধু এবার সহ্য করতে হয়েছে। সুতরাং এ-বইকে প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় মুদ্রণ রূপে গ্রহণ করলেই আমি বাধিত হবো।

উভয় বাঙলার পাঠকেরা এবং সমালোচকগণ বইখানি সম্পর্কে যে-সদয় মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য আমি তাঁদের সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ। আমার প্রকাশক-বন্ধুর আন্তরিকতা এবং সহমর্মিতার কাছেও আমি ঋণী।

ধনঞ্জয় দাশ

এই অপরূপ রূপে তুমি
দেখা দেবে গরীয়সী
ওগো জননী,
আমি তা ভাবতে পারিনি।

তুমি এমন করে বজ্রানলে
জ্বালিয়ে দেবে সকল গ্লানি
মাগো,
আমি তা বুঝতে পারিনি।

তোমার মনের অসীম ক্ষমায়
মধুরতম ভালোবাসায়
চৈত্র-দিনে ঝড়ের হাওয়ায়
তুমি এমন করে ডাক পাঠাবে
মাগো,
আমি তা ভাবতে পারিনি
আমি তা বুঝতে পারিনি ॥

আমার জন্মভূমি : স্মৃতিময় বাঙলাদেশ

আমার জন্মভূমি পূর্ববাঙলা আজ স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাঙলাদেশ। তার আকাশে উড়ছে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির স্বপ্ন-রঙিন নতুন পতাকা। সবুজ জমিন, রক্তিম গোলক, আর তার মাঝখানে সোনালী রূপরেখায় উদ্ভাসিত সেই জন্মভূমি, আমার স্বপ্নঘেরা সোনার বাঙলাদেশ।

এই অপরূপ ভুবনভুলানো রূপের স্বপ্ন কি দেখেছি কোনোদিন? না, মানসলোকে তার স্পষ্ট কোনো রূপরেখা ছিল না। শুধু স্বপ্নের অস্পষ্ট আভাসে যতটুকু আভাসিত, তাই নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলাম সেদিন। তবু সেই অস্পষ্ট স্বপ্নই আমার কিশোর-মনকে আলোড়িত করেছিল। কিসের টানে, পূর্ববাঙলার আরও হাজার হাজার ছেলের মতো আমিও শামিল হয়েছিলাম পরাধীন ভারতের শৃঙ্খল-মুক্তির সাধনায়।

তারপর কত রূপান্তর। এলোমেলো ঝড়ো হাওয়া। আবার রূপান্তর। আগস্ট-বিপ্লবের স্বল্পস্থায়ী উন্মাদনা : আমরা নির্বিকার। জনযুদ্ধের জোয়ারের টান : আমরা তার পরিপ্রেক্ষিত ও তাৎপর্য-বিচ্ছিন্ন আবেগের শিকার। পঞ্চাশের মন্বন্তর, লক্ষ লক্ষ নিরন্নের হাহাকার, মৃত্যু, যুদ্ধ আর কালোবাজারী : আমরা সেই প্রথম ছারখার সোনার বাঙলার অস্তিত্বের অনেক কাছাকাছি। আর, এরই ফাঁকে আমাদের অসাবধানতার সুযোগে দ্বি-জাতি তত্ত্বের হাতিয়ার হাতে এই বাঙলাদেশে সর্বনাশা মুসলিম লীগের রাজনীতির বিপুল বিস্তার। না,

শুধু আমাদের অসাবধানতা নয়, আমাদের অপরিণত মার্কসীয় জ্ঞানের অপরিণামদর্শী সক্রিয় সহযোগিতায় মুসলিম লীগের পাকিস্তান তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করার পথ আমাদের হাতেই সেদিন প্রশস্ততর।

তারপর দৃশ্যান্তর। পুনর্বার রূপান্তর। যুদ্ধ শেষ। নতুন উন্মাদনা। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ। রশিদ আলি দিবস। নৌ-বিদ্রোহ। টালমাটাল ভারতবর্ষ। শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের দুর্বার গণ-সংগ্রাম। উনত্রিশে জুলাই। চতুর ব্রিটিশের চালে কংগ্রেস-লীগের ব্যর্থ মি..ন-প্রয়াস। তারপর দাঙ্গার আগুন। ধর্মীয় উন্মাদনা। বিপন্ন মনুষ্যত্ব। আর এরি ফাঁকে দ্বি-জাতি তত্ত্বের খড়্গে দ্বি-খণ্ডিত ভারতভূমি। আপোষকামী জাতীয় নেতৃত্বের চরম বিশ্বাসঘাতকতা। ১৯৪৭ সাল, ১৫ই আগস্ট। রক্ত আর অশ্রুর সাগরে স্নান করে ভারত আর পাকিস্তান—এই দুই রাষ্ট্রের জন্মদিন ঘোষণা।

এই তো আমার কৈশোর-যৌবনের একান্তভাবে জানা প্রথম সাতটি বছরের সংক্ষিপ্ততম রাজনৈতিক ইতিহাস। আমার স্মৃতিতে এর প্রতিটি পর্ব এখনো জীবন্ত। আমি যেন হাত বাড়ালেই এর সব কিছু আজও স্পর্শ করতে পারি। কিন্তু আমার কৈশোর-স্বপ্নে যে-শৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীন সার্বভৌম জন্মভূমির অস্পষ্ট আভাস ছিল, দ্বি-খণ্ডিত দুই ভৌগোলিক অবস্থানে কোথায় যেন হারিয়ে গেল সেই ছবি। অথচ আমরা মেনে নিলাম সব। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের দিয়ে মানিয়ে নেওয়া হলো। আমাদের অপরিণত রাজনৈতিক চেতনা, দলীয় শৃঙ্খলা, জাতিতত্ত্বের মার্কসীয় অপব্যাখ্যার কাছে নতি স্বীকার করলো। আমরা ভুলে গেলাম, শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে জাতিগঠনের ব্যাখ্যা অবৈজ্ঞানিক—বিভ্রান্তিকর। এই ভ্রান্তি অপনোদনে এগিয়ে এলেন না কোনো সত্যিকার মার্কসবাদী। কেউ আমাদের বলে দিলেন না জাতিগঠনের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা। বল্লেন না, একটা জাতি গঠনের জন্য চাই অখণ্ড ভৌগোলিক নির্দিষ্ট সীমারেখা, চাই অস্থি-মজ্জায় প্রবাহিত এক দীর্ঘ মানস-ইতিহাস, প্রয়োজন

একটা ভাষা, প্রবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আর অভিন্ন অর্থনৈতিক ভিত্তিভূমি। এই ভ্রান্তির চোরাপথে, ধর্মীয় উন্মাদনার জোয়ারে মুসলিম লীগ ভাসিয়ে নিয়ে গেল বিপুল জনগোষ্ঠীকে। উচ্চকোটি মুসলিম পুঁজিপতি, সামন্তপ্রভু আর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের অশুভ আঁতাতের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলো পাকিস্তান। আমার জন্মভূমির হৃৎপিণ্ড দ্বি-খণ্ডিত করে সেই প্রথম থেকেই পূর্ববাঙলার উপর চেপে বসলো পশ্চিম পাকিস্তানীদের নয়া ঔপনিবেশিক কৌশলের শাসন আর শোষণব্যবস্থা। আর ভ্রান্ত-বুদ্ধি মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী এই আমি, সেদিন সরল বিশ্বাসে আমার জেলা-শহর খুলনায় উড়িয়ে দিলাম পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় পতাকা। না, ১৫ই আগস্ট নয়। ১৫ই আগস্ট আমরা ছিলাম ভারত রাষ্ট্রে; র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদে ১১এ আগস্ট আমরা হলাম পাকিস্তানী। বলতে লজ্জা করছে, সেদিন খুলনা শহরে কংগ্রেস-লীগ-কমিউনিস্ট পার্টির মিলিত উৎসবের সাংস্কৃতিক উপসমিতির আমিই ছিলাম অন্যতম সম্পাদক। সত্যিই আজ আমি অতি লজ্জিত, অনুতপ্ত আর ক্ষমাপ্রার্থী। কেন-না, তেইশ বৎসর পরে আমাদের সেই ভ্রান্ত-ইতিহাসের মাশুল গুনছেন আমার জন্মভূমির প্রিয়-পরিজন-সহোদরেরা, সোনার বাঙলার নতুন প্রজন্মের সন্তান-সন্ততিগণ। অজস্র রক্তধারায় ওরাই আজ ধুয়ে-মুছে সাফ করছেন আমাদের পাপের ভস্মরাশি।

সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর সাল। এই দীর্ঘ চব্বিশ বছরের ইতিহাসের সবটা আমার প্রত্যক্ষগোচর নয়। এরপর মাত্র নয় বছর ছিলাম আমি আমার জন্মভূমি পূর্ববাঙলায়। আর বাকি পনের বছর আমি দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছি আমার বর্তমান স্বদেশভূমি —পশ্চিম বাঙলায়, যেখানে এখন মেকি বিপ্লবের পাণ্ডারা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে আত্মদানের পরিবর্তে আত্মহননের অশুভ প্রতিযোগিতায়।

কিন্তু এপার বাঙলার কথা এখন থাক। ১৯৪৭ সাল থেকে যে ৯ বছর আমি ছিলাম আমার জন্মভূমি ওপার বাঙলায়, সেই ৯ বছরের

স্মৃতি-ইতিহাস নতুন করে অনুসন্ধান করা যাক এবার। দেখি না, কোন্ সত্য-সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ আছে ইতিহাসের পুরনো পৃষ্ঠায়।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সেই ধূলি-ঝঞ্ঝায় আচ্ছন্ন দিনগুলি। চতুর জননেতা জিন্নাহ সাহেবের ধর্মীয় আফিং-এ নেশাগ্রস্ত মুসলিম জনতার বিরাট অংশ। তাদের মনে নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষা-উদ্দীপনা। এর সবই সত্যি। কিন্তু সেই ধর্মীয় উন্মাদনা ও সাম্প্রদায়িকতা মজলুম মুসলিম জনতা সর্বত্র সমানভাবে যে গ্রহণ করে নি, এটাও ছিল সত্যের অপর একদিক। মুসলিম লীগের গোঁড়া পাণ্ডারা পূর্ববাঙলার কোথাও কোথাও মুসলিম জনগণের নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সাম্প্রদায়িকতার পথে ঠেলে দিতে চেষ্টা করেছে, অঞ্চল বিশেষে সাময়িকভাবে সফলও হয়েছে; তবু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, পূর্ববাঙলার যেসব জেলায় গণ-আন্দোলনের ভিত্তি শক্ত ছিল, কৃষক-মজুর তথা মেহনতী মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ঐতিহ্য ছিল, সেখানে তারা বিশেষ সুবিধে করতে পারে নি। আর, ছাত্র-আন্দোলনের কর্মীরূপে এই সময় মুসলিম ছাত্রদের সঙ্গে কাজে নেমে দেখেছি—সাম্প্রদায়িক চেতনার চেয়ে তাদের অন্তরে প্রবাহিত ছিল মনুষ্যত্বেরই ফল্গুধারা। কখনো কখনো এই চেতনা ঘুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু শেষপর্যন্ত মুসলিম ছাত্র-বন্ধুদের মনুষ্যত্বই জয়ী হয়েছে। সাধারণ কৃষক-মজুর-মধ্যবিত্ত-ছাত্র জনতার কাছে আজাদীর অর্থই ছিল সুখী-সমৃদ্ধিশালী এক পাকিস্তান। অসাম্প্রদায়িক হিন্দু প্রতিবেশী ও বন্ধুদের এই সময় ওঁরা তাই বুক দিয়ে আগলেছেন। কমিউনিস্ট জুজুর ভয় দেখিয়েও লীগশাহীর অনুচরেরা সাধারণ মুসলিম, বিশেষ করে ছাত্র-জনতাকে আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে নি।

আজও মনে পড়ে ১৯৪৮ সালে মার্চ মাসের একটা দিনের কথা। ঐদিন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে মিঃ জিন্নাহ ঘোষণা করেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এর বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান

ছাত্রসমাজের একাংশের কণ্ঠে সেদিনই মৃদু প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল। শুনেছি, পরেরদিন কার্জনহলের সভায় আজকের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান-আরও কয়েকজন ছাত্রনেতার সঙ্গে মিলিত হয়ে মিঃ জিন্নাহ-র মুখের উপরেই ছুঁড়ে দিয়েছিলেন তাঁর প্রতিবাদ-মুখর কণ্ঠস্বর। পরে সমগ্র পূর্ববাঙলায় ছাত্রলীগ আর ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে বাঙলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে প্রবল আন্দোলনের স্রোত বয়ে যায়। সেই আন্দোলনে ফেরদৌস ভাই, আনোয়ার, আমজাদ, আজিজ, জহিরুল, হামিদ, জাহানালী, কেষ্ট, পরমেশ—আমরা সবাইতো একসঙ্গে ছিলাম। ধর্মের বন্ধন নয়, বাঙালি জাতির অস্তিত্ব রক্ষার মূল প্রশ্নে—বাঙলা ভাষার অধিকার রক্ষার সংগ্রামে সেদিন আমরা হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রীস্টান, সবাই এক হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের সেই সম্মিলিত প্রতিবাদের সম্মুখে পাকিস্তানের জনক প্রবল প্রতাপান্বিত মিঃ জিন্নাহকেও থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল। পাকিস্তানে, আমার জন্মভূমি পূর্ববাঙলায়, আজকের স্বাধীন বাঙালাদেশে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধিকার অর্জনের জন্য এটাই বোধহয় ছিল প্রথম গণসংগ্রাম। এই সংগ্রামের চরিত্র মূলত অসংগঠিত ছিল এটা ঠিক, কিন্তু তপ্ত আবেগে তা ছিল প্রাণবন্ত—এটাও অনস্বীকার্য।

এই সময়, ১৯৪৭-৪৮ সালে, ঢাকা পূর্ববাঙলার রাজধানীতে রূপান্তরিত হলেও কলকাতা তখনও আমাদের কাছে নি র রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রধানতম কেন্দ্রভূমি রূপে পরিচিত। সম্ভবত অবিভক্ত বাঙলার ঢাকা ডিভিশন ছাড়া প্রেসিডেন্সী ও রাজশাহী ডিভিশনের সকল জেলা কলকাতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে নির্ধারিত করতো তাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দৈনন্দিন কর্মধারা। যতদূর মনে পড়ছে, এই সময় ঢাকা থেকে একটা ইংরেজি পত্রিকা এবং 'সৈনিক' নামে একটি বাঙলা সাপ্তাহিক পত্রিকা ছাড়া অন্য কোনো দৈনিক বা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় নি। কিছুকাল পরে ঢাকা থেকে 'আজাদ'-এর

প্রকাশ শুরু হলেও কলকাতার জাতীয়তাবাদী দৈনিকপত্রসহ জনাব আকরাম খাঁ-র 'আজাদ' ও জনাব সুহ্‌রাবর্দি প্রতিষ্ঠিত 'ইত্তেহাদ' প্রভৃতি মুসলিম-পরিচালিত সংবাদপত্রের মূল কার্যালয় তখনও পর্যন্ত কলকাতায় অবস্থিত। এমন কি, সাহিত্য-মাসিক 'সওগাত' কিংবা 'মোহাম্মদী'ও এই সময় কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হচ্ছিল।

অথচ, দেশ-বিভাগের পর পূর্ববাঙলার শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত-সহ সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিদের এক বিরাট অংশ দেশত্যাগ করতে থাকায় ওখানে শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে সাময়িকভাবে দেখা দেয় বেশ বিশৃঙ্খলা ও শূন্যতার ছায়া। এই বিরাট শূন্যতা পূর্ণ করার মতো সাধ্য ছিল না সে-সময় শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে পশ্চাৎপদ পূর্ববাঙলার মুসলিম সম্প্রদায়ের। কিন্তু শিক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায়ের উদারপন্থী অংশ আর জাগ্রত ছাত্র ও যুবশক্তি কি চুপ করে বসেছিলেন? অভিজ্ঞতা সে-কথা স্বীকার করে না। বিশেষ করে এই সময় কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক কর্মধারায় মিলিত উদ্যোগ গ্রহণে এগিয়ে এসেছিলেন পূর্ববাঙলার তৎকালীন বহু বিশিষ্ট মুসলিম বুদ্ধিজীবী এবং তরুণ ছাত্র ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মী-বন্ধুরা। পূর্ববাঙলার সমস্ত জেলার খবর রাখা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু আমি জানতাম এবং পরবর্তীকালেও জেনেছি, ঢাকার বিশিষ্ট মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী রণেশ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেন, অনিল মুখার্জি, অজিত গুহ প্রভৃতি আরও অনেকেই তৎকালীন তরুণ বুদ্ধিজীবী সরদার ফজলুল করিম, মুনীর চৌধুরী, আবদুল্লাহ আলমুতি প্রমুখের সহযোগিতায় ঢাকায় তখন গড়ে তুলতে চেষ্টা করছেন এক গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন। এঁদের এই কর্ম-প্রচেষ্টায় সেদিন সানন্দে সহযোগিতা করেছিলেন প্রবীণ সংস্কৃতিসেবী ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলি, বেগম সুফিয়া

কামাল, শওকত ওসমান আর তরুণ সাংস্কৃতিক কর্মী আলাউদ্দীন আল্ আজাদ, হাসান হাফিজুর রহমান প্রমুখ আরও অনেকে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন বোধ করছি। প্রখ্যাত কবি জসিম উদ্দিনকে নিয়ে এপার বাঙলায় আজকাল প্রচুর আবেগ-উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হতে দেখি। কিন্তু পূর্ববাঙলার এই সঙ্কটময় মুহূর্তে কবি জসিম উদ্দিন-এর কোনো সদর্থক ভূমিকার কথা আমার অন্তত মনে পড়ে না। জসিম উদ্দিনের বিশেষ কবি-কৃতিত্ব সম্পর্কে আমি ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা পোষণ করলেও তাঁর সুবিধাবাদী ভূমিকার কথাও আমি ভুলতে পারি না। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী হিসেবে আমরা এই সময় তাঁকে দেখেছিলাম লীগশাহীর সেবক রূপে।

যাহোক, যে-কথা বলছিলাম সেখানেই ফিরে যাই আবার ঢাকার মতো পূর্ববাঙলার অন্যান্য জেলাতেও সেই দুঃসময়ে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবীরা অব্যাহত রাখতে চেষ্টা করছিলেন হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত বঙ্গ-সংস্কৃতির ঐতিহ্যধারা। বাধা ছিল। গোঁড়া মুসলিম লীগপন্থীদের বিভেদ-প্রয়াস এবং অপপ্রচারও কম ছিল না। কিন্তু মুক্তবুদ্ধি প্রবীণ ও নবীন সাংস্কৃতিক কর্মীরা সেই বাধার প্রাচীর ঠেলে এগিয়ে যেতেও কসুর করেন নি।

আমার জেলা খুলনাতেও সঞ্চয় করেছি একই অভিজ্ঞতা। সবুর খানের মতো কূটবুদ্ধি সুবিধাবাদী চরিত্রের রাজনৈতিক নেতার যেমন অভাব ছিল না, তেমনি আবদুল হাকিম-এর ন্যায় উদার-হৃদয় সংস্কৃতিবান পুরুষেরও সাক্ষাৎ পেয়েছি ঐ শহরে। সবুর সাহেবের শেষ পরিণতি জঙ্গী-একনায়ক আয়ুব খাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যরূপে আর জনাব আবদুল হাকিমই ছিলেন পূর্ববাঙলার পরিষদীয় গণতন্ত্রের প্রধানতম রক্ষক, সর্বশেষ স্পীকার।*

---

* বাঙলাদেশে মুক্তি-সংগ্রাম শুরু হলে যে-বিশ্বাসঘাতকের দল [illegible]রপশু ইয়াহিয়ার পক্ষাবলম্বন ক'র এই সবুর খান তাদের অন্যতম। সম্প্রতি স্বাধীন বাঙলাদেশ সরকার যে-চোদ্দজন বিশ্বাসঘাতকের তালিকা প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে এই নামটিও ঘোষিত হয়েছে। —লেখক

সত্যিকথা বলতে কি, জনাব আবদুল হাকিম-এর মতো বিদগ্ধ সাহিত্য-রসিক পণ্ডিত আমি খুব কম দেখেছি। সুফী আর বৈষ্ণব দর্শন, শেকস্‌পীয়র আর রবীন্দ্র-সাহিত্যে তাঁর ছিল অনায়াস-স্বচ্ছন্দ অধিকার। এমন বাগ্মীও কোটিকে গুটিক মেলে। অবিভক্ত বাঙলার আইনসভার কথা যাঁদের মনে আছে সেই প্রবীণ ব্যক্তিরা স্মরণ করতে পারবেন বাগ্মী আবদুল হাকিম-এর কথা। ইনি ছিলেন স্বনামধন্য স্পীকার জালালউদ্দিন হাসেমী, সৈয়দ নৌসের আলি প্রমুখের সহকর্মী, জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতা। দেশ-বিভাগের আগে এবং পরে আমি যখনি এঁর কাছে কোনো সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রার্থনা করেছি ইনি সানন্দে তাতে সাড়া দিয়েছেন। বিশেষ করে ১৯৪৭-৪৮ সালে এঁর সহযোগিতার কথা আমি ভুলবো না কোনোদিন।

কী করে ভুলবো আনোয়ার হোসেন, ফকরুদ্দিন, শামসুর, জাহানালী, জহীরুল আলম প্রভৃতি আমার সহপাঠী-সহকর্মী বন্ধুদের কথা। বিভাগোত্তর পূর্ববাঙলার একটা শহরে মানবধর্মী গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পরিচর্যায় আমার পাশে দাঁড়িয়ে এঁরাই তো পালন করেছিলেন ধাত্রীর ভূমিকা। শুনলে আশ্চর্য লাগবে, সম্ভবত আমরাই সমগ্র পূর্ববাঙলার মধ্যে দেশভাগের পর মফঃস্বল শহর থেকে সর্বপ্রথম মাসিক-পত্রিকা প্রকাশ করেছিলাম। অন্তত ঢাকা থেকে আগত দৌলতপুর কলেজে সদ্য যোগদানকারী অধ্যাপক-বন্ধু মুনীর চৌধুরী* ১৯৪৮ সালে এই পত্রিকা হাতে পেয়ে আমাকে উপরোক্ত কথাই বলেছিলেন।

এটা আমাদের কোনো খেয়াল-খুশির ব্যাপার ছিল না। পূর্বে যে-সাংস্কৃতিক শূন্যতার কথা উল্লেখ করেছি, সেই শূন্যতাকে পূর্ণ

* পরবর্তীকালে মুনীর চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা সাহিত্যের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ঢাকায় পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণের প্রাক্কালে তিনি আরও অনেক বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে নিহত হয়েছেন কুখ্যাত আলবদর বাহিনীর হাতে। আমার কাছে এ-এক মর্মন্তুদ সংবাদ।

—লেখক

করার ব্রতে সাধ্যমত এগিয়ে এসেছিলেন পূর্ববাঙলার নবজাগ্রত বন্ধুরা। স্পষ্ট মনে পড়ে, 'সপ্তর্ষি' পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন প্রায় যখন সমাপ্ত তখন আমরা জানতে পারলাম খুলনা শহরে জজ হয়ে এসেছেন একজন মুসলিম সাহিত্যিক। নাম তাঁর আবতুল মওতুদ। কয়েক মাস আগে সংবাদপত্রে এঁর মৃত্যু-সংবাদ পাঠ করেছি। এবং সেই সূত্রেই জেনেছি, ইনি হাইকোর্টের বিপারপতি এবং ঢাকা বাঙলা একাডেমীর চেয়ারম্যান রূপে তাঁর শেষ দায়িত্ব পালন করেছেন। যাহোক, খুলনায় মওতুদ সাহেবের আগমন সংবাদ জানার পর আমরা তখনই ছুটলাম তাঁর কাছে। তিনি সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হতে রাজী হলেন আর স্বেচ্ছায় আমাদের হাতে তুলে দিলেন একশত টাকা। খুলনা গার্লস কলেজের অধ্যাপক পৃথ্বীশ নিয়োগী (বর্তমানে বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক) আর আমি হলাম সম্পাদক। এই পত্রিকা প্রকাশে আরও তুইজন বন্ধুর অবদান উল্লেখযোগ্য। এর একজন অরবিন্দ ভৌমিক (ইনি বর্তমানে প্রকাশন-সংস্থা 'রূপরেখা'-র কর্ণধার) অন্যজন চিত্তরঞ্জন পাল (বর্তমানে গোবরডাঙ্গা কলেজের অধ্যাপক)। সেই 'সপ্তর্ষি' পত্রিকায় লিখলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু (সম্ভবত সমরেশ বাবুর তৃতীয় গল্প। গল্পের নাম 'বিনিময়'। পটভূমি ঃ দেশ-বিভাগ), সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, প্রজেশ রায়, মৃগাঙ্ক রায়-সহ আজকের খ্যাতিমান অনেক সাহিত্যিক। এইভাবে, অনুমান করতে পারি, প্রথম থেকেই পূর্ববাঙলার বিভিন্ন জেলা-শহরে বিপর্যয়ের মধ্যেও সুস্থ সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত রাখতে সচেষ্ট ছিলেন হিন্দু-মুসলিম সাংস্কৃতিক কর্মীরা, বিশেষ করে কমিউনিস্ট ও অন্যান্য প্রগতিশীল গণ-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সহযোদ্ধারা।

কিন্তু এই সময় রাজনৈতিক দিক থেকে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যায়। ১৯৪৮ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তই কমিউনিস্ট

পার্টিকে ঠেলে দেয় হঠকারী রাজনীতির পথে। যে-স্বাধীনতাকে আমরা স্বাগত জানিয়েছিলাম, এক বছর না-যেতেই সেই আজাদী 'ঝুটা' হয়ে গেল! আমরা "মার্কসীয় বৈপ্লবিক তত্ত্বে" পাক-ভারত উপমহাদেশে সৃষ্টি করতে চাইলাম এক সশস্ত্র বিপ্লব। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, পাক-ভারত উপমহাদেশের তৎকালীন বাস্তব পরিস্থিতিতে আমাদের সেই বৈপ্লবিক তত্ত্ব অবাস্তব অতি-বিপ্লবী হঠকারিতা ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টি পরবর্তীকালে বহু ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়ে তাঁদের অনুসৃত এই ভ্রান্ত নীতির অসারতা বুঝতে পারেন এবং সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার মাধ্যমে হঠকারিতার পথ থেকে সরে এসে পার্টি-সংগঠনকে পুনর্বার সঠিক পথে পরিচালনা করতে সচেষ্ট হন।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ সাল—প্রায় তিন বছর এই হঠকারী নীতির সুযোগে উভয় দেশের শাসকগোষ্ঠী পাক-ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উপর চালায় প্রচণ্ড দমননীতির দুর্বিষহ স্টীম রোলার।

স্পষ্ট মনে পড়ে, কলকাতায় পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের (ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮) অব্যবহিত পরেই কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয় এবং পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন গণ-সংগঠনের নেতা ও কর্মীর এক বিরাট অংশ নিরাপত্তা আইনে বন্দী হন, কিংবা গ্রেপ্তার এড়িয়ে আত্মগোপন করে চলতে থাকেন। একটু বিলম্বে হলেও পূর্ব-বাঙলাতেও নেমে আসে একই দমননীতি। পূর্ববাঙলার নেতৃস্থানীয় কমরেডরা গ্রেপ্তার হতে থাকেন; আত্মগোপনে বাধ্য হন অনেক নেতা। এই সময় ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি, অন্য আর তিনজন কমরেড সহ আমাকেও বিনাবিচারে বন্দী করা হয়। কমরেড অনিল বিশ্বাস, নেপাল দাশ, গোষ্ঠ রাহা আর আমি—খুলনা জেলায় আমরাই বোধহয় লীগশাহীর প্রথম শিকার। আমরা কারারুদ্ধ অবস্থাতেই খবর পেলাম, খুলনার কৃষক-আন্দোলনের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র শোভনা-অঞ্চলে খুন হয়েছে লীগশাহীর অনুচর, কুখ্যাত জামাল

ফকির। ফলে, ঐ অঞ্চলে দমননীতি চরমে উঠলো। একে একে বহু কমরেডকে গ্রেপ্তার করে আনা হলো জেলখানায়। অকথ্য শারীরিক নির্যাতনের অমানুষিক চিহ্ন তাঁদের সর্বাঙ্গে। কমরেড স্বদেশ বসু, অনিল হালদার, পুলিন বিশ্বাস প্রমুখের সেই নিষ্ঠুর নির্যাতনে পঙ্গুপ্রায় চেহারা এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে। শুধু খুলনা নয়, পূর্ববাঙলার সব জেলাতেই অনুষ্ঠিত হচ্ছিল অনুরূপ ঘটনা। প্রগতিশীল গণ-আন্দোলন দমনে মরীয়া হয়ে উঠছিল প্রতিক্রিয়াশীল লীগ-সরকার। মূলত কমিউনিস্ট পার্টিই ছিল তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু।

১৯৪৮ সালের শেষ দিকে জেল থেকে মুক্ত হয়ে দেখলাম অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে। চতুর্দিকে আতঙ্কিত পরিবেশ। দেশত্যাগের হিড়িক। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনের নেতা ও কর্মীদের বিরাট অংশ ইতিমধ্যে পূর্ববাঙলা ছেড়ে চলে গেছেন পশ্চিম বাঙলায়। অনেক পরিচিত পরিবার দেশত্যাগে উদ্যত। এই পরিবেশে মুসলিম লীগ হিন্দু-বিদ্বেষ প্রচার করলেও সাধারণ মুসলিম জনতাকে তখনও তারা ব্যাপকভাবে বিভ্রান্ত করতে পারে নি। আমাদের পরিচিত মুসলিম লীগের ছাত্র ও যুব-কর্মীদের সঙ্গে হৃদ্যতার সম্পর্ক তখনও অটুট। এই সময় মাঝে মাঝে পুলিশী হামলা এড়াবার জন্য আমাকে কয়েকবার আশ্রয় দিয়েছেন বন্ধুবর শামসুর রহমান, তাঁদের বাড়ীতে। সে-সব সময়ে ওর মা আর বোন কত যত্ন করে যে খাওয়াতেন, সে-কথা ভুলবো না কোনোদিন। শামসুরের দাদা—ফেরদৌস ভাই এককালে ছাত্র-ফেডারেশন করতেন; দেশ-বিভাগের সময় তিনি ছিলেন শহর মুসলিম লীগের নেতা।. কিন্তু তাঁর বাড়ীতে, অন্দর মহলেও আমার ছিল অবারিত গতি। এমনি অনেক মুসলিম বন্ধুর প্রীতি আর ভালোবাসায় ধন্য হয়েছে আমাদের জীবন।

এরপর কিছুকাল আমি কলকাতায় কাটাতে বাধ্য হই। ১৯৪৮

সালের শেষ দিকে কলকাতায় এসে এখানেই জড়িয়ে পড়ি রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে। অস্থির-উত্তেজনাময়, বুলেট-বারুদের গন্ধে ভরা সে-সব দিনের স্মৃতি নিশ্চয় স্মরণে আছে অনেক বন্ধুর। ১৯৪৯-৫০ সাল, এই তুই বছর পূর্ববাঙলায় গোপনে তু-একবার যাতায়াত করলেও আমার সঙ্গে ওখানকার রাজনৈতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দমননীতির দাপটে এ-সময় খুলনায় পার্টির বৈধ কাজকর্ম প্রায় বন্ধ। তু-চার জন পরিচিত পার্টি-কমরেড ছাড়া প্রকাশ্যে কেউ নেই তখন। এই অবস্থায় আমি কলকাতার কাজের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে পড়ি। ১৯৫০ সালে আবার গ্রেপ্তার। প্রেসিডেন্সী জেলে বিচারাধীন বন্দী রূপে কয়েক মাস কাটাবার পর জামিনে মুক্ত, পরে বে-কসুর খালাস।

এই তুই বছরে পশ্চিম বাঙলায় আমাদের হঠকারী রাজনীতির জন্য বলি-প্রদত্ত হয়েছেন অনেক কমরেড। পূর্ববাঙলাতেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। ময়মনসিংহের হাজং এলাকা, শ্রীহট্টের বিয়ানী-বাজার, রাজশাহীর নাচোল, খুলনার কালশিরা আর ধানিবুনিয়ায় পুলিশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নিহত হয়েছেন বহু কমরেড, গ্রেপ্তার বরণ করেছেন অসংখ্য নেতা ও কর্মী। একে একে জানতে পেরেছি—আত্মগোপন করে কাজ করার সময় আমার সহপাঠী-বন্ধু কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল-মৃত্যুর সংবাদ এবং রাজশাহী জেলে গুলিতে অন্যান্য বন্দী-সহযোদ্ধাদের সঙ্গে আমার কৈশোর-যৌবনের প্রিয় বন্ধু, সত্যিকারের প্রতিভাধর ছাত্রনেতা আনোয়ার হোসেন-এর অকাল বিনষ্টির কথা। আর এই সেদিন, ১৯৭১ সালের ১১ই এপ্রিল, স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলাদেশে ফ্যাশিস্ত-জল্লাদ ইয়াহিয়া খানের পঞ্চম বাহিনী, লীগের গুণ্ডারা হত্যা করেছে যে-কিংবদন্তীর নায়ককে, খুলনার সেই প্রিয়তম কৃষক-নেতা বিষ্ণু চ্যাটার্জীসহ আরও অনেকের গ্রেপ্তারের সংবাদ এই কলকাতায় বসেই শুনেছি সে-সময়। হৃদয়-বিদারক এক-একটা সংবাদ। বিচলিত হয়েছি। হাহাকার করে উঠেছে মন। কিন্তু আমিও তো তখন এ-বাঙলায় অন্য এক ঝড়ের সঙ্গী। চোখের সামনেই নিত্য

দেখেছি বুলেটে-বোমায় ছিন্নভিন্ন প্রিয়জনের মৃতদেহ। কংগ্রেসী-সরকারের মারণ-যজ্ঞে গীতা-অমিয়া-লতিকা-প্রতিভার আত্মাহুতির সেই বীভৎস দৃশ্য, চোখ বুজলে তখনও যে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি! আর যেহেতু জানতাম, একই ভবিতব্য আমার জন্যও অপেক্ষমান, সেইহেতু বিচলিত হলেও সান্ত্বনার আশ্রয়ভূমি খুঁজে পেয়েছে মন।

১৯৫০ সাল আমাদের রাজনৈতিক-ইতিহাসে সত্যিই একটা স্মরণীয় বৎসর। মুসলিম লীগ ১৯৪৬ সালে যা করতে পারে নি, দেশ-বিভাগের পর প্রাণপণ চেষ্টা করেও যা করা তাদের পক্ষে ব্যাপক ভাবে সম্ভব হয় নি, ১৯৫০ সালে সেই অসম্ভবকেই তারা সম্ভব করলো। সাম্প্রদায়িক বিষ-বাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে উঠলো পূর্ববাঙলার বাতাস। দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে পড়লো পূর্ববাঙলার বিভিন্ন জেলায়। বরিশাল-ঢাকা-ফরিদপুর-কুমিল্লা-নোয়াখালি-ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় নারকীয় হত্যালীলা সংঘঠিত হলো। আতঙ্কিত লক্ষ লক্ষ হিন্দু জন্মভূমি ছেড়ে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করলো। উগ্রপন্থী লীগ-নেতারা ধর্মান্ধ মৌলবী-মওলানার সহযোগিতায় এই প্রথম সাধারণ মুসলমানকে বিভ্রান্ত করে দাঙ্গার পথে টেনে নিয়ে যেতে পারলো। ফাটল ধরাতে সক্ষম হলো হিন্দু-মুসলমান সাধারণ কৃষক-শ্রমিকের মিলিত সংগ্রামের ঘাঁটি গুলিতেও। পশ্চিম বাঙলাতেও এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা আবার মাথা চাড়া দি উঠলো। এখানেও জ্বলে-পুড়ে খাক হলো বহু মুসলিম ভাইয়ের সুখের সংসার। পশ্চিম বাঙলার মুসলমানদের এক ব্যাপক অংশ চোখের জলে জন্মভূমির মাটি সিক্ত করে পাড়ি জমালেন পূর্ববাঙলায়।

এই অন্ধকার দিনগুলির স্মৃতি আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। একমাত্র সান্ত্বনা, সেই দুর্যোগময় দিনগুলিতে দমননীতির রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে উভয় বাঙলার কমিউনিস্ট নারীরাই বীরত্বের সঙ্গে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এই দাঙ্গার বিরুদ্ধে।

এই বছরেই পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক মত ও পথের মারাত্মক বিচ্যুতিগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আন্তর্জাতিক পার্টির হস্তক্ষেপের পর শুরু হয় আন্তঃপার্টি সংগ্রাম। সে আর এক বেদনাদায়ক স্মৃতি!

১৯৫০ সালের শেষ দিকে আন্তঃপার্টি সংগ্রাম-পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে দমননীতির আঘাতে পর্যুদস্ত পার্টির গণ-সংগঠনগুলিকেও গড়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু হয়ে যায়। এই সময় 'পরিচয়' পত্রিকার পরিচালন-ব্যবস্থার সঙ্গে মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও সুশীল জানার সঙ্গে আমি যুক্ত হই। এর কিছু পরে, হাইকোর্টের রায়ের পর 'স্বাধীনতা' পত্রিকা পুনঃ প্রকাশিত হলে আমি স্টাফ রিপোর্টার রূপে 'স্বাধীনতা'তেই যোগদান করি।

কিন্তু ভাগ্য আবার আমাকে টেনে নিয়ে গেল আমার জন্মভূমি পূর্ববাঙলার মাটিতে। ১৯৫১ সালের মার্চ মাস। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত এক পারিবারিক প্রয়োজনে আমি কিছুদিনের জন্য ছুটি নিয়ে চলে গেলাম খুলনায়। তারপর কলকাতায় ফেরার পথে, ১৯৫১ সালের ৫ই এপ্রিল খুলনা শহরে হঠাৎ গ্রেপ্তার হলাম।

এই সময় থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ঢাকা আর রাজশাহীর কেন্দ্রীয় কারাগারে দীর্ঘকাল রাজনৈতিক বন্দীরূপে ধীরে ধীরে যে-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, পূর্ববাঙলার অসংখ্য জননেতা ও কর্মীর সংস্পর্শে এসে আন্দোলনের এক এক পর্যায়ে উপলব্ধি করেছি যে-সত্য, আজকের স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাঙলাদেশ তো সেই সত্যেরই মূর্ত বিগ্রহরূপে এখন আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। না, আমি হয়তো বাড়িয়ে বলছি। এতটা উপলব্ধি করার ক্ষমতা আমার ছিল না। একটা ঐতিহাসিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে, নানা ঘাত-প্রতিঘাত, অনেক বন্ধুর পথ অতিক্রম করেই তো পূর্ববাঙলা আজ

স্বাধীন বাঙলাদেশ! বাঙালি জাতির রক্তক্ষত সেই ইতিহাসের কতটুকুই-বা জানি আমি, বিশেষ করে ১৯৫৬ সালের পর?

১৯৫১ সালে ঝম্ ঝম্ বর্ষার ঝাপসা দিনে, পদ্মা-মেঘনা পাড়ি দিয়ে, সান্ত্রীর পাহারায় হাতে হাতকড়া নিয়ে আমি যখন স্টীমারযোগে পৌঁছালাম নারায়ণগঞ্জ এবং সেখান থেকে ট্রেন আর রিক্সায় চেপে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে, তখন কি আমি ভাবতে পেরেছিলাম কোনো সূর্য-সম্ভাবনার কথা?

সত্যিই মন তখন হতাশাগ্রস্ত। পূর্ববাঙলায় লীগশাহীর দাপটে সে-সময় নেমে এসেছে এক অন্ধকার যুগ। পঞ্চাশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ব্যাপক বাস্তুত্যাগ, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের বিপুল সংখ্যায় গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে মুসলিম লীগ তখন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতিরোধে বদ্ধপরিকর। এই পরিবেশে অতি আশাবাদীর মনেও হতাশা ছাড়া আর কি অবশিষ্ট থাকতে পারে? আমিও এই মন নিয়ে প্রবেশ করলাম ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে। পুরনো চেনাপরিচিত বন্ধুদের সঙ্গে অনেক অপরিচিত বন্ধুরও দেখা পেলাম সেখানে। 'নতুন বিশ' সেল-এর আস্তানায় আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন কারাবাসী বন্ধুরা। নারায়ণগঞ্জের বেণু ধর (বর্তমানে কলকাতা কর্পোরেশনের সি. পি. আই. দলের কাউন্সিলার), মেহেরপুরের মাধবেন্দু মোহান্ত (ত্রিপুরার সি. পি. এম. দলের প্রাক্তন এম. এল. এ.) চট্টগ্রামের হাসি দত্ত, কুষ্টিয়ার জঙ্গী-শ্রমিক গারিসউল্লা, শিবানী আচার্য, ঢাকার ছাত্রনেতা তকিউল্লাহ (শ্রদ্ধেয় ডঃ শহীদুল্লাহ-র পুত্র) কুমিল্লা-ত্রিপুরার যোগব্রত সেন, আমার সহ-পাঠী-বন্ধু গোপীনাথ ব্যানার্জী, শ্রীহট্টের তরুণ ছাত্রকর্মী বিজন পুরকায়স্থ, রংপুরের শচীন রায়, দিনাজপুরের কমিউনিস্ট নেতা সুশীল সেন (ইনি বোধহয় ভাষা-আন্দোলনের পরে আমাদের সঙ্গে মিলিত হন) প্রভৃতি আরও অনেক কমরেডকে। যে আমাদের 'নতুন বিশ' সেল-এর নরক তখন গুলজার। কিন্তু এ-সময় এঁদের কারুর চোখে-

মুখে আশার তেমন কোনো দীপ্তি দেখেছি বলে মনে পড়ে না। বরং বাইরের জীবনের মতোই জেলখানার জীবনও তখন বিপর্যস্ত। বিশেষ করে যে-সব কমরেড জেল-জীবনে ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টির অনুসৃত সেই হঠকারী রাজনীতির শামিল হয়েছেন, ১৯৪৯-৫০ সালের দীর্ঘ অনশন আর জেলের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের বিরাট এক অংশ ভুল-ভ্রান্তির প্রতিক্রিয়ায়, বাইরের প্রায় সকল যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন অবস্থায়, নিষ্ঠুর কারা-নির্যাতনে তিক্ত-বিরক্ত এবং মনের দিক থেকে হতাশায় পীড়িত। এমনকি ব্যক্তিগত মানবিক সম্পর্কও সে-সময়কার জেল-জীবনে অনেক পরিমাণে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

ঢাকা জেলে ১৯৫০-৫২-তে যে সব রাজবন্দী ছিলেন তাঁদের প্রধানত পাঁচটি ভিন্ন জায়গায় রাখা হয়েছিল। আমরা যেমন ছিলাম 'নতুন বিশ' সেল-এ, তেমনি 'পুরনো বিশ' সেল-এ ছিলেন 'সাম্য-বাদের ভূমিকা'-র লেখক ঢাকার প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা অনিল মুখার্জি, ময়মনসিংহের ছাত্রনেতা অজয় রায়, শ্রীহট্টের কৃষকনেতা অজয় ভট্টাচার্য, সুরথ পাল এবং খুলনার মাণিক দাশ সহ প্রায় কুড়ি জন রাজবন্দী।

জেনারেল ওয়ার্ডের বিশাল হলঘরে ছিলেন সব চাইতে বেশি কমরেড। সংখ্যাটা বোধহয় ৫০-৬০ হবে। এঁদের মধ্যে ছিলেন ঢাকার কমিউনিস্ট নেতা জ্ঞান চক্রবর্তী, বরিশালের কমিউনিস্ট নেতা হীরালাল দাশগুপ্ত,* মুকুল সেন, নলিনী দাশ, খুলনার রতন সেনগুপ্ত, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল, যশোহরের কৃষকনেতা অমল সেন (বাসু সেন), হেমন্ত সরকার, বটু দত্ত, রংপুরের ধীরেন ভট্টাচার্য,

---

* অগ্নিযুগের বীর-বিপ্লবী কমরেড হীরালাল দাশগুপ্ত মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। পঙ্গুপ্রায় এই বর্ষীয়ান নেতা এপ্রিল মাসে পাক-বাহিনীর হাতে বন্দী হন। তারপর ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে আমাদের কাছে খবর আসে, দস্যু ইয়াহিয়ার ঘাতক-বাহিনী এই মহান দেশপ্রেমিককে পটুয়াখালি কারাগারে গুলি করে হত্যা করেছে।—লেখক

ময়মনসিংহের বিনোদ বায়, জ্যোতিষ রায়, ক্ষিতীশ রায়, ঢাকার কামাল (হাসানুজ্জামান), সাত্তার, ধরণী রায়, সতীশ ভদ্র, সুশীল ঘোষ, ফরিদপুরের প্রখ্যাত নেতা আশু ভরদ্বাজ, পাবনার প্রসাদ রায়, দমদম-বসিরহাট ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী আর. সি. পি. আই নেতা বিমল মিত্র, ব্যারিস্টার আবদুল লতিফ প্রমুখ বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীবৃন্দ। এই তিন জায়গার সমস্ত রাজবন্দীই ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত নিরাপত্তা বন্দী (Security Prisoners, Grade II)।

প্রথম শ্রেণীভুক্ত (Grade I) নিরাপত্তা বন্দীরা থাকতেন অন্যত্র—পুরনো হাজত নামে একটি ভিন্ন ওয়ার্ডে। এঁদের মধ্যে ছিলেন বরিশালের কমিউনিস্ট নেতা অমিয় দাশগুপ্ত (মহারাজ), কুমিল্লার অমূল্য[illegible] দত্ত, চন্দ্রশেখর দাশ, ময়মনসিংহের আবদুল বারিসহ আরও বারো-চোদ্দ জন রাজবন্দী।

মহিলা ওয়ার্ডে ছিলেন নাদেরা বেগম এবং ঢাকার অন্য একজন নার্স-কমরেড। এই নার্স কমরেডটির নাম ঠিক মনে করতে পারছিনে এখন। তবে একথা মনে আছে, ইনি যে-বাড়ীতে ধরা পড়েন সেই বাড়ীর গৃহকর্তার স্ত্রীরূপে নিজের পরিচয় দেন। ফলে সেই তরুণ 'গৃহস্বামী' এবং ইনি—দুজনেই ধৃত হয়ে নিরাপত্তা বন্দীরূপে ঢাকা জেলে আসেন। তরুণ 'গৃহস্বামী' সেই কমরেডটির নামও আমি এই মুহূর্তে ঠিকভাবে আর স্মরণ করতে পারছিনে। খুব সম্ভব তাঁর নাম ছিল অমর চক্রবর্তী। এই তরুণ কমরেডকে নিয়ে আমরা অনেক সময় মজা করতাম। বিশেষ করে স্বামীরূপী এই তরুণ কমরেডটি যেদিন স্ত্রীরূপী তরুণী কমরেডটির সঙ্গে সরকারী অনুমতি নিয়ে জেল-আফিসে দেখাসাক্ষাৎ করে ফিরে আসতেন, সেদিন কেউ-না-কেউ তার পিছু লাগতই। একদিন গোয়েন্দা পুলিশকে বোকা বানাবার জন্য এই দুই কমরেড যে-চরম মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে শুনেছি তাই-ই তাদের জীবনে পরম সত্য হয়ে ওঠে। এছাড়া মহিলা

ওয়ার্ডে আর কোনো মহিলা রাজবন্দী, বিশেষ করে বরিশালের বর্ষিয়সী মহিলানেত্রী মনোরমা মাসিমা ছিলেন কিনা তাও আজ মনে করতে পারছি না।

মোট কথা, সরকারী কর্তৃপক্ষ তাদের পরিকল্পনা-মাফিক রাজবন্দীদের পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার নীতিই জেলখানায় অবলম্বন করেছিল। তাই একদিকে প্রথম শ্রেণী আর দ্বিতীয় শ্রেণীর নামে যেমন বিভেদের প্রাচীর তোলা হয়েছিল তেমনি কারাগারে সম্মিলিত জীবনযাত্রা পরিচালনা করার সুযোগ না দিয়ে কারাভ্যন্তরের পাঁচটি প্রাচীরের আড়ালে রাজবন্দীদের পাঁচটি জায়গায় বিচ্ছিন্ন করে রাখতেও কারা-কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেষ্ট ছিল। শুনেছি এবং পরে আমি স্বচক্ষে দেখেছি, ঢাকা জেলের মতো রাজশাহী জেলে আটক বন্দীদের ভাগ্যেও জুটেছিল অনুরূপ দুর্ব্যবহার আর নির্যাতন।

সরকারী কর্তৃপক্ষের এই নির্যাতনের সঙ্গে সেদিন যুক্ত হয়েছিল হঠকারী রাজনীতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি রূপে আটক-বন্দীদের মধ্যে এক চরম রাজনৈতিক সঙ্কট। মূলত, ১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ববাঙলার বিভিন্ন জেলে আটক রাজনৈতিক বন্দীরা বারংবার যে-অনশন ধর্মঘট পরিচালনা করেন এবং রণদিভে-থিসিস অনুযায়ী জেলখানাকেও রাজনৈতিক সংগ্রামের একটি ফ্রণ্ট মনে করে তাঁরা জেলের মধ্যে যে-রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হন সেখানে ব্যক্তিগত শৌর্য-বীর্যের অনেক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়তো স্থাপিত হয়েছিল কিন্তু যে-বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি এবং ধাপে ধাপে মতপার্থক্যের তাঁরা সম্মুখীন হয়েছিলেন, তাই পরবর্তীকালে জেল-কমরেডদের মধ্যে অনৈক্য ও হতাশার জন্ম দিয়ে তাঁদের নিক্ষেপ করে রাজনৈতিক সঙ্কটের আবর্তে। অধিকাংশ রাজনৈতিক বন্দীরা যেহেতু ঢাকা আর রাজশাহীর কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক ছিলেন এবং স্বাভাবিকভাবে এই দুটি কারাগারকে কেন্দ্র করেই যেহেতু রাজবন্দীদের সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল, সেইহেতু অনৈক্য ও হতাশাজনিত সঙ্কট এখানেই ছিল সবচেয়ে প্রকট।

হিসেব করলে দেখা যাবে, একটা বছর কী দুঃসহ যন্ত্রণায় দিন আর রাত্রি পারাপার করেছেন বন্দী-বন্ধুরা। ১৯৪৯ সালের ১১ই মার্চ থেকে শুরু করে ১৯৫০ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত ঢাকা ও রাজশাহী জেলের বন্দীরা দীর্ঘস্থায়ী যে-চারটি অনশন ধর্মঘট পরিচালনা করেন তাতে প্রায় এগারো মাসের মধ্যে ঢাকা জেলের কমরেডরা সর্বমোট ১২৭ দিন (১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে ৫ দিন, মে-জুন মাসে ২৬ দিন, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ৪০ দিন এবং ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৯৫০ সালে ৫৮ দিন) এবং রাজশাহী জেলের কমরেডরা সর্বমোট ১৮৫ দিন (প্রথম ধর্মঘট ৩৮ দিন, দ্বিতীয় ধর্মঘট ৪১ দিন, তৃতীয় ধর্মঘট ৪৫ দিন এবং চতুর্থ ধর্মঘট ৬১ দিন) অনশন ধর্মঘট করতে বাধ্য হন। এইসব ধর্মঘটের সময় রাজবন্দীরা জেল-কর্তৃপক্ষ তথা প্রতিক্রিয়াশীল লীগ সরকারের যে হৃদয়হীন বর্বর নির্যাতন ও দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন হন তার তুলনা ইতিহাসে সত্যিই বিরল।

কয়েকটি উদাহরণ দিলে এই অত্যাচারের ব্যাপকতা স্পষ্ট হবে বোধহয়। চতুর্থ অনশন ধর্মঘটের সময় ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে ১৯৪৯ সালের ৮ই ডিসেম্বর কুষ্টিয়ার কমরেড শিবেন রায়ের বুকের ওপর চড়ে জোর করে খাওয়াতে যাওয়ার সময় জেলখানার নরপশুরা তাঁর ফুসফুস ছিদ্র করে তাঁকে হত্যা করে। এই ধর্মঘটের সময় ঢাকা জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক কমরেড ফণী গুহ র নাড়ীও অনুরূপ বর্বরতায় ছিদ্র হয়ে যায় এবং অনশন ধর্মঘট শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরে ময়মনসিংহের জেলখানায় স্থানান্তরের কিছুদিনের মধ্যে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৫০ সালে খুলনা জেলে বিষ্ণু বৈরাগীকেও লীগশাহীর নরঘাতকের দল পিটিয়ে মেরে ফেলে। আর ১৯৫০ সালের ২৪-এ এপ্রিল রাজশাহী জেলে অনুষ্ঠিত হয় প্রতি-হিংসাপরায়ণ জেল-সুপার বিল-এর নেতৃত্বে নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড। সেদিন সাত জন কমরেড—মোহাম্মদ হানিফ, আমার সহকর্মী বন্ধু আনোয়ার হোসেন, সুখেন ভট্টাচার্য, দেলওয়ার হোসেন, সুধীন ধর,

বিজন সেন আর তেভাগা আন্দোলনের প্রিয়তম কৃষকনেতা কম্পরাম সিং রাজশাহী জেলের খাপরা ওয়ার্ডে গুলির আঘাতে একের পর এক লুটিয়ে পড়েন। যে-লাল পতাকা হাতে নিয়ে একদিন এইসব কমরেড সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন, নিজেদের বুকের রক্ত দিয়ে সেই পতাকাকে আরও লাল করে গেলেন তাঁরা। এই অমর শহীদেরা সেদিন মৃত্যুর আগে বোধহয় নীরবে ধিক্কার জানিয়েছিলেন লীগশাহীর বর্বরতা আর তৎকালে অনুসৃত আমাদের রাজনৈতিক হঠকারিতাকে।

মোট কথা, এইসব ঘটনার প্রতিক্রিয়ায়—হতাশা আর অনৈক্যে জেল-জীবন যখন বেশ বিপর্যস্ত, সেই সময় আমি পৌঁছালাম ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে। 'নতুন বিশ' সেল-এ ঢুকবার কয়েক দিনের মধ্যেই টের পেলাম সেখানে অবস্থানকারী কমরেডদের পারস্পরিক সম্পর্কে যথেষ্ট ফাটল ধরেছে, ব্যক্তিগত সম্পর্কও বহুল পরিমাণে তিক্ত।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণীয়। আমি যখন কলকাতা থেকে পূর্ববাঙলায় যাই তখন পশ্চিমবঙ্গে রণদিভে-নীতির বিরুদ্ধে আন্তঃ-পার্টি সংগ্রাম জোর কদমে শুরু হয়েছে। কমিনফর্মের মুখপত্র 'লাস্টিং পীস'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ, ডিয়াকভ ও বালাবুশেভিচ লিখিত নিবন্ধ দুটি এবং জেল থেকে প্রেরিত 'থ্রি পি.-স ডকুমেণ্ট'-কে (তিন নেতার লিখিত দলিল) ভিত্তি করে হঠকারী নীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক সংখ্যক কমিউনিস্ট সদস্য তাঁদের মতামত প্রকাশে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। আর, জ্যোতি বসু প্রমুখ নেতৃস্থানীয় বেশ কিছু কমরেড জেল থেকে মুক্ত হয়ে দমননীতিতে ছত্রখান পার্টি-সংগঠনকেও এই সময় পুনর্গঠন করতে প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন। পূর্ববাঙলার জেল-জীবন তখন বাইরের কমিউনিস্ট পার্টি থেকে এতই বিচ্ছিন্ন ছিল যে, বন্দী-কমরেডরা রাজনৈতিক পরিবর্তনের এই সংবাদ নানা সূত্রে কিছুটা অবগত হলেও উপযুক্ত দলিলপত্রের অভাবে তাঁদের মধ্যে একদিকে যেমন ছিল রাজনৈতিক বিভ্রান্তি অন্যদিকে তেমনি জেল-জীবনের নানা

তিক্ত অভিজ্ঞতায় তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন এক অস্থির মানসিকতার শিকার। এই পরিবেশে 'নতুন বিশ'-এর কমরেডরা বাইরের রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি তা জানতে চাইলেন। রিপোর্টিং-এর সময়তেই স্পষ্ট বুঝতে পারলাম কমরেডদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তেমন মধুর নয়। এমনকি দু-তিনজন কমরেড 'নতুন বিশ'-এর কমিউনিস্ট কনসোলিডেশন থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিয়েছেন। তাঁরা যেন কারা-জীবনে এক নিঃসঙ্গ পথের যাত্রী।

এঁদের মধ্যে কমরেড মাধবেন্দু মোহান্তর কথা আজও আমার বারংবার মনে পড়ে। আমার জেলের খাতায় এঁর লেখা অজস্র দরখাস্তের মুসাবিদা এখনও জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। মাধবদা ছিলেন মেহেরপুরের বর্ষীয়ান কমিউনিস্ট নেতা। সেই কোনকালে ইনি বিপ্লবী বাঘা যতীন আর নদীযার কমিউনিস্ট নেতা সুশীল চ্যাটার্জীর প্রভাবে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পরিশুদ্ধ হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির রক্ত-পতাকা কাধে তুলে নিয়েছিলেন, কে আর মনে রেখেছে সে-সব কথা! আমি কুষ্টিয়ার কমরেড শিবানী আচার্য, শ্রমিকনেতা রওশন আলি (ইনি বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রবীণ নেতা) আর নন্দ সান্যালের কাছে শুনেছি কমরেড মাধবেন্দু মোহান্ত-র জনপ্রিয়তার কাহিনী। মাধবদা তাঁর দেশপ্রেম, সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সত্যবাদিতা আর নিষ্কলঙ্ক চারিত্রিক মাধুর্যের জন্য সাধারণ লোকের কাছে একদা পরিচিত ছিলেন 'মেহেরপুরের গান্ধী' রূপে।

সেই মাধবদাকে জেলখানায় যখন দেখলাম কমিউনিস্ট কনসো-লিডেশন-এর বাইরে থাকতে তখন বেশ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। পরে এই শান্ত স্বভাবের মানুষটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে বুঝতে পারি জেলখানার হঠকারী রাজনীতির নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, কোনো কোনো তরুণ কমরেডের অতি-বিপ্লবীপনা আর অশিষ্ট

আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েই তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই মানসিকতা গঠনে হয়তো পরোক্ষভাবে তাঁকে সাহায্য করেছিল জেল-নির্যাতনের ফলে তাঁর ভগ্ন-স্বাস্থ্য এবং সে-সময়কার তাঁর পারিবারিক সঙ্কটের নানা দুঃসংবাদ।

'নতুন বিশ্ব' সেল-এর এই পরিবেশে আমি ধীরে ধীরে নিজেকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করলাম। এই সময় এখানে অবস্থানকারী রাজ-বন্দীদের মধ্যে কুমিল্লা-ত্রিপুরার কমরেড যোগব্রত সেন (গদা) সঙ্গীতে বেশ পারদর্শী ছিলেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীত তিনি ভালোই গাইতেন। তাছাড়া দেশাত্মবোধক সঙ্গীত আর নানা গণ-সঙ্গীতেও তাঁর বেশ দখল ছিল। কুষ্টিয়ার শ্রমিককর্মী গারিসউল্লার মধ্যেও লোককবির সহজাত গুণটি দুর্লক্ষ্য ছিল না। ইনি রাজশাহী জেলে গুলিবর্ষণে আহত হয়েছিলেন। একটা চোখ তাঁর প্রায় নষ্ট হয়ে যায়। কমরেড গারিসউল্লা ১৯৫১ সালের প্রথমদিকে রাজশাহী জেল থেকে বদলী হয়ে ঢাকা জেলে চলে আসেন। এঁর মুখে ১৯৫০ সালের ২৪এ এপ্রিল রাজশাহী জেলে অনুষ্ঠিত সেই নৃশংস হত্যা-কাণ্ডের বিবরণ শুনতাম স্তব্ধ-বিস্ময়ে। আমার সহকর্মী-বন্ধু আনোয়ার গুলিবিদ্ধ হয়ে ওঁর গায়ের উপর ঢলে পড়ে শহীদ হন। কমরেড গারিসউল্লা বন্ধু আনোয়ারের রক্তে-ভেজা জামা-কাপড় সযত্নে রেখেছিলেন তাঁর কাছে। যেদিন তিনি সেই রক্তমাখা জামা-কাপড় আমাকে দেখালেন সেদিন আমার বুকের মধ্যে কান্নার যে-ঝড় উঠেছিল, আজও ভুলতে পারিনে তা। গারিসউল্লা পাঁচালীর ঢঙে কয়েকটা চমৎকার গান বেঁধেছিলেন।

এ-ছাড়া ঢাকার তরুণ শ্রমিককর্মী নিশি দাস-ও কোরাস বেশ গলা মেলাতে পারতেন। শ্রীহট্টের ছাত্রকর্মী বিজন পুরকায়স্থ ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। ১৯৪৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দশজনের মধ্যে নিজের স্থান করে নিতে পেরেছিলেন। সাংস্কৃতিক ব্যাপারে তার ছিল প্রচণ্ড আগ্রহ।

ঢাকার ছাত্রনেতা কমরেড তকিউল্লাহ-রও (শ্রদ্ধেয় ডঃ শহীদুল্লাহ-র পুত্র) সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে উৎসাহ কম ছিল না। আর, আমি যেহেতু বাইরে ছিলাম মূলত ছাত্র ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মী, সেইহেতু আমাকে পেয়ে ঐসব কমরেডরা আরও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। এরি ফলে, জেলখানার তৎকালীন বিপর্যস্ত পরিবেশে আমরা প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আলোচনার দিকে না এগিয়ে বিধ্বস্ত মানবিক সম্পর্কগুলি পুনর্বার জোড়া লাগাবার জন্য শুরু করলাম সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনাচক্র এবং বিশেষ বিশেষ দিন উপলক্ষে গীতি-আলেখ্যর আসর।

এর ফলাফল উৎসাহজনক মনে হলো। যে সব কমরেড জেল-কনসোলিডেশন-এর বাইরে ছিলেন তাঁরা আমাদের রাজনৈতিক বা পার্টি-সংক্রান্ত আলোচনায় অংশ গ্রহণ না করলেও এইসব সাংস্কৃতিক আলোচনায় যোগ দিতে লাগলেন। সাংস্কৃতিক আলোচনায় তর্ক-বিতর্ক এবং মতপার্থক্যও দেখা দিত। বিশেষ করে 'প্রগতি সাহিত্যের ভূমিকা' কিংবা 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল্য নিরূপণ প্রসঙ্গে' আলোচনায় মতপার্থক্যটা বেশ প্রকট হয়ে উঠতো। কারণ, তখনও পর্যন্ত ১৯৪৯ সালের 'মার্কসবাদী' সংকলনে প্রকাশিত এবং প্রকাশ রায় ও রবীন্দ্র গুপ্ত-লিখিত প্রবন্ধের সেই হঠকারী ঝোঁক অনেক কমরেডর মনে বেশ সক্রিয় ছিল। আমি যেহেতু ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কলকাতায় ছিলাম এবং এই ঝোঁকের বিরুদ্ধে তৎকালীন মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মতামত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলাম, সেইহেতু নিজেকে কিছুটা সংশোধন করার সুযোগ পেয়েছিলাম। এই আলোচনাচক্রের সুযোগে আমিও লিখিতভাবে প্রবন্ধাকারে প্রগতি সাহিত্য এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রকাশ রায় ও রবীন্দ্র গুপ্ত-র মতবাদ খণ্ডন করে আমার নিজস্ব বক্তব্য প্রকাশ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। দেখেছি, শেষপর্যন্ত দু-একজন কমরেড ছাড়া প্রায় সব কমরেডই রবীন্দ্র গুপ্ত-র মতবাদের বিরুদ্ধে রায় জানিয়েছেন। এ ছাড়া মে-দিবস,

ঈদ-উৎসব, নভেম্বর বিপ্লব-দিবস প্রভৃতি উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও আমাদের ভাঙা-মনের সেতুপথ রচনার কাজ চলছিল ধীরে ধীরে।

এইভাবে ১৯৫১ সালের মধ্যে 'নতুন বিশ' সেল-এ ব্যক্তিগত সম্পর্ক কিছুটা উন্নত হলো সত্যি, কিন্তু রাজনৈতিক মতপার্থক্যের জট এবং চক্র-মনোবৃত্তি তখনো দূর হলো না। আমি পূর্বেই বলেছি, রাজনৈতিক বন্দীরা প্রধানত পাঁচটি জায়গায় বিচ্ছিন্ন ছিলেন। এই বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করা ছিল প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। এ-দিক থেকে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন 'পুরনো বিশ' সেল-এর কমরেডরা, বিশেষ করে কমরেড অনিল মুখার্জি।

প্রকৃতপক্ষে, ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের বিচ্ছিন্নতা দূর করার কাজে কমরেড অনিল মুখার্জির ছিল এক অগ্রণী ভূমিকা। আমাদের সঙ্গে তিনিই প্রথম গোপন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। আমাদের তরফ থেকে একাজে প্রথম অগ্রসর হয়েছিলেন ঢাকার কমরেড বেণু ধর আর তকিউল্লাহ। পরবর্তীকালে কমরেড বিজন পুরকায়স্থ ১৯৫২ সালের মধ্যে বহু বিনিদ্ররাত্রির বিনিময়ে যথেষ্ট সফলতা অর্জন করেন এই গোপন যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের কাজে।

ঢাকা জেলের তৎকালীন পরিবেশে এই গোপন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা ছিল আমাদের সকলের পক্ষেই আশীর্বাদস্বরূপ। এ-যেন ধূ ধূ মরুভূমিতে প্রবল বৃষ্টিপাতের মতোই একটা অলৌকিক ব্যাপার। সত্যিই জেলের মধ্যে তখন সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য কতটুকু সম্পদই-বা আমাদের হাতে ছিল!

একদিকে চরম বিচ্ছিন্নতা, বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থা, অন্যদিকে জেলখানায় মানস-সম্পদ আহরণের অপ্রতুলতা আমাদের অনেককেই অস্থির করে তুলছিল। ঢাকা জেলের লাইব্রেরীতে দু-চারখানা ভালো সাহিত্য-গ্রন্থ থাকলেও রাজনৈতিক চেতনাকে পরিতুষ্ট করার মতো কোনো আয়োজনই ছিল না। সরকারী-নীতি অনুযায়ী

মার্কসবাদী গ্রন্থাদির জেলখানায় প্রবেশ তখন নিষিদ্ধ। আমাদের সেল-এ সে-সময় রাজনৈতিক গ্রন্থ বলতে লুকিয়ে-চুরিয়ে আনা কিংবা কোনো কমরেডের খাতায় টুকে রাখা মাও-সে-তুঙ-এর 'নয়া গণতন্ত্র', এডগার স্নো-র 'রেড স্টার ওভার চায়না' এবং মার্কস-এঙ্গেলস্-এর 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো'-র অংশ-বিশেষ ছাড়া অন্য কিছু ছিল না বোধহয়। অথচ কে-না জানে জেলের অফুরন্ত অবসরের কথা! যাঁরা পড়াশুনা করতে চায়, জেলখানাকে পরিণত করতে চায় বিপ্লবী শিক্ষা-গ্রহণের বিশ্ববিদ্যালয় রূপে, তাঁদের মনে সে-সময় একটা জিজ্ঞাসার পাখি নিরন্তর মাথা কুটে মরেছে। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল লীগ-সরকারের জেল-নীতিকে, আমাদের রাজনৈতিক দিক থেকে পঙ্গু করে রাখার এই শয়তানী প্রচেষ্টাকে, আমরা প্রতিহত করতে পারি নি। কড়া সেন্সরশিপের মধ্য দিয়ে যে-কয়খানা দৈনিক সংবাদপত্র জেল-কর্তৃপক্ষ আমাদের হাতে পৌছে দিতেন, তার মাধ্যমেই আমরা অনুভব করতে চেষ্টা করতাম কারা-প্রাচীরের বাইরের জগৎ আর তার মুক্ত আলো-হাওয়ার রঙ-বদলের আভাস।

দৈনিক সংবাদপত্র বলতে কলকাতার 'স্টেটস্ম্যান,' ঢাকার 'পাকিস্তান অবজারভার', 'সংবাদ' আব 'আজাদ'—এই কয়খানা সংবাদপত্রই মূলত তখন আমাদেব সম্বল। ইতিমধ্যে, দেশ-বিভাগের কয়েক বৎসরের মধ্যে, পূর্ববাঙলার প্রকাশন-জগতে আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে! কলকাতা থেকে ঢাকায় উঠে এসেছে 'আজাদ' আর 'মর্নিং নিউজ'-এর কার্যালয়। লীগশাহী এবং যা-কিছু লীগ-সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার সহায়ক, তার পক্ষেই ছিল এই দুটি পত্রিকার সোচ্চার সমর্থন। সদ্য প্রকাশিত 'পাকিস্তান অবজারভার' এবং 'সংবাদ'-এর মূল সুরের মধ্যে সে-সময় আমরা লক্ষ্য করেছি লীগ-সরকারের বিরোধিতা। বিশেষ করে এই দুটি পত্রিকায় প্রকাশিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নানা সংবাদ, যা জেল-কর্তৃপক্ষের সেন্সরশিপ এড়িয়ে আমাদের কাছে পৌছাতো.

সেই নিরাশার অন্ধকারেও আমাদের মনে ফুটিয়ে তুলতো কিঞ্চিৎ আশার আলো।

এই সময় একটা জিনিস আমরা সঠিক ভাবেই লক্ষ্য করছিলাম। সেটি হলো, ১৯৫১ সালের ১৬ই অক্টোবর পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী মিঃ লিয়াকত আলি আততায়ীর হাতে নিহত হওয়ার পর পাকিস্তানী রাজনীতিতে ক্ষমতালোভী লীগ-নেতৃত্বের মধ্যে রাষ্ট্র-ক্ষমতা কব্জায়ত্ত করার নতুন দ্বন্দ্ব-সংঘাত। প্রকৃতপক্ষে, লিয়াকত আলি-হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়েই পাকিস্তানে ষড়যন্ত্রের রাজনীতির প্রথম সূত্রপাত। এর ধাক্কায় পূর্ববাঙলার রাজনৈতিক মঞ্চটি-যে দুলে উঠবে, আরও অস্থিরতা বাড়তে থাকবে—এ সম্পর্কেও আমরা প্রায় নিঃসংশয় ছিলাম। লিয়াকত আলির হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে আমরা 'নতুন বিশ' সেল-এ যে-আলোচনা করেছিলাম, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আমাদের ঘৃণা প্রকাশ করে গভর্নর জেনারেলের কাছে ২৫. ১০. ৫১ তারিখে যে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম এবং সেই আলোচনা সভার যে-'নোট' আমার জেলখানার খাতায় লিপিবদ্ধ আছে তাতে উপরোক্ত মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

ঠিক এই সময়টিতেই, সম্ভবত ১৯৫১ সালের শেষ দিকে আমাদের সঙ্গে মিলিত হলেন রংপুরের কমরেড শচীন রায়। তিনি ছিলেন নেতৃস্থানীয় পুরনো কর্মী। ধৈর্যশীল এবং মার্কসীয় তত্ত্বজ্ঞানে পরিশীলিত এই কমরেডটি জেল কনসোলিডেশন-এর মধ্যে সমস্ত কমরেডদের টেনে আনার জন্য তাঁর সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন। আর, যেকোনো কারণেই হোক দূরে সরে-থাকা মেহেরপুরের কমিউনিস্ট নেতা মাধবেন্দু মোহান্ত-র সঙ্গে আমার একটা হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠায় আমিও কমরেড শচীন রায়কে ঐক্যবদ্ধ কনসো-লিডেশন গড়ার কাজে কিছুটা সাহায্য করতে পেরেছিলাম। ফলে, মাধবদার মনের সঞ্চিত তিক্ত বরফ ক্রমান্বয়ে গলতে শুরু করে।

অন্যান্য কমরেডরাও রাজনৈতিক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবার জন্য এগিয়ে আসেন।

অবশ্য বাইরের পরিবর্তনমুখী রাজনৈতিক ঘটনাস্রোত জেলের প্রাচীর অতিক্রম করে রাজবন্দীদের মনের তটেও বয়ে আনছিল নতুন পলিমাটি। স্পষ্ট অনুভব করা যাচ্ছিল পূর্ববাঙলার আকাশ-জোড়া ঝড়ো মেঘের আনাগোনা। লীগ-সরকারের দমননীতি আর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে সমাজের নানা স্তরের পুঞ্জীভূত ধূমায়িত বিক্ষোভের কথাও আমরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পারছিলাম। সত্যিকথা বলতে কি, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগের বামপন্থী অংশের যে-বিক্ষুব্ধ যুব-ছাত্রগোষ্ঠী ঢাকার ১৫০ নম্বর মোগলটুলিকে কেন্দ্র করে নতুন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং ১৯৪৯ সালে ২৩এ ও ২৪এ জুন মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ঢাকার স্বামীবাগের 'রোজ গার্ডেন'-এ অনুষ্ঠিত সম্মেলনে তাঁদের প্রচেষ্টায় যে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' সংগঠনের জন্ম হয়—সেই নবগঠিত রাজনৈতিক সংগঠনই লীগ-সরকার বিরোধী গণ-আন্দোলনে এক সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। শামসুল হক, মুজিবর রহমান, খোন্দকার মুস্তাক আহম্মদ, শওকত আলি প্রমুখ নেতৃস্থানীয় যুব-কর্মীরাই ছিলেন আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রধান সংগঠক। ছাত্রনেতা শেখ মুজিবর রহমান এই প্রথম ব্যাপকভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মতৎপরতায় অংশ গ্রহণ করলেন এবং ক্রমান্বয়ে রূপান্তরিত হতে হতে পরিণত হলেন আজকের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানে।

একদিকে যেমন আওয়ামী মুসলিম লীগের অভ্যুদয় পূর্ববাঙলার মুসলিম লীগ-রাজনীতির ভারসাম্যকে টলিয়ে দিল, অন্যদিকে তেমনি ১৯৫১ সালের মধ্যে মুসলিম ছাত্রলীগের একচেটিয়া প্রভুত্বকে খর্ব করে ঢাকাসহ পূর্ববাঙলার প্রায় সকল জেলায় সংগঠিত হলো নতুন গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছাত্র ও যুব-সংগঠন। অলি আহাদ,

আবদুল মতিন, মোহাম্মদ তোয়াহা প্রমুখ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছাত্র ও যুব নেতাদের প্রচেষ্টায় ছাত্র ইউনিয়ন ও যুব লীগের মাধ্যমে পাকিস্তানের নতুন প্রজন্মের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে সঞ্চারিত হলো নতুন গণতান্ত্রিক চেতনা। মুসলিম লীগ সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে এই নবগঠিত ছাত্র ও যুব-সংগঠন রুখে দাঁড়ালো। শিক্ষা-সংস্কৃতি আর অর্থনৈতিক অনগ্রসরতায় যে-দেশ আকণ্ঠ নিমজ্জিত, যে-দেশ শোষণ আর অপশাসনে জর্জরিত, যে-দেশের দুর্নীতিপরায়ণ স্বৈরতান্ত্রিক সরকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর খড়্গহস্ত এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা হত্যায় প্রতিমুহূর্তে উদ্যত—বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে সে-দেশের অগ্রণী ছাত্র ও যুব-সমাজ যে সকলের আগে মোহমুক্ত হবে, এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। এই নতুন ছাত্র ও যুব-সংগঠন গড়ার কাজে পূর্ববাঙলার গোপন কমিউনিস্ট পার্টির দানও আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য।

এত দ্রুত রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের কথা আমাদের কাছে ছিল প্রায় অকল্পনীয়। কিন্তু সমগ্র পূর্ববাঙলা তখন সত্যিই এক বিস্ফোরণের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। চতুর্দিকে দারুণ খাদ্য-সঙ্কট। খুলনার দুর্ভিক্ষে প্রায় বিশ হাজার নর-নারীর মৃত্যুর খবর সংবাদপত্র বহন করে আনছে আমাদের কাছে। লবণের সের ষোল টাকা। এই লবণ-সঙ্কট এমন তীব্র আকার ধারণ করে যে, সমগ্র পূর্ববাঙলায় অসংখ্য সভা-সমাবেশ মিছিলে এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে থাকে। লবণ-সঙ্কট অবসানের দাবী পূর্ববাঙলার জাতীয় দাবী হয়ে দাঁড়ায়। শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-ছাত্র-যুব, সমাজের সকল স্তরের মানুষ একটা অর্থনৈতিক সঙ্কটকে ভিত্তি করে এই বোধহয় সর্বপ্রথম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে সার্থকভাবে রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করেন। ছাত্র-যুবনেতা অলি আহাদ ও মোহাম্মদ তোয়াহার নাম এই সময়েই আমাদের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে। আর, এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী খাজা

নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের 'মৌলনীতি নির্ধারক কমিটি'-র সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারী ঢাকার জনসভায় পুনর্বার ঘোষণা করলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখে আত্মিকসঙ্কটের এই ঘোষণায় জ্বলে উঠলো সমগ্র পূর্ববাঙলা। 'সর্বদলীয় ভাষা কমিটি'-র নেতৃত্ব ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে সভা-সমাবেশ-ধর্মঘট পালিত হলো সারা দেশ জুড়ে। তারপর এলো সেই ঐতিহাসিক ২১এ ফেব্রুয়ারী। ঐ দিন রক্তের অক্ষরে ঢাকা তথা পূর্ববাঙলার শহর-নগর, গঞ্জ আর গ্রামে লেখা হলো এক নতুন ইতিহাস।

আমরা জেলখানায় দীর্ঘকাল পরে শিরদাঁড়া সোজা করে নড়ে-চড়ে বসলাম। ২১এ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যার প্রাক্কালেই জেলখানায় খবর পৌঁছালো ঢাকায় গুলি চলেছে। শহীদ হয়েছেন কয়েকজন ছাত্র। ছাত্র-পুলিশে তুমুল সংঘর্ষ চলছে। সমগ্র ঢাকা শহর জুড়ে দারুণ উত্তেজনা আর ক্রোধ দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। আমাদের সেই উৎকর্ণ মুহূর্তে কারাপ্রাচীর ভেদ করে বাতাসে ভেসে এলো—ইনক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনি, বাঙলাভাষা রাষ্ট্রভাষা রূপে কামিয়াব করার ধ্বনি, কুখ্যাত নুরুল আমিন সরকারের পদত্যাগ আর বহুপ্রতীক্ষিত সমস্ত রাজবন্দীর বিনাশর্তে মুক্তির বজ্র-নির্ঘোষ।

সে-এক আশ্চর্য শিহরণ। উত্তেজনায় ঘুম এলো না অনেক রাত পর্যন্ত। আশেপাশের বন্দী-সেল থেকে কমরেডদের গানের সুর ভেসে আসতে লাগলো। আমাদের 'নতুন বিশ' সেল থেকে প্রত্যুত্তর দিলেন যোগব্রত সেন, গারিসউল্লা প্রমুখ বন্দী-বন্ধুরা। 'কমরেড শোন্ বিউগল্ ঐ হাঁকছে রে', 'কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙ্গে ফেল্ কররে লোপাট' কিংবা 'মোদের গরব মোদের আশা, আ-মরি বাঙলা ভাষা' প্রভৃতি গানের তাল-বেতাল সুরে যেন মাতাল হয়ে উঠলো ইট-কাঠ-লোহার নিষ্প্রাণ কারাগার।

জেলে ঢুকবার সময় যে-স্বর্ণসম্ভাবনার কথা ভাবতে পারি নি,

বছর শেষ না হতেই ২২এ ফেব্রুয়ারীর ভোরে পূর্ববাঙলার আকাশ-জোড়া নবজন্মের সেই রক্তিম সূর্যোদয়কে মনে মনে প্রণাম জানালাম। সকালের প্রাতঃরাশ শেষ করার আগেই জেলের মধ্যেই শুনতে পেলাম অনেকগুলি তরুণ কণ্ঠের শ্লোগান। সেল ওয়ার্ডের প্রবেশমুখে হুড়মুড় করে ছুটে গেলাম সবাই। সেখান থেকেই দেখা গেল ভাষা-আন্দোলনের বন্দী তরুণ সহযাত্রীদের নিষ্পাপ মুখগুলি। সারিবদ্ধ-ভাবে তাঁরা চলেছেন অন্য এক ওয়ার্ডের দিকে। আমাদের দেখে তাঁরা আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। দুই হাত আন্দোলিত করে আমাদের উদ্দেশ্যে অভিনন্দন ছুড়ে দিতে দিতে তাঁরা বারংবার ধ্বনি তুললেন: 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই, মুক্তি চাই। দু-একজন তরুণ বন্দী, সিপাই-এর নিষেধ না-মেনে ছুটে এলেন আমাদের কাছে। সেলাম জানাতে জানাতে জড়িয়ে ধরলেন তাঁদের উষ্ণ বুকে। কাউকে চিনি না আমরা। দেখে মনে হলো সবাই ছাত্র। সমস্ত অপরিচয়ের কালো পর্দা মুহূর্তে যেন শূন্যে মিলিয়ে গেল। বুঝতে পারলাম, বহুদিনের সযত্নে লালিত ওঁরাই আমাদের একান্ত আপনজন, আমাদের আকাঙ্ক্ষিত মুক্তির ওঁরাই অগ্রদূত।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্ত ঘটনাটা ঘটে গেল। ওঁরা চলে গেলেন অন্য ওয়ার্ডে। আমরা ফিরে এলাম সেল-এর চত্বরে। বন্ধুদের মুখ-গুলি দেখলাম আনন্দে চক্‌চক্ করছে। লোভী-মানুষ উপোসী থাকার পর তার সামনে কেউ যদি তুলে ধরেন সুখাদ্য-সজ্জিত খাবারের থালা তবে তার চোখে-মুখে যে-আনন্দ-উল্লাস ফুটে ওঠে, আমাদের অবস্থা একমাত্র তার সঙ্গেই বোধহয় তুলনীয় ছিল।

তারপর সকাল গড়িয়ে দুপুর এলো। সংবাদপত্রের জন্য সকলেই উন্মুখ তখন। কেউ কেউ স্নান সেরে নিলেন। খাওয়াও শেষ হলো এক সময়। কিন্তু কাগজ আর আসে না। অথচ অন্যদিন একটা দুটোর মধ্যে কাগজ এসে যায়। ধৈর্যের বাঁধ ভাঙতে শুরু করেছে প্রায়। আমাদের সেল-এর মেট আর পাহারাদার সিপাইকে দিয়ে

কাগজ নিয়ে আসার জন্য কোনো কোনো বন্ধু হেড-জমাদারকে খবর পাঠালেন। তবুও কাগজের হদিস পাওয়া গেল না। শেষপর্যন্ত দুপুর গড়িয়ে বিকেল এলো। এমন সময় হেড-জমাদার ছিন্ন-কর্তিত 'স্টেটস্‌ম্যান' আর 'আজাদ' দিয়ে গেলেন আমাদের হাতে। সেন্সর-শিপের কাঁচিতে কুচি কুচি করে কাটা সংবাদপত্র। 'স্টেটস্‌ম্যান'-এর প্রথম পৃষ্ঠার অর্ধেকের বেশি উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, 'আজাদ-'এরও একই দশা। 'পাকিস্তান অবজারভার' আর 'সংবাদ' একেবারেই নিষিদ্ধ সেদিন রাজবন্দীদের কাছে। অতীতেও গণ-আন্দোলনেব সংবাদ কেটে বাদ দিয়ে জেল-কর্তৃপক্ষ বরাদ্দ কাগজ বিলি-বণ্টন করতেন বিভিন্ন ওয়ার্ডে। প্রায়শই ঘটতো এ-ঘটনা। কিন্তু এমন ব্যাপক আকারে এই প্রথম ঘটতে দেখলাম ব্যাপারটা। বরাদ্দ অন্য দুটি কাগজ অন্তত সেদিনের জন্য আমাদের কাছে নিষিদ্ধ হয়ে গেল। সমগ্র ঘটনার গুরুত্ব এবং ব্যাপকতা বুঝতে আমাদের এতটুকু কষ্ট হলো না। কারণ, আমরা সরকারী-কতৃপক্ষের আতঙ্কিত আচরণ থেকে আসল ঘটনাব উৎস অনুসন্ধানে ইতিপূর্বেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। আর, ২১এ ফেব্রুয়ারীর ঐতিহাসিক ঘটনা তো বলা যায় আমাদের চোখের সামনেই সংঘটিত হলো। গত রাত্রি থেকে ২২এ ফেব্রুয়ারীর সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা জুড়ে এই ঐতিহাসিক আন্দোলনই তো 'আমাদের সমস্ত চেতনাকে সহস্র হাতে নাড়া দিয়ে গেল। সুতরাং সেন্সরশিপের বেড়াজাল টপকে যতদূর ছুটে যাওয়ার কথা, ঠিক সেখানেই ছুটে গেল অশান্ত মনের দুরন্ত ঘোড়াটা।

পবপর তিন-চারদিন ধবে ঐভাবে কর্তিত সংবাদপত্র এলো আমাদের কাছে। তারপর ক্রমান্বয়ে খানিকটা যেন সংযত হলেন জেল-কর্তৃপক্ষ। সব মিলিয়ে সেই কর্তিত সংবাদপত্রের প্রতিবেদন থেকে যা বুঝতে পাবলাম তাও ছিল আমাদের ধারণাতীত ব্যাপার। ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলন পূর্ববাঙলাকে ভূমিকম্পের মতো নাড়িয়ে দিল। শহর-নগর, গঞ্জ-গ্রাম—পূর্ববাঙলার প্রতিটি জনপদ

এই আন্দোলনের জোয়ারে হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠলো। সত্যি সত্যি সুদূর গ্রামের প্রত্যন্ত কোণেও পৌঁছে গিয়েছিল ভাষা-আন্দোলনের সর্বপ্লাবী ঢেউ। মুসলিম লীগ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জনের নামে বাঙালি মুসলমানকে যে-সাম্প্রদায়িক হানাহানির পথে একদা ঠেলে দিয়েছিল, পূর্ববাঙলার নবজাগ্রত ছাত্র-যুব-বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সমগ্র জাতিকে সেই ভ্রান্ত-পথ থেকে সরিয়ে আনলেন। ভাষার অধিকার রক্ষার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই সর্বপ্রথম পূর্ববাঙলার মানুষ দীক্ষিত হলেন ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবোধে। সমগ্র বাঙালি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের পথে ঐতিহাসিক অগ্রযাত্রা শুরু হলো। ধর্মান্ধতার শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে এলো সূর্য-অভিসারী মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের দল।

ঠিক এই সময়টাতেই চলছিল পূর্ববাঙলার আইন-সভার বাজেট অধিবেশন। লীগ-সরকারের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন সাধারণ ধর্মঘটের দিনেও বাজেট-অধিবেশন স্থগিত রাখতে সম্মত হলেন না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাঙ্গনে গুলি বর্ষণের খবর আইন-সভায় পৌছানো মাত্র তুমুল উত্তেজনায় ফেটে পড়লো সমস্ত সভাকক্ষ। বিরোধী পক্ষের সদস্যরা আইন-সভার অধিবেশন বন্ধ রেখে আহত ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে যাওয়ার জন্য সকল সদস্যকে আহ্বান জানালেন। নুরুল আমিন এই প্রস্তাবেও রাজী হলেন না। সেই উত্তেজনাময় মুহূর্তে মাদার বক্স, আব্দুর রসিদ তর্কবাগীশ প্রমুখ কয়েকজন মুসলিম লীগ সদস্য দলত্যাগ করে বিরোধীপক্ষে যোগ দেন। ফলে, আতঙ্কিত নুরুল আমিন-এর পরামর্শে আইন-সভার অধিবেশন মুলতবী রাখা হয়। কিন্তু ভাষা-আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গে যখন নুরুল আমিন-সরকার টলটলায়মান, বিক্ষুব্ধ জনতা যখন নুরুল আমিনের পদত্যাগের দাবীতে মুখর, তখন নিরুপায় নুরুল আমিন গদী রক্ষার প্রয়োজনে ২৪ ঘণ্টার নোটিশে আইন-সভার জরুরী অধিবেশন আহ্বান করে বাঙলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষার

মর্যাদা দানের দাবীতে এ ঃ প্রস্তাব পাশ করাতে বাধ্য হলেন। জনগণই-যে সমস্ত শক্তির উৎস, অনিচ্ছুক মুসলিম লীগ সরকারের হাত থেকে দাবী আদায় করে পূর্ববাঙলার মানুষ তা প্রমাণ করলেন।

ঐতিহাসিক ভাষা-আন্দোলন আমাদের কাছে অন্যদিক থেকেও ছিল তাৎপর্যময়। জাতিসত্তার বিকাশে ভাষা-যে কত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, এই আন্দোলন আমাদের তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। একদিন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের নামে মুসলিম লীগের দ্বি-জা ে তত্ত্বভিত্তিক পাকিস্তান দাবীর প্রতি নৈতিক সমর্থন জানিয়ে জাতিসত্তা বিকাশের মৌল উপাদানগুলি উপেক্ষা করে যে-ভ্রান্তিকে প্র শ্র দিয়েছিলেন, বাস্তবতার কষ্টি-পাথরে তা যাচাই হয়ে গেল। স ংখ্যক শা বলতে কি, সমগ্র দেশের শতকরা ৫৬ জনের মাতৃ-ভাষাকে উপেক্ষা করে পাকিস্তানের মাত্র ৭ শতাংশের মাতৃভাষাকে সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টির উপর জোর-জবরদস্তিমূলক চাপিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রের মধ্যেও সেদিন লুকিয়ে ছিল প্রতিক্রিয়াশীল পাক-শাসক-চক্রের ঔপনিবেশিকতাবাদী এক মনোভাব। ঔপনিবেশিকতাবাদীরা জাতীয় বিকাশের পথে এইভাবেই তো সৃষ্টি করে নানা প্রতিবন্ধ।

আজ শুনলে হয়তো একটু আশ্চর্য লাগবে, কিন্তু ভাষা-আন্দোলনের পর্যালোচনাকালে, ১৯৫২ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট কনসোলিডেশন-এর সভায় জেলের শত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কোনো কোনো কমরেড উপস্থিত করেছিলেন অনুরূপ বক্তব্য। আমার জেলের খাতায় ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কে পর্যালোচনা-সভার যে-সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখা রয়েছে তাতে প্রধান আলোচক রূপে দেখতে পাচ্ছি কমরেড শচীন রায়, বিজন পুরকায়স্থ, যোগব্রত. সেন এবং আমার নাম। এই চার জনের বক্তব্যের বিভিন্নতার মধ্যেও একটা অভিন্ন ঐক্যসূত্র লিপিবদ্ধ 'নোট'-এর মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি এখন। এঁরা সেদিন ঐ সভায় মূলত নিম্নলিখিত বক্তব্যই উপস্থিত করেছিলেন :

(১) ভাষা-আন্দোলনের মধ্যে বাঙালি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন নিহিত। (২) পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকচক্র পূর্ব-বাঙলাকে উপনিবেশে পরিণত করতে চায়। (৩) উর্দু ভাষাকে বাঙলা ভাষার উপর চাপিয়ে দেওয়ার মধ্যে সেই ষড়যন্ত্র পরিস্ফুট। (৪) ভাষা এমন একটা উপাদান যাকে কেন্দ্র করে জাতীয়তার বিকাশ সম্ভব। (৫) ভাষা-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পূর্ববাঙলার হতাশা আর স্বতঃস্ফূর্ততার যুগ শেষ হতে চলেছে। (৬) ভাষা আন্দোলন বৃহত্তর জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনেরই একটা অংশ। (৭) পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে সঠিক পথে অগ্রসর হচ্ছে। (৮) ভাষা-আন্দোলনে যুবলীগ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। (৯) যুবলীগ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছে, একে সঠিকভাবে ব্যাপকভিত্তিক গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে সম্প্রসারিত করা উচিত। (১০) ভাষা-আন্দোলন কমিউনিস্ট পার্টির সম্মুখে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। (১১) ভাষা-আন্দোলন চীনের ৪ঠা মে আন্দোলনের সঙ্গে তুলনীয়। (১২) পূর্ববাঙলায় নতুন মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠছে। প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরাও সক্রিয়। (১৩) পূর্ববাঙলার সাহিত্যে প্রগতিশীল ভাবধারা ক্রমান্বয়ে অগ্রসর। (১৪) পার্টির উচিত গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মপন্থা হাজির করা, আন্দোলনকে আরও সংগঠিত করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, ইত্যাদি…ইত্যাদি ।

পশ্চিম পাকিস্তানের একচেটিয়া পুঁজিপতি, সামন্তপ্রভু আর জঙ্গীচক্র পূর্ববাঙলায় পরবর্তীকালে যে-ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করেছিল এবং যার বিরুদ্ধে আজ সাড়ে সাত কোটি বাঙালি মুক্তি-সংগ্রামে রত, ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনেই-যে তার সূচনা, সেদিনের কমিউনিস্ট-বন্দীদের দৃষ্টিতে তা অন্তত আংশিকভাবে ধরা পড়েছিল। আলোচনা-সভার উপরোক্ত বিবরণ নিঃসন্দেহে এ-কথার

সত্যতা প্রমাণ করে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। আলোচনা-সভার বিবরণীতে লক্ষ করছি যে, প্রায় প্রত্যেক বক্তাই ভাষা-আন্দোলনকে চীনের ৪ঠা মে আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এর একটা কারণ ছিল। সেই সময়ে আমরা প্রায় সকলেই হঠকারী রণদিভে-নীতি বর্জন করে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে নতুন পথের অনুসন্ধান করছি। আর, চীনের নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মডেলটির প্রতিই ছিল আমাদের তীব্র আকর্ষণ। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য মাও সে-তুং-এর 'নয়া গণতন্ত্র' তখন আমরা খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছি এবং গোগ্রাসে গিলছি এডগার স্নো-র 'রেড স্টার ওভার চায়না'র অনবদ্য তথ্যভিত্তিক ধারাভাষ্য। এই পরি-প্রেক্ষিতে ভাষা-আন্দোলনের মধ্যে চীনের ৪ঠা মে আন্দোলনের সাজুয্য খুঁজে পাওয়া আমাদের পক্ষে মোটেই কষ্টকল্পিত ব্যাপার ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, ১৯১৯-এর ৪ঠা মে আন্দোলন চীনা-জাতির মনের মুক্তি আকাঙ্ক্ষাকে যেমন মূর্ত করে তুলেছিল, ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনও তেমনি পূর্ববাঙলার বাঙালি জাতির আত্ম-উপলব্ধিকে জাগ্রত করেছিল। ৪ঠা মে আন্দোলন যেমন ছিল মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী, বিপ্লবী পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী এবং বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের যুক্তফ্রন্টের আন্দোলন—তেমনি ভাষা-আন্দোলনও পরিচালিত হয়েছিল মূলত শিল্পী সাহিত্যিক-অধ্যাপক শিক্ষক ছাত্র-যুবদের নিয়ে গঠিত যুক্ত কর্মপরিষদের দ্বারা। ৪ঠা মে আন্দোলনের মতো ভাষা-আন্দোলনেও পূর্ববাঙলার শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণী সংগঠিত-ভাবে কোনো অংশ গ্রহণ করে নি। ৪ঠা মে আন্দোলন চীনের সামন্তবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সার্থকভাবে আক্রমণ পরিচালনা করেছিল, পুরনো নীতিবোধকে পর্যুদস্ত করে নতুন নীতিবোধকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, জনগণাভিমুখী সাহিত্যের পথও উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। পূর্ববাঙলার ভাষা-আন্দোলনও পরিচালিত হয়েছিল

ধর্মীয় ভাবাবেগে আপ্লুত ইসলামী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, নতুন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে তা জাগ্রত করেছিল, আর সত্যিই তা খুলে দিয়েছিল মানবধর্মী সাহিত্য-সৃষ্টির সহস্রধার উৎসমুখ। সর্বশেষে, ৪ঠা মে আন্দোলন যেমন নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তনে এবং কর্মী-প্রস্তুতির দিক থেকে ১৯২১ সালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির আবির্ভাবের পথ সুগম করে দেয়, ' পূর্ববাঙলার ভাষা-আন্দোলনও তেমনি দমননীতিতে ছত্রখান গোপন কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে নতুন রক্ত-সঞ্চালনে সাহায্য করে। মোটামুটি এই সাদৃশ্য বা মিলের কথা মনে রেখেই বোধহয় ভাষা আন্দোলনের পর্যালোচনাকালে কমরেডরা স্মরণ করেছিলেন চীনের ৪ঠা মে আন্দোলনের কাহিনী।

ঢাকার জেল-জীবনে এই সময় থেকেই এক নতুন পর্বের শুরু। বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা সমস্ত রাজবন্দীরা একত্রে মিলিত হওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। অনুকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জেলের মধ্যে সকল রাজবন্দীকে একসঙ্গে রাখার দাবী জানিয়ে আমরা জেল-কর্তৃপক্ষ তথা সরকারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করলাম। আমরা যারা সেল-এ বন্দী ছিলাম তাদের জন্য সেল-ওয়ার্ডের বাইরে অবিলম্বে সকাল-সন্ধ্যা ভ্রমণ এবং মুক্তাঙ্গন খেলা-ধূলার ব্যবস্থার দাবীও সেই স্মারকলিপিতে সন্নিবিষ্ট হলো।

ইতিমধ্যে এ-ব্যাপারে জেল-কর্তৃপক্ষ নিজেই একটা নজির স্থাপন করেছিলেন। ভাষা-আন্দোলনে ধৃত ছাত্রদের অনেকে অল্পদিনের মধ্যে মুক্ত হলেও এই আন্দোলনের প্রাক্কালে ধৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক অজিত গুহকে মুক্তি না দিয়ে নিরাপত্তা আইনে আটক রাখা হয়েছিল। এঁরা দুজনেই ছিলেন আমাদের সেল-ওয়ার্ডের উত্তর দিকের প্রাচীর-সংলগ্ন একটা ঘরে: বলা যায়, 'পুরনো বিশ' ও 'নতুন বিশ' সেল-এর মাঝামাঝি জায়গায়। ঢাকার কমরেডদের কাছেই শুনেছিলাম, মুনীর চৌধুরী এবং অজিত গুহ ১৯৪৯-৫০

সালের পর কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে সরে গিয়েছেন। কিন্তু বুদ্ধিজীবী হিসাবে ভাষা-আন্দোলনে তাঁরাও অংশ গ্রহণ না করে পারেন নি। তাঁদের ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছায় জানি না, দেখলাম জেল-কর্তৃপক্ষ ঐ দুজনকে অন্যান্য বন্দীদের থেকে আলাদা করে রেখেছেন এবং ওয়ার্ডের বাইরের রাস্তায় তাঁদের সান্ধ্য-ভ্রমণের সুযোগও দিয়েছেন। এই নজির তুলে ধবে অনুরূপ সুযোগের দাবীতে আমরাও চাপ সৃষ্টি করলাম জেল-কর্তৃপক্ষের উপর। অবশেষে এই দাবী স্বীকৃত হলো। 'পুরনো বিশ'-এর কমরেডরাও পেলেন এই সুযোগ। ব্যাপারটা সামান্য মনে হলেও সেদিন এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ভাষা-আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ যে অনেক উদ্ধত গম্বুজকে নুইয়ে দিয়েছে, ঘুঘু-জেলাব রহমান সাহেবের 'উদার' আচরণের মধ্যে আমরা সাময়িক ভাবে সেই চিহ্নই যেন খুঁজে পেলাম।

অন্যান্য দিক থেকেও জেলের মধ্যে নানা অনুকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। এগুলি বন্দী-জীবনের পক্ষে ছিল একান্ত জরুরী। বিভিন্ন ওয়ার্ডের মধ্যে গোপন যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও ভালোভাবে গড়ে উঠলো ; বাইরের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গেও এই সময় থেকে চালু হলো মোটামুটি নিয়মিত গোপন সংযোগ। ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য তাই আমাদের হাতে পৌঁছে গেল মে-মাসের মধ্যে। সম্ভবত, ঢাকা জেলে দীর্ঘকাল পরে কোনো আন্দোলন সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির মূল্যায়ন-সম্বলিত দলিল এত দ্রুত এই প্রথম এসে পৌঁছালো। এই দলিলে ভাষা-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট পার্টি যে-বক্তব্য উপস্থিত করেছিলেন অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের কাছে আমি আজ তার পূর্ণাঙ্গ পাঠ তুলে ধরছি। আমার খাতায় সেই দলিলটি যে-ভাবে লেখা আছে তাতে দেখা যাচ্ছে—ঐ দলিলটি রচনার তারিখ ১৯৫২ সালের ২৮এ ফেব্রুয়ারী। অর্থাৎ, আন্দোলন শুরু হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে

কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের কাছে তার বক্তব্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। সেই যুগে ভগ্নপ্রায় পার্টির এই কর্মতৎপরতা নিঃসন্দেহ আশাব্যঞ্জক। কমিউনিস্ট পার্টি ২৮এ ফেব্রুয়ারীর সেই দলিলে ভাষা-আন্দোলনের পর্যালোচনা প্রসঙ্গে লিখলেন :

"বাংলা ভাষার ন্যায্য অধিকার কামিয়াব করার শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের উপর নুরুল আমীন সরকারের পৈশাচিক দমন নীতির জবাবে পূর্ববঙ্গের সকল শ্রেণীর জনগণ যেমন তাহার অধিকারের আওযাজকে আরও জোরদার করিয়াছেন, ঠিক তাহার পাশাপাশি তাহারা আরও একটি আওয়াজ তুলিয়াছেন—"নুরুল আমীন সরকারের পদত্যাগ চাই।"

আজ হঠাৎ রাতারাতি এই আওয়াজ আসিয়া হাজির হয় নাই বা তথাকথিত "বাইরের প্ররোচনায়ও" পূর্ববঙ্গের চার কোটি একুশ লক্ষ নর-নারী মাতিয়া ওঠে নাই। গত সাড়ে চার বছর যাবৎ প্রতিদিন, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জনগণ মুসলিম লীগ শাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তদুপরি যখন সরকার জনগণের জাতীয় অধিকার ভাষার উপর হস্তক্ষেপ করিল তখন জনমতের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি রূপেই নুরুল আমীন সরকারের পদত্যাগের দাবী ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

গত সাড়ে চার বছর যাবৎ শ্রমিকশ্রেণী দেখিয়াছেন যে, যখন মুষ্টিমেয় ধনিকের নির্মম শোষণ, স্বল্প মজুরী, অনুপযুক্ত মাগ্‌গী ভাতা, ছাঁটাই প্রভৃতি তাহাদের জীবনকে অধিক হইতে অধিকতর দুঃখে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে, তখনও মুসলিম লীগ সরকার শ্রমিকের জীবনধারণের উপযোগী মজুরীর ব্যবস্থা না করিয়া "রাষ্ট্রের কল্যাণের" দোহাই দিয়া ধনিকের শোষণ সমর্থন করিতেছে।

পূর্ববঙ্গের সারা কৃষক সমাজ দেখিয়াছেন যে, লীগ সরকার "জমিদারী উচ্ছেদের" ভাওতা দিয়া জমিদারী শোষণকেই

বাঁচাইয়া রাখিতেছেন এবং জমিহীন, অন্নহীন কৃষক সমাজ গোলামীর জীবন যাপনে বাধ্য হইতেছেন। তাহারা দেখিয়াছেন, লীগ শাসনের দৌলতে মুষ্টিমেয় বিলাতী ও দেশীয় বড ব্যবসায়ী তাহাদের সোনার পাট পানির দবে লুটিয়া নিতেছে।

মধ্যবিত্তগণ প্রতিদিন অনুভব করিয়াছেন যে, নিত্যব্যবহার্য জিনিষের আকাশ-ছোঁয়া দাম তাহাদেব জীবনেব সুখ শান্তি নষ্ট কবিয়া দিয়াছে। বেকাবীর জ্বালা তাহাদেব জীবনকে অভিশপ্ত করিয়া তুলিয়াছে।

পূর্ববঙ্গের ছাত্রসমাজ তাহাদের চোখেব সামনে দেখিযাছেন স্কুল কলেজগুলিব চবম দুর্দশা। অথচ সবকাবী ব্যয়-ববাদ্দের অধিকাংশ ব্যয হয পুলিশ ও মিলিটাবী খাতে। তাহাবা বেদনাক্ত চিত্তে উপলব্ধি কবিয়াছেন যে, তাহাদেব শিক্ষালাভের পথ আজ রুদ্ধ। বুদ্ধিজীবীবাও দেখিযাছেন যে, লীগ শাসনেব অধীনে স্বাধীনভাবে চিন্তা কবা, সত্য কথা প্রচাব কবা অসম্ভব এবং দেশের কল্যাণকামী সংস্কৃতিমূলক বিষয চর্চা করিলে তাহাদেরকে বলা হয "যুক্তবংগেব সমর্থক।"

সবকারী দপ্তরেব কর্মচারীবৃন্দ দেখিযাছেন যে, পেটেব ক্ষুধাব তাড়নায় মাহিনা বৃদ্ধিব দাবী জানাইলে তাহাদেব মাথায় পড়ে পুলিশের লাঠি ও তাহাদেরকে বলা হয বাষ্ট্রদ্রোহী।

জাতীয ধনিকশ্রেণী দেখিযাছেন যে, পূর্ববংগেব ব্যবসা-বাণিজ্যেব উপর মুষ্টিমেয বিদেশী পুঁজিপতি ও তাহাদেব তাঁবেদার এ-দেশেব গুটি কতক বড ব্যবসায়ীব একচেটিযা অধিকাব এবং এখানকাব ধনিকশ্রেণীর উন্নতিব পথ রুদ্ধ।

সমস্ত নারীসমাজ অনুভব কবিয়াছেন, লীগ শাসনেব অধীনে সামাজিক মুক্তি বা নাবী প্রগতিব ধ্বনি তুলিলে তাহাদিগকে 'ইসলামেব' নামে সামাজিক অনুশাসনের ভয় দেখাইয়া দাবাইযা দেওয়া হয়।

পূর্ববংগের সমস্ত জনগণ চোখের সামনে দেখিয়াছেন লীগ শাসনের অধীনে খুলনার দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার নর-নারীর মৃত্যু। তাহারা দেখিয়াছেন, দুনিয়ার কোন স্থানে কোন দিন যা ঘটে নাই মুসলিম লীগ শাসনে তাও সম্ভব হইয়াছে—১৬ টাকা সের দরে লবণ বিক্রয় হইয়াছে। জনগণ দেখিয়াছেন, পূর্ববংগের শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র-যুব ও নারী আন্দোলনের শত শত কর্মীকে বিনা বিচারে বা বিচারের প্রহসনে জেলে আটক রাখা হইয়াছে। এখানে সত্য কথা বলিলে, জনগণের পক্ষে কথা বলিলে বা সরকারের বৈধ সমালোচনা করিলেও তাহাকে "ইসলামের শত্রু" "রাষ্ট্রের দুষমণ" বলিয়া জেলে আটক রাখা হয়। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রূপেই জনগণ আবার দেখিয়াছেন যে, আবুল হাসেম, আব্দুর রসিদ তর্কবাগীশ, মাদার বক্স প্রভৃতি লীগ নেতাগণ নুরুল আমীন সরকারের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া "রাষ্ট্রের দুষমণ" অভিযোগে কারারুদ্ধ হইয়াছেন।

সর্বোপরি জনগণ দেখিয়াছেন যে, এই সরকার তাহাদের জাতীয় অধিকার, তাহাদের মুখের ভাষাও কাড়িয়া নিতে চায়। জনগণ চোখের সামনে দেখিয়াছেন যে, ভাষার অধিকারের আন্দোলন করার জন্য তাহাদের সন্তান-সন্ততিকে কুকুর-বিড়ালের মত রাস্তায় গুলি করিয়া মারা হইয়াছে। এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের ভিতর দিয়াই লীগ শাসনের সমস্ত কদর্যতা ও বীভৎসতা জনগণের সামনে উলঙ্গভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

তাই, জনগণের পেটের ভাত, ঘরের সুখ-শান্তি ও মুখের ভাষা অপহরণকারী নুরুল আমীন সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের সঞ্চিত বিক্ষোভ আজ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। যে-বুলেট জব্বার-রফিকউদ্দিন-বরকতের কলিজা ভেদ করিয়া দিয়াছে সেই বুলেটের আঘাতে জনগণের বহু মোহও আজ ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। মোহ-মুক্ত জনগণের অন্তরের অন্তস্থল হইতে ভাষার

অধিকারের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে—
"নুরুল আমীন সরকারের পদত্যাগ চাই।"
গণ-আন্দোলনে ভীত সরকার এখন চীৎকার করিয়া বলিতেছে যে, তাহারা ভাষা অধিকার মানিয়া নিয়াছে, এখন আন্দোলনের আর কোন প্রয়োজন নাই। জনগণের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিবার জন্য লীগ নেতারা ও সরকার ধর্মের দোহাই পাড়িতেছে এবং আওয়াজ তুলিয়াছে যে, "বিদেশী চরগণ" উস্কানী দিয়া বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতেছে। আমাদের পার্টির বিরুদ্ধেও সরকার কুৎসাপূর্ণ প্রলাপ বকিতে সুরু করিয়াছে। সরকার বীভৎস দমননীতি চালাইয়া, আইনসভার অধিবেশন স্থগিত রাখিয়া নিজের মন্ত্রীত্বের গদী টিকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে।
কিন্তু সুদীর্ঘ সাড়ে চার বৎসরের জনগণের জীবনের গভীর অভিজ্ঞতা হইতে যে-সব গণ-দাবী আজ উঠিয়াছে গুলি-বারুদ দ্বারা তাহাকে দমাইয়া দেওয়া সম্ভব নয়। গণ-আন্দোলনের আঘাতে শাসকগোষ্ঠী যে-গভীর সঙ্কটে পড়িয়াছে ধর্মের দোহাই দিয়া তাহা হইতে পরিত্রাণের পথ নাই। বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য সরকার যে-সুপারিশমূলক প্রস্তাব পাশ করিয়াছে জনগণ সে প্রস্তাবের উপর নির্ভর করিতে পারে না। কেননা ওয়াদা দিয়া ওয়াদা ভঙ্গ করাই লীগ সরকারের চিরাচরিত নীতি। তাই আজিকার এই আন্দোলন সরকারী ভাওতায় বিভ্রান্ত হইবে না।
এ কথাও সত্য যে, লীগ সরকার আজ আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে যত বিকট চীৎকারই করুক না কেন পূর্ববংগের কমিউনিস্টগণ এখানকার প্রতিটি আন্দোলনে সাহায্য করিবেই। ইহার জন্য সরকার পশু শক্তির সাহায্যে আমাদের পার্টির শত শত কর্মীকে জেলে দিতে পারে, গুলি করিয়া হত্যা করিতে পারে, ফাঁসীতে লটকাইতে পারে। কিন্তু পূর্ববংগের জনগণের সমর্থনেই আমাদের

পার্টির শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে এবং জনগণের সমর্থন পুষ্ট হইলে আমাদের পার্টিকে ধ্বংস করার শক্তি লীগ সরকারের নাই। পূর্ববঙ্গের সাড়ে চার কোটি জনগণের এই গৌরবময় আন্দোলনকে "বিদেশী চরদের" উস্কানী বলিয়া কলঙ্ক দেওয়াও জনবিরোধী লীগ নেতা ও সরকারের পক্ষেই সম্ভব। আজ পাকিস্তানে যদি কেহ "বিদেশী" শক্তির প্রেরণায় চালিত হইয়া থাকে তাহা হইলে লীগ সরকারই সেই দোষে দোষী। লীগ সরকারই পাকিস্তানকে বৃটিশ কমনওয়েলথের ভিতর রাখিয়া পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। লীগ সরকারই পাকিস্তানের সামরিক দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে বৃটিশ অফিসারদের বহাল রাখিয়াছে। লীগ সরকারের অধীনেই রাষ্ট্র-যন্ত্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বৃটিশ শিক্ষিত বড় বড় আমলারা অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই লীগ সরকারই আজও আমাদের দেশের রাষ্ট্রের কাজে কার্যতঃ ইংরাজী ভাষাকেই চালু রাখিয়াছে। লীগ সরকারই পাকিস্তানে বৃটিশ পুঁজিকে পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় করিয়া রাখিয়াছে এবং "সাহায্য" গ্রহণের নামে আমেরিকান ধনকুবেরদের শোষণও এখানে ডাকিয়া আনিতেছে। লীগ সরকারই তাহার ইঙ্গ-মার্কিন প্রভুদের ইঙ্গিতে যুদ্ধলিপ্সু ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিগুলিকে নির্লজ্জ সমর্থন জানাইতেছে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী, দেশের জমিদার ও কোটিপতি ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষক লীগ সরকারের হাতে দেশের ভাগ্য নিরাপদ নয়। এই সরকার পূর্ববংগের অধিবাসীদের তথা পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিবে ইহা আজ বিশ্বাস করা যায় না। নুরুল আমীনের দ্বিতীয় বেতার বক্তৃতায় এই ইঙ্গিত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, সরকার ইংরেজী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালু রাখিতে চায়। কিন্তু আমরা চাই ইংরাজী ভাষার বদলে পাকিস্তানের জনগণের প্রধান প্রধান ভাষাগুলিকে রাষ্ট্রে সমান মর্যাদা দেওয়া হোক

এবং পাকিস্তান একটি স্বাধীন সুখী ও গণতান্ত্রিক রিপাবলিক হিসাবে গড়িয়া উঠুক। এই দুইটি উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্যই ভাষার অধিকারের আন্দোলনকে আগাইয়া নেওয়া যেমন প্রয়োজন, ঠিক তেমনি প্রয়োজন পূর্ববংগে লীগ মন্ত্রীসভার বদলে জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বমূলক মন্ত্রীসভা গঠন। তাই জনগণের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরাও দাবী করিতেছি—জনগণের আস্থাহীন নুরুল আমীন মন্ত্রীসভা অবিলম্বে পদত্যাগ করুক এবং যুক্তনির্বাচন প্রথায়, প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নিয়মে ও প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হউক। এই সব দাবী কামিয়াব করিবার জন্য আজ চাই আরো সুসংগঠিত গণ-আন্দোলন। যে আন্দোলনের চাপে নুরুল আমীন সরকার আনুষ্ঠানিক ভাবে হইলেও ভাষার সুপারিশমূলক প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে সেই আন্দোলনকেই শ্রমিক-কৃষকদের ভিতরেও আরও ছড়াইয়া দিয়া ও সংগঠিত করিয়া নুরুল আমীন সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করানো ও বাংলা ভাষার অধিকার কায়েম করা সম্ভব। শহীদদের রক্তের ভিতর দিয়া ভাষা আন্দোলনের যে অগ্রগতি হইয়াছে, গণ-আন্দোলনের আঘাতে শাসকগোষ্ঠী ভিতর যে সঙ্কটের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই পটভূমিকায় আন্দোলনের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে সরকারী বিভেদনীতিকে পরাস্ত করিয়া বাঙালী-অবাঙালী ও সমস্ত শ্রেণীর ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করা ও শত সহস্র জনজমায়েতের মধ্য দিয়া বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা ও নুরুল আমীন সরকারের পদত্যাগের দাবীকে অমোঘ করিয়া তোলার জন্য সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির নিকট আমরা আবেদন জানাইতেছি। আগামী নির্বাচনের ভিতর দিয়া মুসলিম লীগের কুশাসনের অবসান করিয়া দেশের প্রগতিকে একধাপ আগাইয়া নেওয়ার জন্য পূর্ববংগের সমস্ত

প্রগতিশীল দল ও প্রতিষ্ঠানকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবেদনও জানাইতেছি।"

পূর্ববাঙলার গোপন কমিউনিস্ট পার্টি ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কে পর্যালোচনায় সেদিন ও-দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার মোটামুটি সঠিক মূল্যায়নই করেছিলেন। পূর্ববাঙলার বিভিন্ন শ্রেণীর উপব শোষকশ্রেণীর নিপীড়নের যে-চিত্র ঐ দলিলে উদ্ঘাটিত হয়েছে তাব মধ্যে সত্যিই কোনো আতিশয্য ছিল না। তাছাড়া তৎকালীন শাসকদেব শ্রেণী-চরিত্র এবং দেশী-বিদেশী মূল শত্রুর অবস্থানকেও কমিউনিস্ট পার্টি সঠিকভাবেই চিনিয়ে দিতে পেরেছিলেন। আর, সর্বহারার বিপ্লবী পার্টি, প্রকাশ্য বা গোপন— কোনো অবস্থাতেই-যে শাসকেব বক্ত-চক্ষুকে ভয় পায় না, জেল-গুলি-হত্যা-ফাঁসিকে তারা-যে গ্রাহ্য কবে না, বিগত তেইশটি বছরে পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি বারংবাব তাবই প্রমাণ দিয়েছেন। জঙ্গী-জল্লাদ ইয়াহিয়ার ফ্যাশিস্ত বর্বরতা, কামান-বন্দুক-ট্যাঙ্কও যে আজ বাঙলাদেশের কমিউনিস্টদেব স্বাধীন-সুখী-সাবভৌম বাঙলাদেশ গড়াব সঙ্কল্প থেকে এতটুকু টলাতে পারবে না, এ-বিষয়েও আমি স্থির নিশ্চয়।

ভাষা-আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টিব সময়োচিত বলিষ্ঠ ভূমিকাকে সেদিন আমরা জেলের মধ্যে প্রায় সবাই সপ্রশংস দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছিলাম। গণ-আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং তাকে সুসংগঠিত করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বান-যে ব্যর্থ হয়নি ১৯৫২ সালের ২৬এ এপ্রিল গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল আদর্শের উপব ভিত্তি করে 'পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠা এবং ঐ বছবের নভেম্বর মাসে পূর্ববাঙলার অসংগঠিত ছাত্র-সংস্থাগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে 'পূর্বপাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন' গঠন তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাসে মাহমুদ আলির নেতৃত্বে অসাম্প্রদায়িক আদর্শে গঠিত রাজনৈতিক দল 'ডেমোক্রাটিক পার্টি'—এই লক্ষ্যে

আর একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।*

আমি পূর্বেই বলেছি, ভাষা-আন্দোলনের পর কিঞ্চিৎ অনুকূল পরিস্থিতিতে জেলের মধ্যে সবাই একসঙ্গে থাকার জন্য আমরা কর্তৃপক্ষের উপর ক্রমান্বয়ে চাপ সৃষ্টি করতে থাকি। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম যে, জেলের সীমিত শক্তি ও প্রতিভাকে যদি একজায়গায় কেন্দ্রীভূত করা না-যায় তবে জেলেব মধ্যে রাজনৈতিক বন্দীরূপে আমাদের ভালোভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং এই প্রচেষ্টায় আমরা এবার উঠে-পড়ে লাগলাম।

ইতিমধ্যে জেলখানায় আরও দু-জন নেতা এসে রাজ-অতিথির সংখ্যা বৃদ্ধি করলেন। এঁদেব একজন ঢাকার প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা জ্ঞান চক্রবর্তী এবং অন্যজন দিনাজপুরের প্রিয় নেতা, তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম পরিচালক কমরেড সুশীল সেন। কমরেড জ্ঞান চক্রবর্তী সেই সন্ত্রাসবাদী আমল থেকে ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন জেলে ও দেউলী বন্দীশিবিরে দীর্ঘকাল কাটিয়ে অবশেষে মার্কসবাদের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর জীবনের ঈপ্সিত লক্ষ্য। জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর তাই তিনি সন্ত্রাসবাদের পথ পরিত্যাগ করে ঢাকা জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দমননীতিতে পর্যুদস্ত ঢাকার গোপন কমিউনিস্ট পার্টির তিনিই ছিলেন অন্যতম কর্ণধার। আত্মগোপন করে কাজ করার সময় ভাষা-আন্দোলনের পরে কিংবা এরই সমসাময়িক কালে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় প্রতিক্রিয়াশীল লীগ-সরকার। কমরেড সুশীল সেনও পুরনো বিপ্লবী। তাঁকেও অগ্রসর হতে হয়েছে জেল আর অন্তর্বীণ-জীবনের অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়ে। উত্তরবঙ্গের কৃষক-আন্দোলনেব প্রধানতম

---

* একদা 'প্রগতিশীল' মাহমুদ আলি এখন পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির অন্যতম স্তম্ভ। মুক্তিযুদ্ধ চলার সময় এই বিশ্বাসঘাতক বাঙালি-সন্তান : হিয়াব প্রতিনিধি রূপে জাতিসংঘে ঘৃণ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। গণপ্রজাতান্ত্রিক বাঙলাদেশ সরকার এই ব্যক্তিটিকেও বিশ্বাসঘাতক রূপে ঘোষণা করেছেন।—লেখক

ঘাঁটি দিনাজপুর জেলায় চল্লিশের দশকে তাঁর ও কমরেড বিভূতি গুহ-র নেতৃত্বে পার্টি সংগঠন গড়ে ওঠে দৃঢ় ভিত্তির উপর। তিনি কবে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন আজ আর তা মনে করতে পারছিনে। তবে সুশীলদা ঢাকা জেলে এসেছিলেন ভাষা-আন্দোলনের পরবর্তীকালে, এটা এখন বেশ মনে পড়ছে। আমার জেলের খাতার টুকিটাকি নানা লেখার মধ্যেও এর প্রমাণ ছড়িয়ে আছে।

এই দু-জন প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা সম্পর্কে একটু বিস্তারিত বলার বি শষ প্রয়োজন আছে। এঁরা ঢাকা জেলে আসার আগেই রাজনৈতিক বন্দীরা বিচ্ছিন্নভাবে পাচটি ওয়ার্ডে অবস্থান করছিলেন। কারাবাসী বন্দীদের মধ্যে গণ-আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় বহু কর্মী ছিলেন, এ-কথা সত্যি। কিন্তু ঢাকা জেলের তৎকালীন বিপর্যস্ত অবস্থায় পার্টিগতভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নেতার সত্যিই অভাব ছিল। কমরেড অনিল মুখার্জি, জ্ঞান চক্রবর্তী, সুশীল সেন, অমিয় দাশগুপ্ত, রওশন আলি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ভাষা-আন্দোলনের পর সেই অভাব অনেকখানি পূরণ করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে ঢাকা ও রাজশাহী জেলেব অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। দুই জেলেই হঠকারী রণদিভেনীতি খুব নিষ্ঠার সঙ্গেই অনুসৃত হয়েছিল। বরং বলা যায়, হঠকারী নীতিকে একটু বেশি করে এবং আরো দৃঢ়তার সঙ্গে অনুসরণ করেছিলেন রাজশাহী জেলের কমরেডরা। ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণও রাজশাহী জেলে ছিল সর্বাধিক। পরবর্তীকালে হতাশার কালো ছায়া দুই জেলেই পক্ষবিস্তার করেছিল। কিন্তু যে-পরিমাণ অনৈক্য ঢাকা জেলকে গ্রাস করেছিল, শুনেছি, রাজশাহী জেলে সেই অনৈক্যের অস্তিত্ব ছিল খুবই সীমিত।

এই পার্থক্যের একটা বাস্তব কারণ ছিল। ঢাকা জেল যেহেতু বাজধানীতে অবস্থিত, সেইহেতু রাজনৈতিক ঝামেলার হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য অবিভক্ত বাঙলার প্রায় সমস্ত পরিচিত কমিউনিস্ট

নেতাকে রাজশাহীর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী রাখাই বোধহয় লীগ-সরকারের কাছে সঙ্গত বলে বিবেচিত হয়েছিল। অবিভক্ত বাঙলার কৃষক-সভার সভাপতি কমরেড কৃষ্ণবিনোদ রায়, কৃষক-সভার সম্পাদক মনসুর হাবিব, পাবনার কমিউনিস্ট নেতা অমূল্য লাহিড়ী, যশোহরের কমিউনিস্ট নেতা আবদুল হক (বর্তমানে বাঙলাদেশের চীন-পন্থী কমিউনিস্ট-উপদলের নেতা), ময়মনসিংহের কৃষকনেতা নগেন সরকার, চট্টগ্রামের কমিউনিস্ট নেতা পূর্ণেন্দু দস্তিদার* দিনাজপুরের কৃষকনেতা গুরুদাস তালুকদার এবং হাজি মহম্মদ দানেশ, রংপুরের ছাত্রনেতা শান্তি সান্যাল, ঢাকার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতা রণেশ দাশগুপ্ত, পার্টি-নেতা অমূল্য সেন, খুলনার কৃষকনেতা কুমার মিত্র, ছাত্রনেতা স্বদেশ বসু, সন্তোষ দাশগুপ্ত, ফরিদপুরের কমিউনিস্ট নেতা সত্য মৈত্র, বগুড়ার কৃষকনেতা ফটিক রায়, রাজশাহীর মহিলানেত্রী ইলা মিত্র, বরিশালের মহিলা-নেত্রী মনোরমা বসু, ছাত্রনেতা প্রশান্ত দাশগুপ্ত প্রমুখ পূর্ববাঙলার প্রায় সমস্ত জেলার নেতৃস্থানীয় কমরেডদের এক বিরাট অংশ ১৯৫০ থেকে ৫২ সালের কোনো না কোনো সময়ে আটক ছিলেন এই রাজশাহী জেলে। ফলে, রাজশাহী জেলে প্রচণ্ড হঠকারিতা সত্ত্বেও তার প্রতিক্রিয়াজনিত হতাশা ও অনৈক্যের ঝোঁককে পার্টি-নেতৃত্ব তত্ত্বগত ও সাংগঠনিকভাবে প্রশমিত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। জেলের বদ্ধ পরিবেশে যেটুকু তিক্ততা ও অনৈক্য স্বাভাবিক, রাজশাহী জেলে তার চেয়ে খুব বেশি একটা কিছু ঘটেনি। পরবর্তীকালে, অর্থাৎ ১৯৫৪ সালে আমার রাজশাহী জেলে বন্দী-জীবনের অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য কমরেডদের কাছে শোনা তথ্যের উপর নির্ভর করেই

* বাঙলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। কমরেড পূর্ণেন্দু দস্তিদার চট্টগ্রামের পাক-সামরিক চক্রের বেড়াজাল অতিক্রমণের কালে ১৯৭১ সালের মে মাসে ভারতের সীমান্ত-অঞ্চলে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কোনো এক ভারতীয় সামরিক শিবিরে হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করেন। কলকাতায় আগত তাঁরই এক সঙ্গীর মুখে শুনেছি, সামরিক শিবিরের জনৈক চিকিৎসক তাকে বাঁচাবার প্রাণপণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। —লেখক

আমি সাধারণভাবে এই তুলনামূলক চিত্র আজ তুলে ধরছি।

সংক্ষেপে বলা যায়, অভিজ্ঞ পার্টি-নেতাদের শারীরিক উপস্থিতি এবং প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে রাজনৈতিক মতপার্থক্য সত্ত্বেও রাজশাহীজেলের ঐক্যবদ্ধ জীবনযাত্রা মোটামুটি অব্যাহত ছিল, কিন্তু ঢাকা জেলে যোগ্যতম পার্টি-নেতাদের অবর্তমানে ঐক্যবদ্ধ জেল-জীবন ঐসময় পঙ্গু হয়ে পড়ে। ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলন পর্যন্ত এই নৈরাশ্য ও নৈরাজ্যের কাল বিস্তৃত ছিল।

যাহোক, 'পুরনো বিশ' সেল-এ কমরেড অনিল মুখার্জি, 'নতুন বিশ'-এ কমরেড সুশীল সেন, জেনারেল ওয়ার্ডে কমরেড জ্ঞান চক্রবর্তী এবং 'পুরনো হাজত'-এ কমরেড অমিয় দাশগুপ্ত-র উপস্থিতি ও নেতৃত্ব ঢাকা জেলের বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য কাটাতে যথেষ্ট সাহায্য করে। আমাদের ঐক্যবদ্ধ জীবনযাত্রা পরিচালনার দাবীতে এই সময় জুন-জুলাই মাসে সম্ভবত আমরা দু-একবার প্রতীক অনশন ধর্মঘটেও শামিল হয়েছিলাম। জেল-কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারছিলেন, আমাদের এই ন্যায়সঙ্গত দাবী আর ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তাই ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে, মনে হচ্ছে বিজয়ার দিনে, আমরা সকল ওয়ার্ডের (মহিলা ওয়ার্ড বাদে) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীরা জেনারেল ওয়ার্ডে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেলাম।

মাত্র একদিন—সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা, আমরা দীর্ঘকাল পরে বন্দী-বন্ধুরা পরস্পরকে বুক ভরে আলিঙ্গন করলাম। সে-এক অপূর্ব আনন্দের দিন! অনেক পরিচিত সহকর্মী কাছে থেকেও দূরে ছিলেন। জেলের প্রাচীর তাঁদের আড়াল করে রেখেছিল। আবার অনেকের শুধু নামটুকু জানতাম, দেখি নি কোনোদিন। অথচ গোপন চিঠিপত্রে ইতিমধ্যে যোগাযোগ ঘটেছিল। এই সর্বপ্রথম আমরা সেই পরিচিত-অপরিচিত, পূর্ববাঙলার সকল জেলার সব বয়সের কমরেডরা, সব অনৈক্য, সকল ভেদাভেদ ভুলে, আমাদের হাতের মুঠোয় ধরা বারোটি ঘণ্টার প্রতিটি সেকেণ্ড আর মিনিটকে

যেন বারো যুগের আকাঙ্ক্ষিত প্রীতিরসে মধুময় করে তুলতে চাইলাম। সেদিনের প্রীতিভোজ, আলোচনা-বৈঠক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর খেলাধূলার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, নেই-নেই করেও এই জেলে আমাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি‍র জোর কতখানি, কী বিশাল !

সত্যিই এই মিলন ছিল অনাস্বাদিতপূর্ব। অন্তত একটা দিনের জন্য আমরা সব ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে নিজেদের তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলাম। চেনা-অচেনা সমস্ত বন্ধুই মনে মনে কামনা করেছিলাম, ঢাকা জেলের বিচ্ছিন্নতার দিন শেষ হোক, চির বাস্তবায়িত হোক আমাদেব এই মিলন-আকাঙ্ক্ষা। তাই সন্ধ্যার প্রাক্কালে আবার যখন আমবা পা বাড়ালাম প্রাচীরঘেরা স্ব স্ব আস্তানার দিকে তখন দেখেছিলাম অনেক বন্ধরই বেদনা-ম্লান মুখ, চোখের কোণে ভালোবাসাব টলমল উদ্গত অশ্রু।

আমি কাব্যি করার জন্য এসব লিখছি না। সত্যি ঘটনাকেই বিবৃত করছি মাত্র। যাঁদের নির্জন কারাবাসের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা বুঝতে পারবেন জেলখানায় মন কত নরম, কত স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে। একটু স্নেহ-প্রীতি-ভালোবাসার জন্য মনেব গভীরে জমা হতে থাকে কী অসম্ভব কাঙালপনা !

এমনি মন নিয়ে যখন আমরা পরস্পরের নৈকট্য গভীরভাবে কামনা করছি, জেলের মধ্যে শুরু করেছি আবার সমবেত পঠন-পাঠন, তখন আর এক নতুন উপসর্গ দেখা দিল।

ভাষা-আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার জন্য নুরুল আমিন-সরকার প্রথম থেকেই আন্দোলনকে 'বিদেশী চর' ও 'কমিউনিস্ট দুশমন'-দের অন্তর্ঘাতমূলক কাজ বলে চীৎকার শুরু করেছিলেন। এই সময় লীগ-সরকার ঘোষণা করলেন, 'বিদেশী চর' ও কমিউনিস্ট দুশমন'-দের হাত থেকে পূর্ববাঙলাকে রক্ষা করার জন্য তারা পাশপোর্ট-ভিসা প্রথার প্রবর্তন করবেন। এর অন্তরালে লুকিয়ে ছিল সেই চিরাচরিত

ভারত-বিদ্বেষ। কিন্তু লীগশাহীর ইন্টেলিজেন্স বিভাগ একে আরও একটা উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চাইলেন। পাশপোর্ট-ভিসা প্রথার সুযোগে পূর্ববাঙলা থেকে যত বেশি সম্ভব কমিউনিস্ট-বিতাড়ন সম্ভব সেদিকে লক্ষ্য রেখেই গুপ্তচর-বিভাগ সম্ভবত একটা পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। তাই গুপ্তচর-বিভাগের লোকেরা ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস থেকেই রাজবন্দীদের সঙ্গে তাদের রুটিন-মাফিক সাক্ষাৎকারের সময় বলতে আরম্ভ করলেন, যে-সব রাজবন্দী মুক্তির পরে পূর্ববাঙলা ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেবেন, পাশপোর্ট-ভিসা প্রথা প্রবর্তনের পূর্বে তাদের বিষয়টি সরকার অবশ্যই বিচার-বিবেচনা করে দেখবেন।

বিভিন্ন সূত্র থেকেই এই খবর সমর্থিত হচ্ছিল। কিছু কিছু কমরেড আই.বি. বিভাগের লোকদের এই 'টোপ' সম্পর্কে অন্যান্য ওয়ার্ডকে সতর্ক করে দিলেন। এই সতর্কীকরণের প্রয়োজন ছিল। কারণ, আই. বি. বিভাগের এই আপাত নির্দোষ 'টোপে'র মধ্যে ছিল ষড়যন্ত্রের আভাস। তারা চাইছিল আমাদের দোদুল্যমানতার সুযোগ গ্রহণ করতে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা আজ নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। জেলের মধ্যে সে সময় এমন কিছু 'হিন্দু' কমরেড ছিলেন, যাঁরা পূর্ববাঙলার পরিবর্তিত অবস্থায় মুক্তির পর পশ্চিমবঙ্গে চলে যাওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। যে-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থায় দেশবিভাগের পরেও তাঁরা পূর্ববঙ্গে ছিলেন কিংবা রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করে গ্রেপ্তার বরণ করেছিলেন, বিগত কয়েক বছরে, বিশেষ করে পঞ্চাশের দাঙ্গার পর, ব্যাপক বাস্তুত্যাগের ফলে সেই সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। অনেক কমরেডের পরিবার-পরিজন দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন। অনেকের স্ত্রী-পুত্র চলে গিয়েছিলেন পশ্চিম বাঙলায়। এমনকি, কোনো কোনো কমরেডের হাতেগড়া রাজনৈতিক অঞ্চলের ভিত্তিও লোপাট হয়ে গিয়েছিল পঞ্চাশের

ধাক্কায়। সুতরাং কিছু কমরেডের উপরোক্ত মানসিকতার মধ্যে খুব একটা অস্বাভাবিকতা ছিল না।

কিন্তু আমাদের কাছে প্রশ্নটা ছিল নীতিগত, আংশিকভাবে সংগঠনগত। প্রথমত, বন্দী অবস্থায় প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুক্তি আদায় করা কমিউনিস্টরা যে-বিপ্লবী নৈতিকতার পূজারী তার পরিপন্থী। দ্বিতীয়ত, পূর্ববাঙলায় থাকা-না-থাকার সিদ্ধান্ত মুক্তজীবনে স্বাধীনভাবে গ্রহণ না করে গুপ্তচর দপ্তরের মর্জির উপর ছেড়ে দেওয়া দুর্বল চিত্ততারই পরিচায়ক। তৃতীয়ত, ব্যক্তি-মানুষের উপর এই সুযোগ গ্রহণের অধিকার ছেড়ে দিলে জেল-জীবনে নানা প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেবে এবং জেলের ও বাইরের সংগঠনকে তা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। সুতরাং নানা আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, বাদ-বিসম্বাদের পর ঢাকা জেলের বিভিন্ন ওয়ার্ডের দু-চারজন কমরেড বাদে প্রায় সকল কমরেডই একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। সেই সিদ্ধান্তের মূল কথা ছিল: গুপ্তচর-বিভাগের কর্মচারী কিংবা লীগ-সরকারের কাছে মুক্তির প্রশ্নে আমরা কোনো প্রতিশ্রুতিপালনে অঙ্গীকারবদ্ধ হব না। বিনাশর্তে মুক্তিই হবে আমাদের দাবী। পূর্ব-বাঙলায় থাকবো-কি-থাকবো-না, বন্দী অবস্থায় তা বলতেও আমরা প্রস্তুত নই। মুক্ত আলো-হাওয়ায় এ-সম্পর্কে আমরা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো।

এই বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সেদিন নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কমরেড অনিল মুখার্জি এবং 'পুরনো বিশ' সেল-এর কমরেডরা। মূলত, 'পুরনো বিশ' সেল-এর সিদ্ধান্তসহ কমরেড অনিল মুখার্জির চিঠি পাওয়ার পর আমরা আলোচনায় বসেছিলাম। যার মনে যাই থাকুক না কেন এবং এই প্রশ্নে 'নতুন বিশ' সেল-এর কমরেডদের নানা ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত আমরা সকলেই উপনীত হলাম ঐ একই সিদ্ধান্তে।

তবু ভুল বোঝাবুঝির হাত এড়ানো গেল না। অক্টোবর মাসে

আমাদের 'নতুন বিশ' থেকে মুক্তি পেলেন কমরেড অমর চক্রবর্তী। তারপর ১৯৫২ সালের ১৮ই অক্টোবর কমরেড বেণু ধরকে মুক্তি দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হলো কুষ্টিয়া জেলে। সেখান থেকেই কমরেড ধর মুক্তি পেয়ে চলে গেলেন পশ্চিম বাঙলায়। আমি যতদূর জানি, বেণু ধর মুক্তি পেয়েছিলেন তাঁর প্রভাবশালী আত্মীয়-স্বজনদের প্রচেষ্টায়। তবু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভুল বোঝাবুঝিটা চরমে উঠলো। কোনো কোনো কমরেডের ধারণা হলো, আমাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত অমান্য করেই বুঝি-বা কেউ কেউ এইভাবে মুক্তির গোপন প্রচেষ্টায় লিপ্ত। ফলে, ২৪এ অক্টোবরের এক সভায় চট্টগ্রামের হাসি দত্ত এবং নারায়ণগঞ্জের কমরেড সতীশ ভদ্র প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন, সভায় তুলকালাম কাণ্ড বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হলো। এরপর ১৯৫২-৫৩ সালে পাশপোর্ট-ভিসা প্রবর্তনের আগে আমাদের সেল-ওয়ার্ড থেকে বোধহয় মুক্তি পেলেন কমরেড শিবানী আচার্য এবং কমরেড সুশীল সেন। সুশীলদার মতো প্রবীণ কমরেডও শেষপর্যন্ত পূর্ববাঙলা ছেড়ে চলে গেলেন, এটা তৎকালে বহু বন্দী-কমরেডের মনে ভীষণ আঘাত দিয়েছিল। মোটের উপর, ঢাকা জেলের রাজবন্দীদের মধ্যে এমনি ধরনের দু-চারজন কমরেড ছাড়া পাশপোর্ট-ভিসা প্রথা প্রবর্তনের পূর্বে মুক্তির সুযোগ আর কেউ পাননি কিংবা গ্রহণও করেন নি।

কিন্তু রাজশাহী জেলে এ-সম্পর্কিত চিত্রটি ছিল প্রায় বিপরীত। রাজশাহী জেলের যে-নেতৃত্ব সর্বাধিক ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে কমরেডদের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন, সেই নেতৃত্ব পাশপোর্ট-ভিসা প্রবর্তনকালে সরকারী টোপে অনায়াসে প্রভাবিত হলেন। শুনেছি, এই প্রশ্নে রাজশাহী জেলের কমরেডদের মধ্যে তীব্র মতপার্থক্য দেখা দেয় কিন্তু শেষপর্যন্ত অনেক কমরেডই নাকি পাশপোর্ট-ভিসা প্রবর্তনকালের সুযোগ গ্রহণ করে পরিবর্তিত অবস্থায় জেল থেকে পূর্ববঙ্গ ত্যাগের প্রতিশ্রুতি প্রদানের মধ্যে কোনো অন্যায় খুঁজে পান নি কিংবা একে

নীতি-বিগর্হিত কাজ বলেও মনে করেন নি। সুতরাং বলা যায়, রাজশাহী জেলের কমরেডদের অন্তত একাংশ এ-ব্যাপারে ঢাকা জেলের কমরেডদের বিপরীত সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছিলেন। আর, এরি পরিণতি স্বরূপ কমরেড কৃষ্ণবিনোদ রায়, মনসুর হাবিব, সুবোধ রায় প্রমুখ কয়েকজন নেতা এবং কিছু সাধারণ কমরেড পাশপোর্ট-ভিসা প্রথা প্রবর্তনের পূর্বেই পূর্ববাঙলা ত্যাগ করে পশ্চিম বাঙলায় চলে আসেন। রাজশাহী জেলের কমরেডদের কাছেই শুনেছি, সে-সময় কমরেড কৃষ্ণবিনোদ রায়ের কাছে লিখিত (মতান্তরে মনসুর হাবিবের কাছে লিখিত) পশ্চিম বাঙলার প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মুজফ্ফর আহমদের একখানি ব্যক্তিগত চিঠিই নাকি রাজশাহী জেল-নেতৃবৃন্দের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হয়। মোটের উপর, কমরেড কৃষ্ণবিনোদ রায়, মনসুর হাবিবের মতো সুপরিচিত কমিউনিস্ট নেতারা পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একদা একটি ভিন্ন দেশের পার্টির দায়িত্ব গ্রহণ করে সে-দেশের বিপ্লবী স্বার্থের অংশীদার হয়েছিলেন এবং শেষকালে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সেই দেশ এবং পার্টি তাঁদের ছেড়ে চলে আসতে হলো, বন্দী-কমরেডদের কাছে এ-এক বেদনাদায়ক স্মৃতি।

কিন্তু এইসব ঘটনা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট হিসেবে আমাদের গর্ব করার মতো কিছু সম্পদও স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত রয়েছে। মধ্যবিত্ত-নেতৃত্বের এক অতি সামান্য অংশের মধ্যেই এই দোদুল্যমানতা সীমাবদ্ধ ছিল। শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের বিপুল গরিষ্ঠ অংশ এবং মধ্য-স্তরের নেতৃত্বের প্রায় সর্বাংশ রাজশাহী জেলে গৃহীত সিদ্ধান্তের সুযোগ গ্রহণ না করে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের উর্ধ্বে সেদিন স্থাপন করেছিলেন তাঁদের বৈপ্লবিক আদর্শকে। আজ যখন দেখি, সেই বিপ্লবী আদর্শে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট নেতারা এবং তাঁদের হাতেগড়া হাজার হাজার তরুণ কমিউনিস্ট কর্মী সমস্ত দুঃখ-কষ্ট-লাঞ্ছনাকে অগ্রাহ্য করে, সামরিক একনায়ক আয়ুবের আমলে

আঘাতে আঘাতে গুঁড়িয়ে দিয়ে ফ্যাশিস্ত-জল্লাদ ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন, ঝড়ের বেগে সংহত করছেন পূর্ববাঙলার বৈপ্লবিক প্রাণশক্তিকে, তখন আনন্দ আর গর্বে আমার বুক দুলে ওঠে, শ্রদ্ধায় মাথাটা নত হয়ে যায়।

আমি হয়তো মাঝে মাঝে একটু প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছি। স্মৃতি-চারণায় এ-এক বিপদ। কিন্তু একটা সজীব বৃক্ষের বর্ণনায় শুধু কি মূল আর কাণ্ডই সব? তার শাখা-প্রশাখা, লতা-পাতা, ফুল আর ফল বাদ দিয়ে কি সেই জীবন্ত বৃক্ষকে কল্পনা করা যায়? এমনকি, সেই বৃক্ষ-চূড়ার পাখির নীড় কিংবা তার শান্ত-শীতল ছায়ায় বসা ক্লান্ত পথিককেও কি ভুলে থাকা সম্ভব? আমার কাছে আজকের স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাঙলাদেশ সেই সজীব বৃক্ষের টসটসে টাটকা ফল। একে বুঝতে গেলে তাই ডালপালা, লতাপাতা, ফুল আর ফলের প্রসঙ্গও কোনো কোনো সময় অনিবার্য হয়ে ওঠে।

না, পূর্ববাঙলার জেলখানাগুলো শুধু কিছু গোমড়া-মুখ ভয়ঙ্কর মানুষেরই আবাসস্থল ছিল না। আমরা রাত-দিন শুধু গুরুগম্ভীর তত্ত্ব আর কূটতর্ক কিংবা হিংসা-দ্বেষের রথে চড়েও সময় কাটাতাম না। এ-কথা সত্যি, আমাদের সকলেরই মূল প্রোথিত ছিল সাম্যবাদের উর্বর মাটিতে। কারুর খুব গভীরে প্রোথিত, কারুর-বা একটু উপরে—আলগা মাটিতে। এ-কথাও সত্যি, আমরা কখনো কখনো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতাম। কিন্তু সবাই, যে-যার সাধ্যমতো, সেই মাটি থেকে রস টেনে আমাদের হাসি-গানে-ভালোবাসায়, অফুরন্ত প্রাণৈশ্বর্যে, জীবন্ত বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা, লতা-পাতা, ফুল আর ফলের বিচিত্র সমারোহেও জীবনকে গড়ে তুলতে চাইতাম ভীষণ সুন্দর করে।

অবশেষে সেই সুযোগ পাওয়া গেল। আমাদের মিলন-আকাঙ্ক্ষা জয়ী হলো। জেল-কর্তৃপক্ষ শেষপর্যন্ত আমাদের চাপে আর

আন্দোলনে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত (Grade II) সমস্ত রাজবন্দীকে একত্রে রাখার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন। তারিখটা ঠিক মনে নেই, তবে ১৯৫৩ সালের প্রথম দিকে, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীর কোনো একদিন আমরা 'পুরনো বিশ' এবং 'নতুন বিশ'-এর প্রায় সমস্ত রাজবন্দীরা এসে মিলিত হলাম জেনারেল ওয়ার্ডে অবস্থানকারী বন্দী-বন্ধুদের সঙ্গে। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী আর অজিত গুহও স্থানান্তরিত হলেন পুরনো হাজতে, প্রথম শ্রেণীভুক্ত (Grade I) রাজবন্দীদের আস্তানায়। সম্ভবত, শুধু নাদেরা বেগম একাই রইলেন ফিমেল ওয়ার্ড আলো করে। আর কমরেড মাধব মোহান্ত তাঁর অসুস্থতার জন্য অন্ধকার 'সেল'-এ থাকাই শ্রেয় মনে করলেন।

ঢাকা জেলে এবার যথার্থই পালাবদলের পালা শুরু হয়ে গেল। এ-পর্ব নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৯-৫০ সালের জেল-সংগ্রামের পর রাজবন্দীদের শতকরা ৯০ ভাগ এই প্রথম একত্রে থাকার সুযোগ পেলেন। ঢাকা জেলে মাঝখানে যে নেতৃত্ব-শূন্যতার সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিল ইতিমধ্যে তারও কিছুটা সুরাহা হয়ে গেছে। কমরেড অনিল মুখার্জি, জ্ঞান চক্রবর্তী, মুকুল সেন, নলিনী দাশ, রতন সেনগুপ্ত, রওশন আলি প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতারা জেল-জীবন পরিচালনার জন্য অতঃপর বেশ শক্ত হাতেই হাল ধরলেন। কিচেন-পরিচালনা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক পঠন-পাঠন, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ইত্যাদি সব কিছুকেই শৃঙ্খলার মধ্যে আনার জন্য তাঁরা তৎপর হয়ে উঠলেন। কমিউনিস্ট বন্দীদেরও সুসংহত করা হলো একটি মাত্র কনসোলিডেশন-এর মধ্যে।

এই পর্বে কমরেড অনিল মুখার্জির উজ্জ্বল নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব আমার মনে স্থায়ী হয়ে আছে। এ-এক নতুন ধরনের নেতা। ধীর-শান্ত অথচ সংকল্পে অনমনীয়। কোনো হৈ-হট্টগোল কিংবা উচ্চকণ্ঠ ঘোষণায় নিজেকে জাহির করার বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা নেই, কিন্তু প্রতিটি কমরেড, প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপার সম্পর্কে

সর্বদা সজাগ দৃষ্টি আর অন্তহীন তাঁর অনুসন্ধিৎসা। নির্দিষ্ট ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক মনন-ক্রিয়ার দ্বারা চালিত হওয়া নয়, বিশেষ থেকে সাধারণীকৃত সূত্রে এবং সাধারণীকৃত সূত্রের সঙ্গে মিলিয়ে বিশেষ ঘটনার তাৎপর্য আর সারাৎসার গ্রহণে কমরেড অনিল মুখার্জি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সর্বোপরি, তাঁর ছিল রুচিময় সু-সংস্কৃত এক সজীব মন। অর্থাৎ, 'সাম্যবাদের ভূমিকা'-র লেখক অনিল মুখার্জি নিছক তত্ত্ববাগীশ নেতা ছিলেন না, বাস্তব ক্ষেত্রে সৃজনশীল তত্ত্বের প্রয়োগেও তিনি ছিলেন শৃঙ্খলাপরায়ণ, নিয়মনিষ্ঠ, সুউচ্চ গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ বিপ্লবী সহযোদ্ধা। সুদীর্ঘ আট বছর ব্রিটিশের কারাগারে বন্দী-জীবন কাটাবার পর ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসে মুক্ত হয়ে কমরেড মুজফ্ফর আহমদ ও সোমনাথ লাহিড়ীর পরামর্শক্রমে সেই-যে তিনি ঢাকার নারায়ণগঞ্জে সুতাকল শ্রমিকদের মধ্যে বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, তারপর থেকেই তো তিনি ঢাকা জেলার সকলের প্রিয় নেতা।

কমরেড জ্ঞান চক্রবর্তী সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমি কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছি। বন্দী-কমরেডদের কাছে শুনেছি, দেউলী বন্দী-শিবিরে যাঁরা মার্কসবাদ ও ভারতীয়-দর্শন সম্বন্ধে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এ-প্রসঙ্গে প্রবীণ কমরেডদের মুখে কমরেড ভবানী সেনের সঙ্গে জ্ঞানদার নামও বারংবার উচ্চারিত হতে শুনেছি। অথচ, এই শীর্ণকায় মানুষটিকে দেখে কিছুই বুঝবার উপায় ছিল না। কিছুটা ধরতে পারতাম জ্ঞানদার রাজনৈতিক ক্লাসে যোগদান করে। কমরেড জ্ঞান চক্রবর্তীর কাছে আমরা সানন্দে গ্রহণ করতাম 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ'-এর পাঠ।

বলতে ভুলে গিয়েছি, এই সময় জেল-নেতৃত্ব সুসংগঠিতভাবে বন্দী কমরেডদের জন্য রাজনৈতিক ক্লাসের ব্যবস্থা করেন। কমরেড অনিল মুখার্জির ক্লাসে পড়ানো হতো 'আন্তঃপার্টি সংগ্রাম'-সংক্রান্ত পাঠ এবং জেলের মধ্যে গোপনে সদ্য পাচার করে আনা 'হাউ টু বি এ

গুড কমিউনিস্ট'-নামক গ্রন্থখানি। কমরেড মুকুল সেন পড়াতেন 'সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস' এবং ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল পাঠ নিতেন জীব-বিদ্যার প্রাথমিক অনুশীলনীসহ তৎকালে বহু বিতর্কিত পাভলভ-লাইশেঙ্কো তত্ত্বের উপর। এ-ছাড়া মার্কসীয় অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক বিষয়াদি সম্পর্কে যৌথ পঠন-পাঠন এবং পর্যালোচনারও ব্যবস্থা ছিল।

যাহোক, জেল-নেতৃত্বের মধ্যে কমরেড মুকুল সেন ও নলিনী দাশ—দুজনেই ছিলেন বরিশাল জেলা কমিউনিস্ট পার্টির নেতা। মুকুলদা তো বরিশাল জেলা কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এমন শান্ত স্বভাবের মানুষ আমি জীবনে খুব কমই দেখেছি। তাঁর মুখের কথা শোনার জন্য অনেক সময় কানটাকে এগিয়ে দিতে হতো। অথচ ব্রিটিশ সরকার এঁর ভয়েই একদিন থর থর করে কেঁপেছে জেল-দ্বীপান্তর সবই জুটেছে মুকুলদার বিপ্লবী-জীবনে। শুনতাম, মুকুলদা নাকি জীবনে একটাও মিথ্যে কথা বলেন নি। একদিন আমি কৌতূহলী হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এ-কথাটার সত্যতা। জানতে চেয়েছিলাম, পুলিশ কিংবা গোয়েন্দা-দপ্তর যখন তাঁকে কোনো বিপ্লবী সহকর্মী, গোপন ঘাঁটি অথবা অন্য কোনো গোপন ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতো তখন মিথ্যে না বলে কি উপায়ে আত্মরক্ষা করতেন তিনি। মুকুলদা মৃদু হেসে তাঁর স্বভাবসুলভ চুপি চুপি গলায় আমাকে বলেছিলেন: প্রথমে উত্তর না-দেবার চেষ্টা করতাম, কিন্তু পেরে না উঠলে বলতাম, 'জানি কিন্তু বলবো না।' এই 'জানি কিন্তু বলবো না' বলার দৃঢ়তা নিয়ে যিনি একদিন ব্রিটিশ-গোয়েন্দাদের মোকাবিলা করেছেন তিনি আজও যে সেই বলিষ্ঠতা নিয়ে ইয়াহিয়ার জঙ্গী-চক্রের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে এতটুকু ইতস্তত করছেন না, এ-কথা খুব সহজেই অনুমান করতে পারি।

আর নলিনীদা ছিলেন যুবজনোচিত প্রাণবন্ত পুরুষ। বাঙলার

বিপ্লবীরা একদিন এই যুবকের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন বিপ্লবের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ। এই যুবকই একদিন ১৯৩১ সালের শেষ দিকে হিজলী বন্দী-শিবিরের সব বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে প্রাচীর আর কাঁটা-তারের বেড়া টপকে পালিয়ে এসেছিলেন। ১৯৩৩ সালের ২২এ মে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের পলাতক বিপ্লবীদের আস্তানা পুলিশ ও সৈন্যদল ঘি'রে ফেল্লে এই দুঃসাহসী যুবকই দীনেশ মজুমদার ও জগদানন্দ মুখার্জির সঙ্গে রিভলভার হাতে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং অবশেষে ধৃত হয়ে নীত হয়েছিলেন আন্দামানের অন্ধকার কারাগারে। নলিনীদা যখন ঢাকা জেলে তখন আর তিনি যুবক নন। অথচ প্রায়-প্রৌঢ় নলিনীদা কাজে-কর্মে আমাদের মতো যুবকদের হার মানাবার জন্য ছিলেন সর্বদা প্রস্তুত।

ব্রিটিশ আমলের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী এমনিতর আরও অনেক কমরেড ছিলেন আমাদের সঙ্গে। বরিশালের বর্ষীয়ান কমিউনিস্ট নেতা কমরেড হীরালাল দাশগুপ্ত তাঁদের অন্যতম। ফরিদপুরের কমরেড আশু ভরদ্বাজের কথাও আজ মনে পড়ছে বারংবার। তরুণ আশু ভরদ্বাজকেও আন্দামান পাড়ি দিতে হয়েছিল বৈপ্লবিক সংগ্রামে লিপ্ত থাকার অপরাধে। গাট্টাগোট্টা চেহারার সেই আশু ভরদ্বাজকে দেখতাম শিশুর মতো কী সরল আর কী উদার! আমাদের জেলের সংসারে তিনিই ছিলেন ভাঁড়ার ঘরের প্রায় সর্বাধিনায়ক। ময়মনসিংহের কমরেড বিনোদ রায় আর ক্ষিতীশ রায়ও ছিলেন রান্নাঘরের যোগ্য গৃহিণীর মতো আমাদের কাছে প্রায়-অপরিহার্য এক সত্তা।

আশ্চর্য সব মানুষ! সত্যিই বিশেষ ধাতু দিয়ে যেন গড়া ছিলেন এঁরা। আজ বিশ বছর পরেও এঁদের প্রতিটি মুখ আমার স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে। ঠিক এমনিভাবে আমার স্মৃতির পর্দায় একে একে উঠে আসছে ময়মনসিংহের অজয় রায়, ঢাকার কামাল, যশোহরের সন্তোষ বিশ্বাস প্রমুখ সমবয়সী বন্ধুদের মুখচ্ছবি। শুষ্কপ্রাণ

কারাগারকে আমরা যাঁরা রস-নিঝরে ভরিয়ে দেবার দায়িত্ব নিয়েছিলাম, এঁরা ছিলেন সেই রসিক-সুজনদের অন্যতম। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ঢাকা জেলের সাংস্কৃতিক জীবনের মরা গাঙে অন্তত দেড় বছর ভরা কোটালের জোয়ার নেমেছিল।

আমার জেলের খাতায় সাংস্কৃতিক উপসমিতির নেতৃত্বে প্রথম তিন মাসব্যাপী যে সাংস্কৃতিক কর্মসূচী অনুসৃত হয়েছিল তার একটা বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ১৯৫৩ সালের মে মাসের শেষ দিকে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক কার্যক্রম-সংক্রান্ত পর্যালোচনা-সভার বিবরণ এটা। বিভিন্ন কমরেড এই পর্যালোচনা-সভায় যে-মতামত ব্যক্ত করেছিলেন তার থেকে জানা যাচ্ছে, আমরা তিন মাসে ভাষা-আন্দোলন, হোলি-উৎসব, স্তালিনের অন্ত্যেষ্টি দিবস, রাজশাহী-শহীদ-দিবস, মে-দিবস, রবীন্দ্র-দিবস উপলক্ষে এবং বিতর্কসভা, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। তিন মাসের মধ্যে এতগুলি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সংগঠিত করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। কিন্তু ভাষা-আন্দোলনের পর আমাদের সম্মিলিত শক্তি সব বিঘ্ন-বাধা তুচ্ছ করে অনায়াসে এগিয়ে গেল। আমরা উন্মুক্ত করে দিলাম অবরুদ্ধ প্রতিভার সমস্ত উৎসমুখ।

এইসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কয়েকটির স্মৃতি আমার মনে স্মরণীয় হয়ে আছে। হোলি-উৎসবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তার মধ্যে অন্যতম। ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল ছিলেন এই আনন্দানুষ্ঠানের প্রধান হোতা। লীগ-রাজত্বের কুকীর্তিকে কেন্দ্র করে তিনি রচনা করেছিলেন অপূর্ব পালা-কীর্তন। এই অনুষ্ঠানে যশোহরের কমরেড বটু দত্ত মাত করে দিয়েছিলেন আসর। বটুদা শুধুমাত্র তাঁর দুই হাঁটুকে সম্বল করে সেদিন মুখে মুখে যে-বোল তুলেছিলেন, তাঁর সমস্ত দেহ-ভঙ্গীমায় আর হস্তমুদ্রায় কীর্তনীয়ার দোহারকিতে যে-রসমাত্রা সংযোজন করেছিলেন, না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না।

বটুদা সত্যিই ছিলেন নির্দোষ রসের খনি। তাঁকে ভিত্তি করে

অজস্র কৌতুক-কাহিনী ছড়িয়ে আছে। বটুদার ছোট ভাই, অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সুপরিচিত নেতা এবং বর্তমানে চারু মজুমদারের দলভুক্ত অন্যতম প্রধান নক্সাল-নেতা কমরেড সরোজ দত্ত-র কাছেও শুনেছি বটুদা সম্পর্কে অনেক কৌতুক-কাহিনী। গ্রাম্যরস পরিবেশনে এই দুই ভাইয়ের জুড়ি মেলা ভার। সরোজদার কাছে শোনা এমনি দু-একটি-কৌতুক-কাহিনী পরিবেশন করার লোভ সম্বরণ করতে পারছিনে আজ।*

বটুদা আর সরোজদা—দু-ভাই-ই তখন নড়ালের গ্রামে থাকতেন। গ্রামের এক সদ্য-বিবাহিত বধূ তার প্রবাসী স্বামীকে চিঠি লিখে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন দত্ত-বাড়ীর এই দুই ছেলেকে। দুষ্টুমীতে দুই ভাইয়ের চোখে ঝিলিক খেলে গেল। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, তা কি বলে সম্বোধন করবো চিঠিতে? নব-বধূ লজ্জার মাথা খেয়ে দু-ভাইয়ের পীড়াপীড়িতে শেষপর্যন্ত আমতা আমতা ক'রে বল্লেন: ঐ যে—'প্রাণেশ্বর' না—কী-যেন লেখে চিঠিতে। দু-ভাই চিঠি লিখে দিলেন। কিন্তু সম্বোধনের 'প্রাণেশ্বর' দু-জনের দুষ্টুমীতে নির্বিবাদে পরিণত হয়ে গেল 'প্রাণের ষাঁড়'-এ।

দ্বিতীয় কৌতুক-কাহিনীটি বটুদা-কেই নিয়ে। সরোজদা-র মুখে শোনা। একবার নাকি বটুদা কোনো এক গ্রাম্য-মেয়ের প্রেমে পড়ে যান। সরোজদা-র উপর বটুদা-র ভীষণ আস্থা ছিল। এ-ব্যাপারেও তাই তিনি পরামর্শের জন্য সরোজদা-র স্মরণাপন্ন হলেন। সব শুনে সরোজদা বেশ গম্ভীর হয়েই বল্লেন: তা কি করতে চাও? বটুদা অসহায়ের মতো বল্লেন: তুই বল্‌ কি করা উচিত। সরোজদা কিছু নতুন ভালো বই মেয়েটিকে উপহার দেবার জন্য বটুদা-কে পরামর্শ দিলেন। বটুদা সেই পরামর্শ মতো কাজ করলেন, কিন্তু ফল হলো উল্টো। বই উপহার দেবার পর মেয়েটি নাকি বটুদা-র

---

* নক্সাল-নেতা কমরেড সরোজ দত্ত পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার এবং পরে নিহত হয়েছেন বলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু পুলিশ-কর্তৃপক্ষ এই সংবাদ অস্বীকার করেছেন। —লেখক

সঙ্গে আর কথাই বলে না। বটুদা ভীষণ মনমরা। সরোজদা-কে বল্লেন সব। সরোজদা শুনে বিচলিত হলেন, জিজ্ঞাসা করলেন উপহার প্রদত্ত বইখানির নাম। বটুদা বল্লেনঃ তুই নতুন ভালো বই দিতে বলেছিলি তাই আমি তোর টেবিল থেকে নতুন-কেনা ডিক্সনারী খানাই দিয়ে এসেছি ওকে। কিন্তু তারপর থেকেই ও আর কথা বলছে না। সরোজদা শুধু বল্লেনঃ প্রেম করে ডিক্সনারী উপহার দেওয়ার পর কোনো মেয়ে কোনো ছেলের সঙ্গে আর কথা কয় না।

এই বটুদা, জেল-জীবনের পরিণত বটু দত্তকে আমরা পেয়েছিলাম আমাদের একান্ত প্রিয়জন রূপে। খুলনার প্রখ্যাত চিকিৎসক ও একনিষ্ঠ কমিউনিস্ট কর্মী ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলালও শুধু আমাদের জীব-বিদ্যার শিক্ষক ছিলেন না, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেরও ছিলেন উৎসাহী সহযোগী। প্রকৃতপক্ষে, তিনি বেশ ভালো বেহালা-বাদক ছিলেন। খুলনায় ১৯৪৭ সাল থেকে আমরা যতো ছোট-বড়ো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেছি তার প্রায় প্রত্যেকটিতেই ডাঃ কাঞ্জিলালের বেহালা ছিল অপরিহার্য অঙ্গ। এই সুরসিক ব্যক্তিটির পেশাগত ক্ষেত্রে একটা ভীষণ দুর্বলতা ছিল। আর আমরা তাঁর সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁকে যথেষ্ট জ্বালাতন করতাম। ডাঃ কাঞ্জিলাল ছিলেন এলোপ্যাথী এম. বি. বি. এস-এর কৃতী ছাত্র। কিন্তু অন্যান্য আরও অনেক সুখ্যাত এলোপ্যাথ-চিকিৎসকের মতো তিনিও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-শাস্ত্রকে শ্রেয় বলে মেনে নেন এবং পেশাগত ভাবে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাকেই অবলম্বন করে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্র সত্যিই এক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এমনকি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে তিনি একে ব্যাখ্যাও করতেন। তাঁর এই পেশাগত গোঁড়ামীর জন্য তিনি প্রিয়তমা স্ত্রীকে পর্যন্ত হারিয়েছিলেন। আমরা খুলনার কমরেডরা সেই বিয়োগান্ত-দৃশ্যের নীরব সাক্ষী। রাণী বৌদির কলেরা হয়েছিল। ডাঃ কাঞ্জিলাল

বিশ্বাস করেছিলেন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় এই রোগ অবশ্যই মুক্ত করা যাবে। কোনো পরামর্শ তিনি গ্রাহ্য করেন নি। বিজ্ঞান-সাধকের মতো একাগ্র নিষ্ঠায় তিনি তাঁর চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করেছিলেন কিন্তু শেষপর্যন্ত রাণী বৌদিকে বাঁচানো যায় নি। তবু ডাঃ কাঞ্জিলালের বিশ্বাস এতটুকু টলে নি। কিন্তু জেলের মধ্যে আমরা তাঁর ওষুধ খেলেও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রকে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাশাস্ত্র রূপে কিছুতেই মানতে চাইতাম না। ডাঃ কাঞ্জিলালও প্রাণপণে প্রমাণ করতে চাইতেন এর বৈজ্ঞানিক সারবত্তা।

এমনি সময়ে কোনো একদিন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-সম্পর্কে সোভিয়েত সরকারের অনীহার কথা প্রকাশিত হলো। আর যায় কোথা! আমরা সবাই লাগলাম ডাঃ কাঞ্জিলালের পিছনে। বিব্রত ডাঃ কাঞ্জিলাল ক্ষোভে-দুঃখে মরীয়া হয়ে উঠলেন। বল্লেন, এক ফোঁটা মাত্র ওষুধে তিনি আমাদের অজ্ঞান করে রাখবেন। যারা ইচ্ছুক তারা এই প্রমাণ গ্রহণ করতে পারেন। আমরা ডাঃ কাঞ্জিলালের সেই পরীক্ষার সম্মুখীন হলাম। কিন্তু হায়, সেদিনও ডাঃ কাঞ্জিলালের ভাগ্যে ঘটলো মর্মান্তিক পরাজয়!

কথায় কথায় আমি আবার অন্য প্রসঙ্গে চলে এসেছি। কিন্তু এমনি সব ঘটনায় ঠাসা ছিল আমাদের জেলের জীবন। আমরা যে সত্যিই গোমড়া-মুখ কতকগুলি ভয়ঙ্কর মানুষ ছিলাম না, এইসব ঘটনাই তো তার জ্বলন্ত প্রমাণ। আর, সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের কথা বাদ দিয়ে জেল-জীবনকে ভাবাই যায় না। কারণ, ও-গুলোই হলো সহজ পন্থায় রাজনৈতিক শিক্ষা-গ্রহণ এবং একঘেঁয়ে জীবনে আনন্দ আহরণের একমাত্র বাতায়ন। তাই, মাত্র তিন মাসের মধ্যে আমরা অতগুলি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পেরেছিলাম।

পূর্বে একটি স্মরণীয় অনুষ্ঠানের কথা আমি উল্লেখ করেছি। ১৯৫৩ সালের ৯ই মার্চ কমরেড স্তালিনের অন্ত্যেষ্টি-দিবসও ছিল আমার কাছে তেমনি আর একটি স্মরণীয় অনুষ্ঠান। আজ স্তালিন-এর

মূল্যায়ন যাই হোক-না কেন, সেদিন তাঁর মৃত্যুতে আমরা যে কী নিদারুণ আঘাত পেয়েছিলাম ভাষায় তা প্রকাশ করতে পারবো না।

ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে আমাদের কাছে কমরেড স্তালিনের অসুস্থতার সংবাদ পৌঁছে যায়। সমস্ত কমরেডই বিচলিত হয়ে ওঠেন। তাঁর আরোগ্য কামনা করে আমরা সোভিয়েত সরকারের কাছে এক টেলিগ্রাম পাঠাই। তারপর থেকে প্রতিদিন শুধু উৎকণ্ঠিত মুহূর্ত গণনা। ১৯৫৩ সালের ৬ই মার্চ। আমরা সবেমাত্র খেতে বসেছি। কেউ কেউ তখনও হাতে থালা আর গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে। কারুর পাতে কিছু পড়ে নি। এমন সময় 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা বহন করে আনলো সেই ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ : কমরেড স্তালিন আর নেই। আমরা যে যেখানে ছিলাম সবাই যেন পাথরের মূর্তি হয়ে গেলাম। তারপর নিঃশব্দে সেই পাথরের মূর্তিগুলির দুচোখ বেয়ে নেমে এলো বুকভাঙা বেদনার অশ্রু। এমন দৃশ্য, এমন অকৃত্রিম যৌথ শোক, এমন পবিত্র শোক-তর্পণ আমি জীবনে আর কখনো দেখি নি। থালা-গ্লাস-খাবার সব পড়ে রইলো। সেদিন প্রতিটি বন্দী-বন্ধু নীরবে ডুকরে ডুকরে কেঁদেছেন। এ কান্নার কোনো তুলনা নেই।

তারপর ৯ই মার্চের অন্ত্যেষ্টি-দিবসের অনুষ্ঠানে ছিল সেই শুদ্ধ ভাবগম্ভীর পরিবেশ, যা আমি মনের মণি-কোঠায় এখনও সযত্নে লালন করি। বাইরের জীবনে এই শুদ্ধতার মুখ কোথাও আর এখন দেখতে পাই না। এই পবিত্র সুন্দর মুহূর্তগুলি যেন কিসের তাড়নায় আজ ক্রমঅপস্রিয়মাণ!

ঢাকা জেলে আমরা এক বছরের মধ্যে তিন-তিনটে নাটকও মঞ্চস্থ করলাম। জেল-কর্তৃপক্ষ আমাদের বিন্দুমাত্র সাহায্য করে নি কোনোদিন। কিন্তু কমরেডদের উৎসাহ আর সৃজনী-প্রতিভায় সব বাধা খড়-কুটোর মতো কোথায় যেন ভেসে যেত।

এই নাটকের ব্যাপারে বরিশালের কমরেড ফণী চক্রবর্তী আর যশোহরের কমরেড অমল সেন (বাসুদা) ছিলেন প্রধান পরিচালক

আর প্রযোজক। ফণীবাবু বরিশালের নামকরা অভিনেতা। তিনি আমাদের মহলা দিয়ে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতেন। আর বাসুদা পোষাক-পরিচ্ছদ, দৃশ্যসজ্জা, রূপসজ্জার প্রায় সমস্ত দায়িত্বই বহন করতেন হাসিমুখে। ফণীবাবু এখন কোথায় তা জানি নে ; কিন্তু শুনেছি, বাসুদা বাঙলাদেশের মাওপন্থী হক-তোয়াহা গ্রুপের অন্যতম প্রধান নেতা।

আমরা যে-তিনটি নাটক জেলখানায় মঞ্চস্থ করেছিলাম তার মধ্যে অন্তত একটি নাটক বাঙলাদেশের নাট্য-আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই নাটকটির নাম 'কবর'। ভাষা-আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত প্রথম বাঙলা নাটক। রচয়িতা ঃ মুনীর চৌধুরী। রচনার স্থান ঃ জেলখানা। প্রথম অভিনয় ঃ ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগার-মঞ্চে। অভিনয়-রজনীর কুশীলব ঃ কারাগারে আবদ্ধ রাজবন্দীরা।

এই নাটকের বিষয়বস্তু আমি প্রায় ভুলে যেতে বসেছিলাম। 'বহুরূপী' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীকে ধন্যবাদ, তাঁরা 'কবর' নাটকটি পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করে আমাকে সেই বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে টেনে তুলেছেন। এখন স্পষ্ট মনে পড়ছে, বিপ্লবী-নেতা কমরেড নলিনী দাশ, অজয় রায় আর আমিই ছিলাম 'কবর' নাটকের প্রধান ভূমিকায়। নলিনীদা রূপদান করেছিলেন কবরখানার সেই মুর্দা ফকিরের চরিত্রে, আর আমি নিয়েছিলাম কিশোর-শহীদের মা-র ভূমিকাটি। নলিনীদার বুকফাটা কান্নার অপূর্ব অভিনয় এখনো যেন শুনতে পাই আমি। জেলখানার গদির উপর চাঙড় চাঙড় ঘাসভরা মাটি দিয়ে রচনা করা হয়েছিল কবরের পরিবেশ। সেই কবরে শায়িত ভাষা-আন্দোলনের শহীদের জন্য নলিনীদার নাটকীয় সংলাপ আর অভিব্যক্তিতে মূর্ত হয়ে উঠেছিল যেন এক জাত-অভিনেতার আশ্চর্য প্রতিভা।

শুনেছি, এই 'কবর' নাটক পরবর্তীকালে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীকে যথেষ্ট খ্যাতি আর সম্মান এনে দিয়েছে। কিন্তু ওপার বাঙলার দায়িত্বশীল বন্ধুদের মুখে শুনতে পাই, আমাদের পরিচিত

সেই মুনীর চৌধুরী এখন আমূল পরিবর্তিত মানুষ। আই. সি. এস. জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের সন্তান, এককালের তরুণ মার্কসবাদী মুনীর চৌধুরী, এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান এবং আয়ুবের আমল থেকে আমলাতন্ত্রের উৎসাহী সমর্থক। আর তাঁর বোন, আমাদের সহবন্দিনী, ঢাকা জেলের একদা বিদ্রোহিনী নায়িকা নাদেরা বেগম তাঁর কূটনীতিক স্বামীর সঙ্গে এখন মস্কোবাসিনী এবং জঙ্গী ইয়াহিয়ার নিষ্ঠুর বর্বরতার নিষ্ক্রিয় দর্শক *

যাহোক, নাটকে নারী-চরিত্র অভিনয় করা নিয়েই আমাদের মধ্যে বাধতো যত ঝামেলা। আর কেন জানিনে, প্রত্যেকবার শেষমুহূর্তে আমাকেই নির্বাচিত করা হতো নারী-চরিত্রে রূপদানের জন্য। এখন ভাবলে সত্যিই হাসি পায়। এই আমি, ১৯৪৪ কিংবা ৪৫ সালে যাকে একদিন বিপ্লবী-মনীষী ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত নিগ্রো-বটুর সার্থক উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে মাথাভর্তি কোঁকড়া চুল টেনে ধরে নাজেহাল করেছিলেন খুলনার নলধা নামক এক গ্রামে (খুলনার বিপ্লবী-নেতা কমরেড প্রমথ ভৌমিকের আমন্ত্রণে ডঃ দত্ত এই সময়ে একটি স্কুলের জয়ন্তী-উৎসবে সভাপতিত্ব করতে গিয়েছিলেন), ভাবতে পারেন সেই তেল কুচ-কুচে ঘোর কৃষ্ণবর্ণের একটি মানুষকে জেলখানার দশচক্রে মেমসাহেবের ভূমিকাতেও অভিনয় করতে হয়েছিল? না, ১৯৫৩ সালে আমি আজকের মতো এতো স্থূলকায় হয়তো ছিলাম না। কিন্তু আমার গায়ের পাকা রঙ তখনো তো ছিল! তবু বাসুদা সত্যিই আমাকে মেম বানিয়ে ছেড়েছিলেন। বাসুদা-র তৈরী গাউন এবং জিঙ্ক-অক্সাইডে আপাদমস্তক ঢেকে 'ওয়েটিং ফর দি লেফটি' নাটকে সেদিন আমি দাপটে অভিনয় করেছিলাম। আমার বিপরীত চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন কমরেড অজয় রায়।

---

* আল-বদর বাহিনীর হাতে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী আজ নিহত। আমার এই মন্তব্য এখন তাই অর্থহীন মনে হচ্ছে। এ ছাড়া সম্প্রতি জানতে পারলাম মস্কোবাসিনী নাদেরা বেগম-এর কূটনীতিক স্বামী জনাব কিবরিয়া পাকিস্তান দূতাবাস পরিত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছেন। —লেখক

এরপর 'পল্লী-সমাজ' নাটকের অভিনয়কালেও আমি রমেশরূপী অজয়ের বিপরীতে রমার চরিত্রে অংশ গ্রহণ করি। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র বলতে যা বুঝায়, কমরেড অজয় ছিলেন তাই-ই। এই তো সেদিন বাঙলাদেশের কিংবদন্তীর নায়ক প্রবীণতম কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মণি সিং-এর কাছেও শুনলাম অজয়ের কত কথা। পূর্ববাঙলার (বাঙলাদেশ) অধ্যাপক সমিতির সম্পাদক কমরেড হালিম আর শান্তি-আন্দোলনের নেতা ডাঃ গোলাম সারোয়ার—সবার মুখেই অজয় সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উক্তি। ২৫-এ মার্চ-এর আগে, বাঙলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে কমরেড অজয় রায় বন্দী ছিলেন ময়মনসিংহের কারাগারে। সংগ্রামী-জনতা মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে জেল-ভেঙ্গে মুক্ত করে নিয়ে এসেছেন তাঁদের এই প্রিয় নেতাকে। কমরেড অজয় রায় এখন বাঙলাদেশের উত্তরখণ্ডে মুক্তি যুদ্ধের অন্যতম সংগঠক।

ঢাকা জেলের সকল সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অজয় রায়, কামাল আর সন্তোষ বিশ্বাস—এই তিনজন সমবয়সী বন্ধু ছিলেন আমার ঘনিষ্ঠ সহযোগী। প্রবীণ নেতাদের মধ্যে কমরেড অনিল মুখার্জি বরাবরই তাঁর সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে দিয়েছেন আমাদের দিকে। আমরা জেলখানায় 'অভিযান' নামে যে ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতাম তারও সকল দায়-দায়িত্ব বহন করতেন প্রধানত এই কমরেডরাই। কমরেড সন্তোষ বিশ্বাস এখন পশ্চিম বাঙলায়। শুনেছি, বনগাঁ-র কাছে কোনো এক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন তিনি। কামাল (হাসানুজ্জামান) জেল থেকে মুক্তির পর ঢাকার 'পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকায় সাংবাদিক হিসাবে যোগদান করে। সম্প্রতি শুনলাম, সে এখন 'মর্নিং নিউজ'-এর স্টাফ রিপোর্টার, রাজনীতিতে উগ্রপন্থী চীনের সমর্থক।

পিতৃ-মাতৃহীন কামাল একদা কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ-এর স্নেহচ্ছায়ায় কমিউনিস্ট পার্টির কমিউন-এ লালিত-পালিত হয়েছিল।

এখান থেকেই সে ম্যাট্রিক পাশ করে এবং 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় প্রুফ-রীডার হিসাবে কাজ করতে থাকে। ১৯৫০ সালের কোনো এক সময় গোপন কমিউনিস্ট পার্টির কাজে তাকে পূর্ববাঙলায় পাঠানো হয়, তারপর গ্রেপ্তার হয়ে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারেই কাটে তার বন্দী-জীবন। কামালের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো উচ্চ ডিগ্রি ছিল না সত্যি, কিন্তু তার প্রখর বুদ্ধি এবং অধীত বিদ্যার ব্যাপ্তিতে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলাম। ইংরেজী ভাষায় তার ব্যুৎপত্তি এবং দখলও ছিল আমার কাছে যথেষ্ট ঈর্ষণীয়।

কমরেড অজয় রায়কে আমি একটু আগে ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র বলে উল্লেখ করেছি। আমার এই উক্তির মধ্যে এতটুকু অতিশয়োক্তি নেই। অজয় সত্যিই বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। ওর বাবা ডঃ প্রম[illegible] রায় ছিলেন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, রোমান ভাষা ও সাহিত্যের বিদগ্ধ পণ্ডিত। শুনেছি, ডঃ রায় মূল রোমান ভাষায় রচিত তার গবেষণাপত্রের জন্য রোম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি গ্রহণ করে [illegible] সালে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। বেনারসেই তাই অজয়ের শিক্ষা-জীবনের সূচনা। সম্ভবত, ১৯৫৬ সালে অজয় বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসিউটিক্যাল-এ বি. এস-সি ডিগ্রী ক্লাসের [illegible] ছাত্র ছিলেন। কিন্তু এই সময় বাবার অকাল মৃত্যুর ফলে কমরেড অজয়কে তাঁর অল্পবয়স্ক ভাই-বোনদের নিয়ে চলে আসতে হয় ময়মনসিংহ জেলায়, আত্মীয়ের আশ্রয়ে। আর এখানেই পরবর্তীকালে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু। দেশভাগের পর পাকিস্তানের লীগশাসক থেকে জঙ্গীশাসক, কেউ অজয়কে গত তেইশ বছরে মুক্ত আলো-হাওয়ায় নিঃশ্বাস ফেলার তেমন কোনো অবকাশ দেয় নি, অন্তরীণ আর আত্মগোপন—অজয়ের রাজনৈতিক জীবনের প্রায় নিত্য সঙ্গী। শুনেছি, সামরিক নায়ক আয়ুবের আমলে ১৯৬৭ সালে অজয় জেল থেকে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী রূপে অর্থনীতিতে এম. এ. পরীক্ষায় কৃতিত্বের

সঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। সুতরাং কারাগারের সুখ-দুঃখের সঙ্গী রূপে আমি যে-অজয় রায়কে চিনতাম, যিনি ছিলেন আমার থিয়েটারের পার্টনার, যাঁর সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে আবৃত্তি করেছি স্বরচিত কবিতা, সেই ব্রিলিয়াণ্ট অজয় রায় তাঁর পরিণত জীবনে ব্রিলিয়ান্সির শীর্ষ-চূড়ায় দাঁড়িয়ে আজও যখন শান দিয়ে চলেছেন তাঁর বিপ্লবী-প্রতিভার অস্ত্রে, তখন নিশ্চিত বুঝতে পারি, সেই ক্ষুরধার অমোঘ অস্ত্র কমরেড অজয়ের প্রিয় মাতৃভূমির মূল শত্রুকে নির্মূল না করে কিছুতেই ক্ষান্ত হবে না।

প্রকৃতপক্ষে, পূর্ববাঙলার জেল-জীবনে, নানা দুর্বিপাকের মধ্যেও আমরা অনেক কিছু শিখেছিলাম। অন্তত ১৯৫৩ সালের প্রথম থেকে যাঁরা কিছু শিখতে চেয়েছেন, তাঁদের সুযোগ-সুবিধা পর্যাপ্ত না হলেও তেমন কোনো অভাবও ছিল না। সাংস্কৃতিক-কার্যক্রম ছিল এরই একটা অঙ্গ।

সাংস্কৃতিক-কার্যক্রমের পর্যালোচনা-সভাগুলি সজীব তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়েই শেষ হতো। এখানে এমন অনেক বিষয়ের উপর আলোচনা হয়েছে যা নানা কারণে উল্লেখ্য। অন্তত সে-সময়কার পূর্ব-বাঙলার অবস্থা এবং আমাদের মানসিকতা বুঝবার পক্ষে তা যথেষ্ট সহায়ক। প্রাসঙ্গিক এমনি একটি বিষয় এবার আমি উত্থাপন করছি।

আমরা আজ সকলেই জানি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাঙলা' স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাঙাদেশের জাতীয় সঙ্গীত রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। আয়ুব-আমলের রবীন্দ্র-বর্জন নীতির বিরুদ্ধে এই সেদিন রুখে দাঁড়িয়েছিলেন পূর্ববাঙলার নবজাগ্রত জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীর দল। যাঁরা একদিন মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার জন্য রক্ত ঝরিয়েছেন, তাঁরাই রক্ষা করেছেন সেই মাতৃভাষার মহত্তম স্রষ্টার মর্যাদা। কিন্তু ব্যাপারটা অতো সহজ ছিল না। লীগশাহীর আমলে পূর্ববাঙলায় এমন এক পরিবেশ রচিত হয়েছিল যে, আমাদের মতো মুক্ত-বুদ্ধির মানুষও অনেক সময়

সেই পরিবেশ-প্রভাবে বিভ্রান্ত না হয়ে পারে নি। আমার জেলখানার খাতায় সেই বিভ্রান্ত-চেতনার কিছু কথা লিপিবদ্ধ আছে।

১৯৫৩ সালের সাংস্কৃতিক-কার্যক্রমের পর্যালোচনা-সভায় নববর্ষ উৎসব ও রবীন্দ্র-জন্মোৎসবকে কেন্দ্র করে কয়েকটি সমালোচনামূলক মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আমরা এই দুই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পরিবেশন করেছিলাম রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাঙলা' এবং 'বাঙলার মাটি বাঙলার জল' গান দুটি। পর্যালোচনা-সভার বিবরণীতে দেখতে পাচ্ছি, অন্তত দুজন কমরেড পূর্ববাঙলার তৎকালীন পরিবেশে এই দুটি গান গাওয়া পছন্দ করেন নি। তাঁদের ধারণা, এই গান দুটিতে 'যুক্তবঙ্গের রেশ' আছে ; সুতরাং পূর্ববাঙলার রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা মনে রেখে আপাতত ঐ জাতীয় গান 'পরিত্যাগ করা যেতে পারে'। অবশ্য এই মতের বিরুদ্ধে ভিন্ন মতও ব্যক্ত হয়েছিল ঐ সভায়। তাঁদের বক্তব্য ছিল : বাঙলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এক ও অবিভাজ্য। একে পূর্ববাঙলার সংস্কৃতি এবং পশ্চিম বাঙলার সংস্কৃতি— এইভাবে বিভক্ত করা ঠিক নয়। আজ ভাবি, সেদিন এক ভিন্নতর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে চিন্তা-ভাবনায় অগ্রগামী কমিউনিস্ট বন্দীদের একাংশের মনে যে-প্রশ্নে দ্বিধা আর সংশয় ছিল, অন্য এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এই সত্তরের দশকে পূর্ববাঙলার সাধারণ মানুষও কত অনায়াসে পেয়ে গেছেন সে-সব প্রশ্নের কেমন সহজ উত্তর। রবীন্দ্র-নজরুল, জীবনানন্দ-সুকান্ত, রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদ আর ডি. এল. রায়-এর স্বদেশ-চেতনায় অবগাহন করে প্রতিদিনই তো তাঁরা পূর্ণতর মানুষ হয়ে উঠছেন, মাতৃভূমি আর মানব-মর্যাদা রক্ষার জন্য অতিক্রম করছেন রক্তাক্ত বন্ধুর পথ।

এই সময় পূর্ববাঙলার নতুন সাহিত্য-আন্দোলনের গতি-প্রকৃতির উপরও আমরা রেখেছিলাম সজাগ দৃষ্টি। এ-ব্যাপারে আমার পরে ন্যস্ত করা হয়েছিল এক গুরুভার দায়িত্ব। আমি অন্য দু-একজন বন্ধুর সহযোগিতায় সাধ্যমতো এই দায়িত্ব পালন করতে চেষ্টা করেছিলাম।

নানা সূত্র থেকে জেলের মধ্যে প্রাপ্ত সাময়িক পত্রিকা এবং দৈনিক পত্রিকার বিশেষ সাহিত্য-সংক্রান্ত ক্রোড়পত্রের সাহায্যে আমরা পূর্ববাঙলার প্রত্যূষকালের সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করতে চেষ্টা করেছি সে-সময়। পূর্ববাঙলার সাহিত্যের মূল ধারাগুলিকে, প্রগতি আর প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে বেছে নিয়ে আমি প্রায় প্রতিদিনই 'নোট' করতাম। তারপর ১৯৫৩ সালের আগস্ট মাসে সেই 'নোট'-এর উপর ভিত্তি করে আমি পেশ করেছিলাম এক বিস্তারিত প্রবন্ধ। আলোচনার জন্য সেই প্রবন্ধ জেল থেকে প্রকাশিত 'অভিযান' প্রত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই 'নোট'-এর উপর ভিত্তি করেই আমার মুক্ত-জীবনে আমি রচনা করেছিলাম 'পূর্ববাঙলার সাহিত্য-প্রসঙ্গ' রচনাটি। এই রচনাটি ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চে (ফাল্গুন, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ) শ্রীযুক্ত অনিল সিংহ সম্পাদিত 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সম্ভবত, পূর্ববাঙলার সাহিত্য-সম্পর্কে পশ্চিমবাঙলায় এটিই ছিল প্রথম প্রকাশিত বিস্তারিত আলোচনা। 'নতুন সাহিত্য'-র ঐ সংখ্যাটি আজ আর আমার কাছে নেই। কিন্তু জেলখানায় যে-প্রবন্ধটি আমি পেশ করেছিলাম তার মূল লেখাটি আজও আমার খাতায় অটুট অবস্থায় আছে।

এই প্রবন্ধ রচনার পরে অনেক কাল কেটে গিয়েছে। পূর্ববাঙলার সাহিত্যাকাশের প্রত্যূষকালও অতিক্রান্ত। পূর্ববাঙলাও রূপান্তরিত হয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলাদেশে। আজ সংগ্রামী বাঙলাদেশের কোনো কোনো শরণার্থী-বুদ্ধিজীবী এপার বাঙলায় এসে তাঁদের স্মৃতিচারণা করছেন, লিখছেন সাহিত্য ও সংস্কৃতি-বিষয়ক নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধ। এইসব রচনার মধ্যে হাসান মুরশিদ নামক জনৈক বুদ্ধিজীবী 'আনন্দবাজার' ও 'দেশ' পত্রিকায় যেসব তথ্য পরিবেশন করেছেন, স্পষ্ট বলতে পারি, তার সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতার প্রায়-ক্ষেত্রে কোনো মিল নেই। বিশেষ করে পূর্ববাঙলার প্রথম এক

দশকের সাহিত্য-সংক্রান্ত তাঁর যে-মূল্যায়ন, বিভিন্ন সাহিত্যিক সম্পর্কে তাঁর যে-উক্তি তা এতই অতীত ও পরিপ্রেক্ষিত বিচ্ছিন্ন—যা সংগ্রামী বাঙলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে যথেষ্ট বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে বলেই আমার বিশ্বাস। এ-কথা সত্যি, বিশ বছর আগে যে-সাহিত্যিক বা সাংস্কৃতিক কর্মী যে-ভূমিকা পালন করতেন এখন হয়তো তিনি সেই ভূমিকায় নেই; কিংবা মত ও পথেরও পরিবর্তন ঘটেছে অনেকের জীবনে। কিন্তু অতীত-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কাউকে গৌরবময় আসন দান এবং কারুর-বা চরিত্র-হনন কোনোক্রমে সৎ আলোচনার লক্ষণ নয়। এইসব কথা মনে রেখেই আমি জেল-জীবনে লিখিত এবং বহু সজাগ কমরেডদের দ্বারা গৃহীত আমার সেই আলোচনাটি এখানে পুনরায় হুবহু প্রকাশ করছি। এই আলোচনার মাধ্যমে হয়তো এ-গ্রন্থের পাঠক পূর্ববাঙলার সাহিত্যের শৈশবকালীন গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিতে পারবেন। সেই প্রবন্ধে আমি লিখেছিলাম :

"পূর্ববাঙলার প্রগতি-সাহিত্য সম্পর্কে চরম কথা বলার সময় এখনও আসেনি। সাহিত্য-কর্মের সৃষ্টিশালায় পরম উপাদানের অর্ঘ্যও হয়তো আজ পর্যন্ত নিবেদিত হয় নি। যা আসেনি আর যা পাই নি তার জন্য অপেক্ষা করবো নিশ্চয়, কিন্তু ইতিমধ্যে চরম এবং পরমের সীমায় উপনীত হওয়ার ঐকান্তিক কামনা নিয়ে যে সব সাহিত্যোপকরণ উপঢৌকন দিতে শুরু করেছেন পূর্ববাঙলার প্রগতি সাহিত্যিক, তাকে উপেক্ষা করবো কি করে? এ উপেক্ষায় কৃতিত্ব নেই কিছু, মননশীলতারও এটা লক্ষণ নয়। সুতরাং যা পেয়েছি সেইটুকু বিচার করে দেখা যাক্—দীর্ঘ ছয় বছরের সাধনায় পূর্ববাঙলার প্রগতি-সাহিত্যিকেরা কি তুলে দিয়েছেন আমাদের হাতে: কোন রীতির উত্তরাধিকারী তাঁরা, কি তাঁদের জীবনদর্শন, নন্দনতত্ত্বের বিচারে কোথায় তাঁদের স্থান—এক কথায়, কোন্ কোন্ দোষ-গুণের সমাবেশে কি কি লক্ষণাক্রান্ত

পূর্ববাঙলার প্রগতি-সাহিত্য।

বিভাগোত্তর কালে পূর্ববাঙলার প্রগতি-সাহিত্যিকদের যাঁরা নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের পুরোভাগে দেখতে পাচ্ছি জনাব আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলি, বেগম সুফিয়া কামাল প্রভৃতি প্রবীণ সংস্কৃতি-সেবীদের[1]। নতুনদের মধ্যে যাঁরা অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন জনাব আবদুল্লাহ আল্‌মুতী, আলাউদ্দিন আল্‌ আজাদ, হাসান হাফিজুর রহমান, আব্দুল গণি হাজারী, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম প্রভৃতি বস্তুনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক কর্মী[2]। এই প্রবীণ এবং নবীনের সমবেত প্রচেষ্টায় পূর্ববাঙলার প্রগতি-সাহিত্য প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ। অন্ধ ধর্মীয় গোঁড়ামী-প্রসূত সমস্ত প্রকার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সজাগ দৃষ্টির ক্রমবর্ধমান ঔজ্জ্বল্যে বলিষ্ঠ প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর তুলে ধরে তাঁরা অভিযাত্রায় নেমেছেন। ঘোষণা করেছেনঃ "আমরা বিশ্বাস করি সাহিত্য সমাজ-জীবনের নিছক প্রতিফলন নয়, সাহিত্য সমাজ-উন্নয়নের শক্তিশালী অবলম্বন। ক্ষুধা, বেকারী এবং অশান্তির হাত থেকে সমাজ-জীবনকে রক্ষা করা, তার গতিশীলতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পবিত্র দায়িত্ব আজ শিল্পী-সাহিত্যিকদের·· মানুষের কল্যাণের জন্য যে-সাহিত্য, সমাজের গতিশীলতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে-সাহিত্য আমরা সে-সাহিত্যের প্রতি আস্থাশীল··।"

[১৯৫১ সালে চট্টগ্রাম সাংস্কৃতিক সম্মেলনের মূল প্রস্তাব]

---

১. মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী রণেশ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেন প্রমুখ দেশ-বিভাগের পর প্রথম দু-বছর ঢাকার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। পরবর্তীকালে তাঁরা দুজন এবং তরুণ মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী সরদার ফজলুল করিম, মুনির চৌধুরী এই প্রবন্ধ রচনার সময় কারাগারে বন্দী ছিলেন।

২. শুনেছি, আয়ুবের আমল থেকে আবদুল্লাহ আল্‌মুতী সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় এবং হাসান হাফিজুর রহমান পূর্বপাকিস্তান লেখক সংঘের সম্পাদক রূপে আয়ুব-নীতিকেই কার্যকর করেছেন। অবশ্য লেখক হিসাবে শেষোক্ত জন সাহিত্যক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র ভূমিকায় অধিকারী।—লেখক

চট্টগ্রাম সম্মেলনে পূর্ববাঙলার সাংস্কৃতিক কর্মীরা সমাজ-জীবনের গতিশীল ধারা-সংযুক্ত শিল্প-সাহিত্যকে মানব-কল্যাণ-ব্রতে নিয়োগ করতে চেয়ে যে-কর্তব্য নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন নিঃসন্দেহে তা অভিনন্দনযোগ্য। এই দায়িত্বপালনের প্রাথমিক শর্ত হিসেবে আসে ঐতিহ্য-বিচারের প্রশ্ন। সহস্রাধিক বৎসরের বাঙলা সাহিত্যের বিবর্তিত ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়ে আজকের প্রগতি-সাহিত্য অগ্রসর হতে পারে না। জনাব আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ উক্ত সম্মেলনে তাঁর অভিভাষণ-প্রসঙ্গে তাই সঠিক-ভাবেই বলেন: "ঐতিহ্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি ধ্রুব নক্ষত্র বিশেষ। ঐতিহ্যের অনুসরণ ও সেই স্রোত-ধারাকে চির বহমান করিয়া তোলাই সংস্কৃতিসেবীর কাজ।...ঐতিহ্যের পটভূমির সহিত যাহাদের যোগ নাই, তরুলতার ক্ষেত্রে যেমন পরভোজী শব্দ ব্যবহার করা হয়—এখানে ঐ জাতীয় ব্যক্তিদের জন্য তেমনি বিশেষণই আরোপ করা চলে।...ঐতিহ্য হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ার অর্থ জীবন হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া। জীবন হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ার অর্থ·· মৃত্যু।...ইহার শক্তিকে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু স্বীকার করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তাহা হইবে গতানুগতিকতা। আর গতানুগতিকতার অর্থ—শিল্প-সাহিত্যের মৃত্যু। ঐতিহ্যকে স্বীকারের পর তার প্রবাহকে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। সংস্কৃতি-বিকাশের সার্থকতা সেইখানে।" [১৯৫১ সালে চট্টগ্রাম সাংস্কৃতিক সম্মেলনে আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদের ভাষণ]

ঐতিহ্য গ্রহণের এ-আহ্বানকে কোনো সৎ-সংস্কৃতিসেবী উপেক্ষা করতে পারেন না। কিন্তু বাঙলা-সাহিত্যের যে-ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে তার নির্বিচার গ্রহণও প্রগতি-সাহিত্যিকদের কাম্য নয়। কারণ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-সৃষ্টির মূল ভিত্তিভূমিতে আছে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ভৌগোলিক পরিবেশেরই

সক্রিয় প্রভাব। সুতরাং সমাজ-সচেতন দৃষ্টির সাহায্যে বাঙলার লোকায়ত মানসলোকের সেই ইতিহাস এবং তার প্রায়-লুপ্ত ধারাকেও আজ পুনরুদ্ধার করা একান্ত প্রয়োজন। কথাটি বলছি এই কারণে যে, সম্প্রতি পূর্ববাঙলার সাহিত্য-আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, ওয়াজেদ আলি প্রমুখ প্রবীণ সংস্কৃতিসেবীরা যে-ঐতিহ্যকে স্মরণ করছেন* তা মূলত তুর্কী-বিজয় পরবর্তীকালের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। বাঙলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এ-ধারাকে বিশেষভাবে অনুধাবন করতে হবে এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই; কিন্তু তুর্কী-বিজয়ের পূর্ববর্তী লোকায়ত বাঙালি-মানসের ঐতিহ্যের সঙ্গে যদি আমাদের পরিচয় না-ঘটে, যদি না তাকে আমরা সমাজ-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে বিশ্লেষণ করতে পারি তবে প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণকে শুধুমাত্র 'মুসলমান বাদশাহরা দেশবাসীর মনের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য তাদের (হিন্দুদের) ধর্মাদর্শ, কথা ও কাহিনী বাংলা ভাষায় রচনা করবার উৎসাহ দিয়ে এবং পৃষ্ঠপোষকতা করে দেশের যে কত উপকার করেছেন' কিংবা 'হিন্দুধর্ম, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থ-রচনায় সহায়তা করতে মুসলমান নবাবদের মনে কোনো সঙ্কীর্ণতা বা বিদ্বেষ-ভাব জাগেনি'*—এই উদার কথা বলে এবং তারই দৃষ্টান্ত তুলে ধরে প্রতিহত করা সহজতর হবে না।

প্রাক্ তুর্কী-বিজয়ের যুগ, অর্থাৎ বাঙালির আদি পর্বের ইতিহাস বিশ্লেষণের আরও বিশেষ প্রয়োজন আছে। কারণ, মুসলিম বাদশাহরা যে-ভাষায় হিন্দুর ধর্ম, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনায় উৎসাহদান করেছিলেন সে-ভাষা কিন্তু প্রাক-তুর্কী যুগের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের 'ইতর ভাষার'ই বিবর্তিত রূপ। জনাব মোতাহার হোসেনও এ-কথা স্বীকার করেন কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো প্রবন্ধে এ-ধারার বিস্তৃত আলোচনা তিনি বা অন্য কেউ

* পূর্ববাংলার সাহিত্য : ড. কাজী মোতাহার হোসেন। সওগাত : অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯।

করতে অগ্রসর হয়েছেন কি-না জানি না। অথচ, প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্য ব্যবসায়ীরা পূর্ববাঙলায় 'ইসলামী ঐতিহ্যে'র আবরণে বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্রোতধারাকেই আজ নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে— বাঙলা ভাষার মধ্যে মুসলিম শাসনের আগে তৎকালীন উচ্চস্তরের সমাজে যে-রাজসভা-ঘেঁষা ভাষা ছিল সেই দেবভাষা সংস্কৃত-র প্রত্যক্ষ ছায়া আবিষ্কার করে।

এ-ছাড়াও প্রাচীন বাঙলার জন-গঠনের ইতিহাস, বাঙলার নদ-নদী, বন-প্রান্তর, জল বায়ু, ঋতু পর্যায়, ধন সম্বল, ধনোৎপাদন পদ্ধতি, কৃষি শিল্প বাণিজ্য, ভূমি বিন্যাস, সামাজিক বর্ণ ও শ্রেণী-বিভাগ, গ্রাম-নগরের অবস্থান ও রূপ, রাষ্ট্রগঠন ও রাষ্ট্রযন্ত্র, সমাজ বিন্যাস ও রাষ্ট্র বিন্যাসের প্রেক্ষাপটে রাজবৃত্তকথা এবং সর্বশেষে সবার উপরি প্রাচীন বাঙালীর মানস সংস্কৃতি— অর্থাৎ, তার ধর্ম কর্ম, সংস্কার বিশ্বাস, পূজা অর্চনা, দেব-দেবী, মূর্তি মন্দির, শিল্পকলা, নৃত্য-গীত, শিক্ষা দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, আহার-বিহার তথা দৈনন্দিন জীবন যাপন পদ্ধতিকে যদি প্রগতি সংস্কৃতির কর্মীরা বস্তুনিষ্ঠ মন নিয়ে ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক নিয়মের ধারা অনুসরণে আজ পূর্ববাঙলার জনগণের সম্মুখে উপস্থিত করতে প্রয়াসী হন তাহলে প্রাচীন বাঙলার শ্রমজীবী মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুর্কী বিজয়ের পরবর্তী যুগেও কি ভাবে ক্রিয়াশীল ছিল এবং মধ্যযুগের কোন ঐতিহ্যের সঙ্গে কিভাবে মিশে নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে তা জেনে এবং বুঝে, আমরা সেই শ্রমজীবী মানুষের সুখ দুখ, হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহ, বিক্ষোভ-বিদ্রোহের প্রতিফলনকারী ঐতিহ্যধারাকে পূর্ববাঙলার নয়া গণ-সংস্কৃতি সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করতে পারি এবং ধর্মান্ধ প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতির মুষ্টিমেয় ধ্বজাধারীদের মুখোশও খুলে দিতে পারি। আমরা ঐতিহ্য অনুসরণের কথা যখন বলি তখন তা কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার জন্যই বলে থাকি এবং এ-কথাও মনে

রাখি যে, জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নিরপেক্ষভাবে প্রতিটি দেশের, প্রত্যেক যুগের শ্রমজীবী মানুষের জীবন-রূপায়ণকারী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেই আমাদের পবিত্র উত্তরাধিকার। সুতরাং আশা করতে পারি, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন এবং ওয়াজেদ আলি প্রমুখ প্রবীণ সুধীবৃন্দ এ-দায়িত্ব পালনে আরও অগ্রসর হবেন এবং তরুণ সংস্কৃতিকর্মীদেরও গবেষণার পথ উন্মুক্ত করে দেবেন সক্রিয় সহযোগিতা ও সাহচর্যের দ্বারা।

এবার দ্বিতীয় বক্তব্যটি তুলে ধরছি। এই দ্বিতীয় বক্তব্যের সঙ্গে পূর্ববাঙলার প্রগতি-সংস্কৃতিকর্মীদের জীবন-দর্শন গ্রহণের প্রশ্নটি জড়িত। যদিও প্রশ্নটি দ্বিতীয় বক্তব্য রূপে উপস্থিত করছি তবু এটাই মূল প্রশ্ন। কারণ, প্রত্যেক মানুষই কোনো-না-কোনো জীবন-দর্শনের অনুসারী। আর, যে-ব্যক্তির ভাব-জগৎ যে জীবন-দর্শনের আলোকে উদ্ভাসিত তার কর্মধারায় সেই জীবন-দর্শন-সঞ্জাত ভাব-জগতের ছায়াই প্রতিবিম্বিত। ভাব-জগৎ বাস্তব-জগতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু তা নিষ্ক্রিয় নয়। বাস্তবের উপর ভাব-জগৎ সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করে এবং তাকে রূপান্তরিত করে। অতএব, সংস্কৃতিসেবীর জীবন-দর্শন ও তাঁর ভাব-জগতের সৃষ্টিকর্ম—শিল্প-সাহিত্যের গুরুত্বও সমধিক।

আমরা এটাও জানি যে, শিল্পী-সাহিত্যিকেরা মানব-মনের কারুকর্মী। কিন্তু প্রগতি-সাহিত্যিকের পক্ষে এ-কথা অবশ্য স্বীকার্য হলেও তাঁকে আরও অগ্রসর হতে হবে। কারণ, সমাজ-জীবনের গতিশীল ধারা অনুসরণ করাই তো প্রগতি-সাহিত্যিকদের চিরকাম্য। আর, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যে-শ্রেণী এই গতিশীল পন্থার ধারক ও বাহক তার জীবন-দর্শনকে অঙ্গীকার না করে গতিশীল সমাজে মানব-মনের কারুকর্মী হওয়া সম্ভব নয়। বর্তমান ধনতান্ত্রিক সভ্যতার যুগে যেহেতু শ্রমিকশ্রেণীর হাতেই সমাজ-জীবনের গতিশীলতা নির্ভরশীল,

সেইহেতু প্রগতি-সাহিত্যিকদের আজ দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর জীবন-দর্শন। শ্রমিকশ্রেণীর জীবন-দর্শন কেন গ্রহণ করবেন প্রগতি-সাহিত্যিকেরা এ-সম্পর্কে আলাউদ্দিন আল্ আজাদ-এর এক যুক্তিগ্রাহ্য মনোজ্ঞ আলোচনার কিয়দংশ এবার আমি উদ্ধৃত করছি। আজাদ সাহেব বলেছেনঃ "বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিচার করলে একথা স্বীকার করে নিতেই হয় যে, আজকের দিনে মেহনতকারী মানুষই স্বচ্ছতম চোখের অধিকারী। ধনিকদের অনেক বিকৃত গুণের মধ্যে একটা বিশেষ গুণ এই, তারা বড় একচোখা, স্বার্থের গোলক ধাঁধায় তারা অন্ধ,···একচোখা চোখকে সকল আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্যই যতো ধোঁয়াটে সংস্কৃতির পরিমণ্ডল সৃষ্টি (যথাঃ নৈরাশ্যবাদ, মায়াবাদ, নগ্ন যৌন-আবেদন, আঙ্গিক-সর্বস্বতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ইত্যাদি।—ধ. দাশ), শাসন-বন্দুক-বেয়নেটের সতর্ক পাহারা, উঁচানো আইনের পাথুরে আশ্রয়। আর মধ্যবিত্ত? সে তো ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলছে আকাশ আর মাটির মাঝখানে; আকাশের দিকে ওঠার নাম মৃত্যু, আর মাটিতে নামতে চাইলে মুনির আদেশ অমান্য করা ছাড়া উপায় নেই। বাধ্য হয়েই হতে হয় তাকে শাপগ্রস্ত বিদ্রোহী।

কিন্তু মায়ের পেট থেকে পড়েই দোলনার পরিবর্তে যে লুটোপুটি খাচ্ছে ধুলোয়, চোখ খুলেই রঙিন খেলনার পরিবর্তে যে দেখছে ক্ষুধা, কান খাড়া করেই ঘুম-পাড়ানো গানের পরিবর্তে যে শুনছে কারখানার সাইরেন, তার চোখে থাকতে পারে না বিভ্রান্তির কুয়াশা, তার কানে বাজতে পারে না এলোমেলো কল্প-হাওয়ার গুঞ্জন। পৃথিবীতে পড়েই সে জীবনের সামনা-সামনি এসে দাঁড়ায়। মনের জাগরণেই প্রথম যা সে অনুভব করে তা হোল, সে শোষিত; বুদ্ধির উন্মেষেই প্রথম যা সে বুঝতে পারে তা হোল, পৃথিবীতে তাকে স্থান করে নিতে হবে। দেখে, সে একা নয়, কোটি কোটি মানুষ তার সমগোত্রীয়, তাই তার সংগঠন শক্তিতে

ইস্পাতের মতই কাঠিন্য; মানুষের বিস্ময়কর সম্পদ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সে একান্ত কাছাকাছি, তাই সে জানে সৃষ্টি গতিশীল; সে দেখে পৃথিবীর দিকে দিকে তার গোষ্ঠীর অপরাজেয় জয়যাত্রা, তাই ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনায় সে আশ্চর্য স্বাপ্নিক।"

[চোখ আর চশমা, কাফেলা : ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৫৬]

পূর্ববাঙলার প্রগতি সাহিত্যিকেরা আজাদ সাহেবের এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শ্রমিকশ্রেণীর জীবন-দর্শন গ্রহণ করতে শুরু করেছেন—এরই প্রমাণ দেখতে পাচ্ছি ১৯৫২ সালে কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সম্মেলনের কার্যক্রমে, নতুন প্রাদেশিক সংগঠন গড়ার মধ্যে এবং 'সওগাত,' 'যাত্রিক', 'দিলরুবা'. 'সংবাদ' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁদের সৃষ্ট গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ প্রভৃতির ভিতর।

ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার ও জীবন-দর্শন গ্রহণের এই মৌলিক প্রশ্ন আলোচনার পর আসে নন্দনতত্ত্বের কষ্টিপাথরে অন্যান্য সৃষ্টি-কর্মের বিচার-প্রসঙ্গ। সাহিত্যের মূল্য-নিরূপণে নন্দনতাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ সত্যিই অপরিহার্য। কিন্তু এখানে সমস্যাও অনেক। কেন যে সব ঘটনা বা কাহিনী, কিংবা কথা বা সংলাপ গল্পের গল্পত্ব সৃষ্টি করে না, কেন-যে সব কবিতার মধ্যে কবিত্ব নেই, আরও ভালো করে বল্লে—কেন-যে সব শিল্প শিল্পগুণ সম্মত নয়, অথবা রসোত্তীর্ণতার ছাড়পত্র পাবার অধিকারী নয়, এ-একটা সমস্যা বৈ-কি! এখানে এই সমস্যার বিস্তারিত আলোচনা আমার লক্ষ্য নয়; নন্দনতত্ত্বের বিভিন্ন দিক যাতে গভীরভাবে আলোচিত হয় এবং পূর্ববাঙলার প্রগতি-সাহিত্যিকেরা তাঁদের স্ব-স্ব রচনার সৌষ্ঠব বৃদ্ধিতে এবং গুণগত পরিবর্তনের কাজে সেগুলি যাতে ব্যবহার করতে পারেন, সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্য। মনে রাখতে হবে, সৃষ্টিশীল সাহিত্য-কর্মকে উচ্চতর গুণগত মানে উন্নীত করতে হলে পূর্বকথিত জীবন-দর্শনের সহগামী

যে-নন্দনতত্ত্ব তাকে অবহেলা করা প্রগতি-সাহিত্যিকদের পক্ষে ক্ষতিকর নয় শুধু, মারাত্মক অপরাধও বটে।

ইদানীং এ-সম্পর্কে কয়েকটি আলোচনা পড়েছি 'সওগাত' পত্রিকায়। 'সীমান্ত', 'দিলরুবা', 'কাফেলা' প্রভৃতি পত্রিকাতেও সাহিত্য-আলোচনা প্রসঙ্গে নন্দনতত্ত্বের সামান্য কিছু আলোচনাও উত্থাপন করেছেন কোনো কোনো আলোচক। বলাবাহুল্য, অধিকাংশ আলোচনায় লেখকের সমাজ-সচেতন দৃষ্টির পরিচয় মিলেছে কিছুটা, কিন্তু প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির অস্পষ্টতাও লক্ষ্য করেছি প্রায় সর্বত্র। এইসব আলোচনার মধ্যে জনাব নজরুল ইসলামের প্রবন্ধ 'সাহিত্যের শিলালিপি ও জন-অক্ষৌহিনীর ভবিষ্যৎ' (সওগাত : মাঘ, ১৩৫৯) এবং 'কবি ও মানুষ' প্রবন্ধদ্বয় খুবই উল্লেখযোগ্য। এই জাতীয় প্রবন্ধের জন্য পূর্ববাঙলার প্রগতিশীল সাহিত্য-সমালোচকবৃন্দ আরও তৎপরতার পরিচয় দেবেন, এটা নিশ্চয় আশা করতে পারি। আর শুধু আশাই বা কেন, প্রত্যেক সাহিত্য-পাঠকের দাবীও এটা তাঁদের কাছে।

আমার এ-পর্যন্ত আলোচনার পটভূমিকায় পূর্ববাঙলার গল্প-কবিতা-উপন্যাস-নাটক প্রভৃতির আলোচনা প্রয়োজন। এই আলোচনা যদি সঠিকভাবে করা যায় তবে প্রগতি-সাহিত্যিকদের দোষ-গুণের সম্যক বিচারও সম্ভব। কিন্তু সেই আলোচনা দীর্ঘ সময়-সাপেক্ষ ; তাই বারান্তরে বিস্তারিত আলোচনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবার সাধারণভাবে শুধু কয়েকটি কথাই বলতে চাই।

প্রথমে গল্প-সাহিত্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যাক। পূর্ববাঙলার সাম্প্রতিক সাহিত্যে গল্পেরই সংখ্যাধিক্য চোখে পড়ছে। এখানকার সামাজিক বাস্তবতাকে গল্প-লেখকেরা উপলব্ধিতে আনয়নের চেষ্টাও করছেন। কিন্তু যে-শিল্পগুণের সমন্বয়ে সামাজিক বাস্তবতা রসগ্রাহী মনকে পরিতৃপ্ত করতে পারে, ঠিক সেই জিনিসটার অভাব খুবই প্রকট। মাঝে মাঝে অবাক

হয়ে তাই ভাবতে হয়, পূর্ববাঙলার প্রগতি-সাহিত্যিকদের কলমের ডগায় কবে ফুটবে গতিশীল জীবনের সেই রসকমল— যা আপনাকে, আমাকে, সকলকে দেবে সৌন্দর্য আর সুরভির আশ্বাস, দেবে নতুন সমাজ-সংগঠনে উদ্দীপনাময় অনুপ্রেরণা !

এই অবাক হওয়ার কারণ যে-কোনো সৎ-পাঠক একটু অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে এ-যাবৎ প্রকাশিত গল্পগুলি পাঠ করলে সহজে বুঝতে পারবেন। প্রগতিশীল গল্প-লেখকদের মধ্যে যিনি অপেক্ষাকৃত প্রবীণ —সেই শওকত ওসমানের 'খিঁচুড়ি' (সংবাদ : ঈদ সংখ্যা, ১৩৫৯), 'রাতা' (সংবাদ : ঈদ সংখ্যা, ১৩৬০), 'পথ চেয়ে আছি' (সংবাদ : আজাদী সংখ্যা, ১৩৬০), 'মৌন নয়' (সওগাত : অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯), 'পিতা-পুত্র' (সীমান্ত : বৈশাখ, ১৩৫৮) প্রভৃতি গল্পগুলি বিষয়বস্তুর দিক থেকে বর্তমান সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ প্রভাবিত পূর্ববাঙলার জন-জীবনের বিভিন্ন কাহিনী অবলম্বনে রচিত হলেও তা স্থূল বাস্তবতার সীমাকে অতিক্রম করে পাঠকের বাস্তব-ভিত্তিক স্বপ্নিল মনের পক্ষ-বিস্তারে বিশেষ কোনো সাহায্য করে নি। শওকত ওসমান সাধারণ মানুষের সাধারণ কথার সামন্যতাকে গ্রহণ করার মতো ঔদার্য অর্জন করেছেন সত্যি, কিন্তু সেই সাধারণ মানুষের সাধারণ কথা এবং কাজের মধ্যে কী আশ্চর্য অসাধারণ শক্তি-সাহস-দৃঢ়তা লুকানো রয়েছে, তাকে জীবনের চলমান রূপকল্পে অসামান্য করে প্রকাশ করার মতো শিল্প-দক্ষতা কেন-যে তিনি গ্রহণ করতে পারছেন না, সেটাই আমার ভাবনা। আর এই অক্ষমতার জন্য তাঁর অনেক গল্পই পাঠ করার পর অনায়াসেই ভুলে থাকা যায়। শওকত ওসমান সাহেবের তুলনায় বয়সে অনেক নবীন এবং সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত আলাউদ্দিন আল্ আজাদ কিন্তু এদিক দিয়ে অন্তত কিছুটা সার্থকতা অর্জন করতে চলেছেন। আজাদ সাহেবের প্রথম প্রকাশিত গল্প-সংগ্রহ 'জেগে আছি'-তে যা ছিল নিছক

গল্পের কাঁচামাল, আজ দেখছি তা শৈল্পিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবার পথে। তাঁর 'সুর্মা ও সিঁদুর' (সংবাদ : ঈদ সংখ্যা, ১৩৫৯), 'জলটুঙি' (সেরাগল্প : ৭ম খণ্ড), 'অজান্তা' (সওগাত : অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯) প্রভৃতি গল্পের ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষতা আশা ও আনন্দের সংবাদই বহন করছে। আজাদ সাহেবের ত্রুটি শওকত ওসমান সাহেবের মতো অতখানি প্রকট নয়। কিন্তু তাঁরও ত্রুটি আছে—যদিও সে-ত্রুটি বাস্তবতার গাণিতিক ধারণায় নয়, সে-ত্রুটির মধ্যে নিহিত আছে বস্তুর অন্তর্নিহিত শিল্প-সত্যকে আরও ভালোভাবে আবিষ্কার করার অভাব, গতিশীল জীবন-সম্পর্কে প্রাপ্ত জ্ঞানের খণ্ড চিত্রকে অখণ্ডতায় আবদ্ধ করে সেই জ্ঞানের সামগ্রিকতাকে সম্প্রসারণ করার দৈন্য। গল্প-লেখকদের মনে রাখা দরকার যে, রসবোধ কথা নন্দনতাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণাকে বিসর্জন দিয়ে গল্পত্ব সৃষ্টি করতে যাওয়া অনেক ক্ষেত্রে বিড়ম্বনার কারণ হয়।

কাব্য-জীবনে আরও কিছু নতুন লেখকের গল্প পড়ার সুযোগ ঘটেছে। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই লেখক হওয়ার জন্য প্রাথমিক প্রস্তুতির কাজ শেষ না করেই অগ্রসরমান। ফলে, বেশ কিছু অনাসৃষ্টির স্তূপে অন্যান্য প্রতিশ্রুতিবান তরুণ গল্প-লেখকের প্রতিভা অনেক সময় চাপা পড়ে যাচ্ছে। কথাটা রূঢ় হলেও সত্যি। একজন একনিষ্ঠ সাহিত্য-পাঠক হিসেবে এ- .মার সদ্য-লব্ধ অভিজ্ঞতা। তবু আশাবাদী মন নিয়ে ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন-এর সঙ্গে সমকণ্ঠে উচ্চারণ করতে পারি : "অনেক নতুন সাহিত্যিকের মধ্যে উদ্দীপনা আর প্রতিশ্রুতি দেখা যাচ্ছে। এঁদের চেষ্টায় ভালো ফসল ফলবে, আবার কিছু আগাছার সৃষ্টি হবে। আগাছার জন্য চিন্তার কারণ নেই। ওগুলো আপনা থেকেই (অর্থাৎ, জাগ্রত জনসাধারণের অনাদরেই) মরে যাবে আর সু-সাহিত্য উৎসাহ পাবে।"

[পূর্ববাংলার সাহিত্য, সওগাত : অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯]

এই আশা দৃঢ়তর হয় যখন দেখি শওকত ওসমান, আলাউদ্দিন আল্ আজাদের পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করেছেন বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আনিস চৌধুরী, সরদার জয়নুদ্দিন, আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী প্রমুখ তরুণ গল্প-লেখকের দল। প্রায় কিশোর-বালক বোরহানউদ্দিন। মাত্র ১৮ বছর তাঁর বর্তমান বয়স। কিন্তু তাঁর গল্পের বলিষ্ঠ ভঙ্গী অস্বীকার করার উপায় নেই কোনো সৎ-পাঠকের। সত্যিই সাহিত্য-সমুদ্রের অথৈ পাথারে গল্পের দ্বীপ আবিষ্কার করতে চলেছেন তিনি। সেই দ্বীপে যেদিন তিনি শিল্প-সুষমা মণ্ডিত গল্পের সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করিতে সক্ষম হবেন, সেই দিনই সার্থক হবে তাঁর সাধনা। প্রতিভার স্বাক্ষর আনিস চৌধুরী, সরদার জয়নুদ্দিন আর আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর মধ্যেও দুর্লক্ষ্য নয়। এই প্রতিভার বিস্ময়কর বিস্ফোরণ ঘটুক জনগণের বিমুগ্ধ আত্মিক-চেতনার আত্মীয়তায়, এটাই আমাদের কামনা। মনে রাখা প্রয়োজনঃ অলৌকিক প্রতিভা বলে কোনো পদার্থ নেই। সাহিত্যিকের সামাজিক দায়িত্ব, জীবন-ধর্মিতা এবং শ্রমজীবী মানুষের অন্তর্নিহিত প্রাণৈশ্বর্যের মধ্যেই নিহিত আছে প্রতিভার বিদ্যুৎ-শিহরণ। এই সত্য বস্তু থেকে বিচ্যুত হওয়ার অর্থ—প্রতিভার অপমৃত্যু। পূর্ববাঙলার প্রগতি-শীল সাহিত্যিক-বন্ধুদের যদি সৃষ্টির চরম লক্ষ্যে পৌঁছুতে হয় তবে একে জীবনের অঙ্গীভূত করা ছাড়া গত্যন্তর কোথায়?

গল্প-সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এবার আমি একটি সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি পূর্ববাঙলার প্রগতি-সাহিত্যিকদের, বিশেষ করে গল্প-লেখকদের। সমস্যাটি হলো সাহিত্যের ভাষা ও সংলাপের (Literary Language & Dialogue) সমস্যা। প্রকৃতপক্ষে, সাহিত্যের ভাষা ও সংলাপ নিয়ে সম্প্রতি পূর্ব-বাঙলার সাহিত্যিকদের মনে সমস্যা দেখা দিয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরে বাঙলা-সাহিত্যের ভাষা রূপে স্বীকৃত গঙ্গা-ভাগীরথী তীর-

বর্তী মানুষদের কথ্য ভাষাকে তাঁদের কেউ কেউ সম্পূর্ণ বর্জন করতে চাইছেন। অথচ আমরা জানি, ভাগীরথী-জনপদ ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হওয়ায় (প্রধানত ঊনবিংশ শতাব্দীতে) এই জনপদের কথ্য ভাষা শক্তিশালী লেখ্য সাহিত্যিক ভাষায় উন্নীত হয়েছিল। এই সাহিত্যিক ভাষা-সৃষ্টিতে কোনো বিশেষ ব্যক্তি, দল বা সম্প্রদায়ের দাবী কোনোক্রমেই স্বীকার্য নয়। সমগ্র হিন্দু-মুসলমান বাঙালি জাতি মিলিতভাবে মনের ভাব সুষ্ঠু রূপে আদান-প্রদানের জন্য এই লেখ্য সাহিত্যিক ভাষার পুষ্টি ও সৌকর্য-সাধনে সমান ভাবেই দান করেছেন, এ-কথাটি আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। একথাও সত্যি যে, এই লেখ্য ভাষায় পূর্ববাঙলার বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা ও সংলাপকে অবহেলা করা হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে। কিন্তু আজ যদি এই অবহেলার মূল কারণগুলি অনুসন্ধান না করে এতদিনের অবদান-পুষ্ট সাহিত্যিক ভাষার পরিবর্তে পূর্ববাঙলার আঞ্চলিক ভাষা ও সংলাপকে যথেচ্ছভাবে সাহিত্যে আমদানী করতে শুরু করি তবে আমরা এক অন্ধ সঙ্কীর্ণতা-বাদের দিকেই পা বাড়াতে বাধ্য হবো।

সম্প্রতি পূর্ববাঙলায় এই বিপদ ডেকে আনছেন একদল অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন স্বার্থবাদী মানুষ। পূর্ববাঙলার প্রগতি-সাহিত্যিকদের যথেষ্ট সতর্কতা নিয়ে দৃঢ়পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে হবে এই সমস্যা মোকাবিলার জন্যে। সময়স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া কোনো-ক্রমেই উচিত হবে না। আঞ্চলিক ভাষা ও সংলাপকে আমাদের আত্মস্থ করতে হবে নিশ্চয়, কিন্তু অন্ধভাবে নয়। এতে সাহিত্যের আবেদন সীমাবদ্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ, পূর্ব-বাঙলার বিভিন্ন জেলা ও অঞ্চলের ভাষা এবং সংলাপের মধ্যে এত বেশি পার্থক্য বিদ্যমান যে, এক অঞ্চলের ভাষা ও সংলাপ অন্য অঞ্চলের সাধারণ মানুষের কাছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে

একেবারেই দুর্বোধ্য। এছাড়া ভাষা ও সংলাপের সৌকর্য ও স্বরধ্বনির (Phonetics) বিজ্ঞান-সম্মত প্রয়োগের দিকেই আমাদের ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করা উচিত। প্রগতি-সাহিত্যিকদের মনে রাখতে হবে: "কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণী ভাষা সৃষ্টি করে নি। বহু শতাব্দীব্যাপী সমগ্র সমাজের ও সকল শ্রেণীর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই ভাষার সৃষ্টি হয়েছে।"—স্তালিন।

সমস্যাটি-যে বেশ গুরুত্বপূর্ণ তার প্রমাণ পেলাম জনাব ওয়াজেদ আলি' সাম্প্রতিককালের "সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা" নামক প্রবন্ধে 'পূর্ববাঙলার সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনটি দুর্ঘটনার কথা' উল্লেখে একে অন্যতম স্থান দেওয়ায়। জনাব ওয়াজেদ আলি লিখেছেন: "আমাদের অনেক সাহিত্যিক বর্তমানে ভাষার কথ্যরূপ ব্যবহার করতে প্রলুব্ধ হচ্ছেন। কিন্তু এটা যে কত বড় কঠিন কাজ, সে সম্বন্ধে তাদের স্পষ্ট ধারণা আছে বলে মনে হয় না। পূর্ববাঙলায় বলা যায়, ভাষার এমন কোনো কথ্যরূপ এখনো আবিষ্কৃত হয় নি। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের আদর্শ কথ্যভাষার আদর্শ রূপ গ্রহণ করেই আপাততঃ আমাদের কাজ চালানো ছাড়া উপায়ান্তর নেই। কিন্তু সবাই দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন যে, আমাদের এই প্রদেশের খুব কম-সংখ্যক সাহিত্যিক কথ্যভাষার এই আদর্শকে পরোয়া করে চলছেন। তাই অনেকের ভাষাতেই কথ্য ও লেখ্য ভাষার জগা খিঁচুড়ি তৈরী হচ্ছে এবং অন্য ভাবেও কথ্যভাষার আদর্শ ভেঙ্গে পড়ছে। একে কিছুতেই একটি সুলক্ষণ বলে মনে করা যায় না।"

[সওগাত : পৌষ, ১৩৫৯]

এর উপর বেশি মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। শুধু বলবো : বাঙলাদেশ ভাগ হয়ে দুটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু বাঙলাভাষা বিভক্ত হয়নি। ভাষার বৈপ্লবিক পরিবর্তনও অসম্ভব। ভাষা মানুষের ভাব আদান-প্রদানের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার একটি

নিজস্ব নিয়ম আর গতিও জন্মলাভ করেছে। এই নিয়মের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে ভাষার নতুন শব্দ-সম্পদ আত্মস্থ করার যে-ক্ষমতা তা সে করবেই, একে জোর করে পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা বাতুলতা মাত্র। প্রগতি-সাহিত্যিকদের অনুধাবন করা উচিত ঃ ভাষা সমাজের বনিয়াদ (Base) কিংবা উপরিতল (Super-Structure) নয়। সামাজিক বনিয়াদের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটে এবং সেই সঙ্গে তার উপরিতলের পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। যেহেতু ভাষা ও-দুটির কোনটিই নয়, সেইহেতু এর বৈপ্লবিক পরিবর্তন নেই। কিন্তু ভাষার নিজস্ব নিয়মে রূপান্তরের ক্ষমতা আছে, এ-কথাও অনস্বীকার্য।

যাহোক, পূর্ববাঙলার প্রগতিশীল গল্প-সাহিত্যের পাশে প্রতিক্রিয়াশীল গল্প-লেখকদের একটি ম্লান ধারা প্রবাহিত। ম্লান বলে একে উপেক্ষা করা ঠিক হবে না ; বরং এই ক্রমক্ষয়িষ্ণু ধারাটির অবলুপ্তি ঘটাবার জন্য প্রগতি-সাহিত্যিকদের সচেতনভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এই প্রতিক্রিয়াশীল ধারাটির কর্ণধারেরা যৌন-আবেদন, অধ্যাত্মবাদ এবং নৈরাশ্যবাদকেই মূলত তাঁদের জীবন-দর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। মাহবুব-উল-আলমের 'যমপাখী' (সংবাদ ঃ ঈদ সংখ্যা, ১৩৬০) 'মফিজন' এবং আবুল কালাম সামসুদ্দিনের বিভিন্ন গল্পে উপরোক্ত জীবন-দর্শনের বিভিন্ন রূপ নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আশার কথা, পূর্ববাঙলার অধিকাংশ তরুণ লেখক সচেতন ভাবে এ-পথ পরিত্যাগ করে চলেছেন, বেছে নিয়েছেন মানবিকতার মহিমাদীপ্ত প্রশস্ত রাজপথ।

গল্প-সাহিত্যের আলোচনা আর বিস্তৃততর করে লাভ নেই। এবার কাব্য-সাহিত্য সম্পর্কে দু-একটি প্রাসঙ্গিক কথা বলে আলোচনা শেষ করা যাক। এ-কথা সত্যি যে, ব্যক্তিগতভাবে কাব্যের ক্ষেত্রে আমার মনের স্ফূর্তি ঘটে। পূর্ববাঙলার প্রগতি-কাব্যের গতি-প্রকৃতি ও বিবর্তন তাই আমি গভীর অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি। এ-ব্যাপারে আমার মনে অনেক

প্রশ্ন জমেছে এবং বক্তব্যও আছে যথেষ্ট। কিন্তু সময় ও স্থানাভাবে বর্তমান প্রবন্ধে সে-সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা অসম্ভব। সুতরাং পূর্ববাঙলার প্রগতিশীল কবিদের কবিতা পাঠের পর আমার মানসিক প্রতিক্রিয়ার কয়েকটি মোটা কথাই শুধু ব্যক্ত করছি এখানে।
অতি সংক্ষেপে সেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে হলে বলতে হয়, পূর্ববাঙলার প্রগতি-কাব্যে সাধারণভাবে এখন এক অরাজকতা বিদ্যমান। দু-জন কিংবা তিনজন কবির কথা বাদ দিলে বলা যেতে পারে, পূর্ববাঙলার অন্যান্য তরুণ কবির কবিতায় তেমন কোনো বক্তব্য নেই, এমনকি কবিতার নিম্নতম মানও তাঁরা রক্ষা করেন না। আপাত-মধুর বুদ্ধি-কণ্ডূয়নের শাব্দিক আড়ম্বরপূর্ণ অনুকরণপ্রিয়তাই যেন তাঁদের একমাত্র সম্বল। কথাগুলি একটু আক্রমণাত্মক হয়ে গেল, কিন্তু উপায় নেই। কাব্য-দেহে যে-দুষ্ট-ব্যাধি বাসা বাধবার উপক্রম করেছে তাকে যদি এই মুহূর্তে উপযুক্ত চিকিৎসার দ্বারা সুস্থ করে তোলা না যায় তবে আতঙ্কিত হবার কারণ আছে। বিশেষ করে শামসুর রহমানের মতো সত্যিকার প্রতিভাবান তরুণ কবিকে যখন দেখি প্রগতিশীল মতবাদ পোষণ করেও প্রায় আত্মরতিতে মগ্ন হইয়, কাব্যের স্বতঃস্ফূর্ত অনবদ্য হৃদয়াবেগকে বুদ্ধির ঘর্ষণে জীবনানন্দ-বিষ্ণু দে-র অনুকরণে অস্বাভাবিক কলা-কৌশলে কণ্টকাকীর্ণ করে তুলতে, তখন আশাহত যন্ত্রণায় মনটা ছটফট করে ওঠে। অথচ পূর্বাঙলার তরুণতম কবি-গোষ্ঠীর মধ্যে শামসুর রহমানের চেয়ে শক্তিশালী লেখনী অন্য কেউ আজও করায়ত্ত করতে পারেন নি বলেই আমার ধারণা। অবশ্য শামসুর রহমানের সর্বশেষ কবিতা 'যৌবনোত্তর' (সওগাত : মাঘ, ১৩৫৯) পাঠে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছি। কারণ, এই কবিতায় তিনি পূর্বসূরীদের অন্ধ অনুকরণ না করে অনুসরণ করেছেন মাত্র। আর, এই অনুসরণে তাঁর নিজস্ব বাকভঙ্গী ও কবি-ব্যক্তিত্বে

কিছুটা স্বাতন্ত্র্যও রক্ষা করতে পেরেছেন।*

দুঃখের হলেও এ কথা সত্য যে, পূর্ববাঙলার তরুণ কবিদের নিজস্ব কাব্য-বৈশিষ্ট্য এখনও তেমন করে আমার অন্তত দৃষ্টিগোচর হয় নি। এঁরা প্রায় সবাই অন্যের আলোকে নিজেদের আলোকিত করতে যেয়ে কাব্য-জগতকে আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলছেন। আমি অবাক হয়ে যাই, যখন দেখি বহু তরুণ কবি একটানা লিখেও নীরেন্দ্র চক্রবর্তীর মতো সাধারণ কবিকেও† অনুকরণ করতে দ্বিধাবোধ করেন না। আর, এ-অনুকরণ এমনি অন্ধ যে, নীরেন বাবুর পংক্তি গঠন, শব্দ-চয়ন—এমনকি যতি-চিহ্ন স্থাপন পর্যন্ত হুবহু তাঁদের কাব্যে স্থান পায়। তরুণ কবিরা যত শীঘ্র এই অন্ধ অনুকরণের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারবেন পূর্ববাঙলার কাব্য-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ততই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

অবশ্য চিত্রের এই অন্ধকার দিকের পাশে একটা উজ্জ্বল দিকও আছে। কাব্য-চিত্রের সেই উজ্জ্বল দিকে দেখতে পাচ্ছি আহসান হাবীব, সানাউল হক, আশরাফ সিদ্দিকী প্রমুখ আরও দু-একজন কবিকে। আহসান হাবীবকে আমরা বিভাগ-পূর্ব কাল থেকেই চিনি। তাঁকে জানি শান্ত-স্বভাবের সৎ কবি রূপে। বিভাগ-পূর্ব যুগেই তিনি তাঁর কবি-সততার জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন তৎকালীন কাব্যামোদীদের কাছে। জন-জীবনের বৈচিত্র্যময় অনুভূতি তাঁর কাব্যের মর্মমূলে উপস্থিত থাকলেও হাবীব সাহেবের কাব্যে একটি নিভৃত মুহূর্তের আত্মগত সুরও সে-সময় ধ্বনিত হতে শুনেছি। কিন্তু বিভাগোত্তর কালে তাঁর কাব্যে আত্মগত সুরের

*শামসুর রহমান এখন উভয় বাংলায় সুপরিচিত এবং অগ্রণী কবি-রূপে স্বীকৃত। তাঁর কবি-জীবনের সূচনা-পর্বে আমি তাঁর মধ্যে যে-কবিত্বশক্তি লক্ষ্য করেছিলাম তা ফলবতী হয়েছে দেখে আজ আমি সত্যিই খুশি।—লেখক

† ১৯৫৩ সালে এই প্রবন্ধ রচনার সময় কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আমাদের কাছে খুব উল্লেখযোগ্য কবিরূপে প্রতিভাত হন নি। পরবর্তীকালে তিনি যথেষ্ট কবি-কৃতিত্বের অধিকারী, এ-কথা, আজ সানন্দে স্বীকার্য।—লেখক

পরিবর্তে শুনছি সমষ্টিগত জন-জীবনের এক হৃদয়সংবেদ্য ঐকতান তাঁর এই বিবর্তিত কাব্য-যাত্রায় তাই আমরা পেয়েছি 'শান্তি আসুক', (মানুষের স্বপক্ষে : সম্পাদক, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়)-এর মতো স্মরণীয় কবিতা। হাবীব সাহেবের ব্যঙ্গ-কবিতা আজ আর শুধু বুদ্ধিবৃত্তির ঔজ্জ্বল্যেই নিঃশেষিত হচ্ছে না, জন-শত্রুর প্রতি ঘৃণা আর ক্ষোভের আগুনও সেই কবিতায় ধিকি ধিকি জ্বলছে (ধন্যবাদ, মাহেনও : স্বাধীনতা সংখ্যা, ১৩৫৮)।

হাবীব সাহেবের কাব্যের অনাড়ম্বর ধ্বনিময় শব্দ-যোজনা, স্বচ্ছন্দ ছন্দের ঋজু ভঙ্গী, বিশেষ ভাবকে নির্বিশেষে পৌঁছে দেবার কাব্য-নৈপুণ্য প্রভৃতি লক্ষণগুলি দেখে স্বতঃই মনে হয়, পূর্ববাঙলার প্রগতিশীল বাঙলা-কাব্যে তিনি নতুন অবদান রেখে যেতে পারবেন। পূর্ববাঙলার তরুণ কবিদের অনেক কিছুই শিক্ষণীয় আছে তাঁর কাছে, আর এ-পাঠ তাঁরা গ্রহণ করবেন বলেই আমার বিশ্বাস।*

সানাউল হকও বিভাগ-পূর্ব যুগের সুপরিচিত প্রগতিশীল কবি। তাঁর 'অভিনন্দন : মণিকে' (ইস্পাত : শচীন ভৌমিক সম্পাদিত, কলকাতা থেকে প্রকাশিত কিশোর বাহিনীর মুখপত্র) নামক কবিতাটি আজও আমার কানে বাজে। সনেটীয় কারুকার্যে, মুগ্ধকর ছন্দ-চাতুর্যে তাঁর দক্ষতা স্বীকার না করে উপায় নেই। বিভাগোত্তর কালে সানাউল হকের মাত্র কয়েকটি কবিতা পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে। এই কবিতাগুলিতেও তাঁর সনেটীয় মেজাজ উপস্থিত। কিন্তু বিভাগ-পূর্ব কালের মতো জীবনের সংরাগে সেগুলি তেমন অনুরণিত নয়। কেমন একটা শান্ত-কোমল মুহূর্তের বঙ্কিম প্রকাশের তন্ময়তায় তা যেন আচ্ছন্ন (আমন্ত্রণ : শ্যামলীকে, সংবাদ : ঈদ সংখ্যা, ১৩৫৯)। কবিতাগুলি সুখপাঠ্য

*শুনেছি, আহসান হাবীব আয়ুব-শাসনে অশুভ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। শুনেছি, তিনি নাকি আয়ুব-আমলের রবীন্দ্র-বিরোধীদেরও অন্যতম। কিন্তু হাসান মুরশিদ অতীত-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় 'দেশ' পত্রিকায় তাঁকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন, তাও সঠিক নয়।—লেখক

সন্দেহ নেই। কিন্তু পাঠ-সুখের মধ্যেই কবিতার আবেদন যদি নিঃশেষিত হয়ে যায় তবে কাব্য-জগতে প্রগতি আর প্রতিক্রিয়ার ভেদরেখা টানার সার্থকতা কোথায়? কবিতাকে রসগুণের সমন্বয়ে সুখপাঠ্য করেও প্রগতিশীল কবিদের তো আরও অনেক দূর অগ্রসর হতে হবে। অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ জগতের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বিচিত্র অনুভূতিকে কাব্যমুখীন করে দ্বন্দ্ব-সংঘাত উত্তীর্ণ জীবনের মন্ত্রও তো শোনাতে হবে তাঁকে গণ-মানবের কানে কানে। সানাউল হক পূর্ববাঙলার জনগণের জন্য নিশ্চয় উৎসর্গ করবেন সেই কাব্যমন্ত্র।

'তালেব মাস্টার'-এর কবিরূপেই আশরাফ সিদ্দিকী আমাদের কাছে পরিচিত। ছাত্র-জীবনে তাঁর 'তালেব মাস্টার' রচিত হলেও ১৯৪৪ সালেই এই কবিতার রচয়িতাকে দু-হাত তুলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সেদিন অবিভক্ত বাঙলার সুধীসমাজ। এরপর আশরাফ সিদ্দিকী অজস্র কবিতা লিখেছেন, কিন্তু 'তালেব মাস্টার'-এ যে বলিষ্ঠ সমাজ-চেতনার প্রকাশ দেখেছিলাম তা অন্য কোনো কবিতায় উপস্থিত না দেখে একটু আশ্চর্য হয়েছি। আশরাফ সিদ্দিকী পূর্ববাঙলার তরুণ কবিদের মধ্যে প্রবীণ। তাঁর দায়িত্বও তাই অনেক বেশি। কিন্তু তিনি কোনো সুস্পষ্ট জীবন-দর্শন আজও গ্রহণ করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। তাঁর কাব্যে অধ্যাত্মবাদের ছায়াও ইদানীং উপস্থিত দেখছি। প্রেমের সুললিত আবেগেও তাঁর অনেক কবিতা উদ্বেলিত। কিন্তু এই প্রেম প্রায় সর্বক্ষেত্রে সমাজ-সম্পর্কচ্যুত জীবনের বিমূর্ততায় (abstract) কেমন যেন দিশেহারা। আবার কোনো কবিতায় জীবনের প্রতি অসীম দরদেও তাঁর কাব্যাবেগ উৎসারিত।

আশরাফ সিদ্দিকীর কাব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি এখনো আত্ম-জিজ্ঞাসার বন্ধুর পথ অতিক্রম করে বিশ্বাসের রাজ্যে উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। তাঁর কবিতায় আশাবাদের যে-ফল্গুধারা প্রবাহিত তা জীবন-সমুদ্রের কলো-কল্লোলে কবে সত্যিকার

পথ খুঁজে পাবে, বিশ্বাসে উজ্জীবিত হয়ে উঠবে—সেই প্রতীক্ষাতেই থাকবো।

এককালের কবি আলাউদ্দিন আল্ আজাদ বর্তমানে গল্প-লেখক হিসাবেই সুপরিচিত। তাই তাঁর কবিতা নিয়ে আলোচনা না করলেও চলে। তবু এ-কথা স্বীকার্য যে, পূর্ববাঙলার তরুণ কবিদের মধ্যে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তাঁর প্রথম জীবনের কবিতায় কাহিনীমূলক বক্তব্যেরই প্রাধান্য ছিল। তখন থেকেই আমার মনে হয়েছে, গল্পই হবে তাঁর ভাব-প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। আলাউদ্দিন আল্ আজাদ সঠিক পথ বেছে নিয়েছেন। তাঁর এই দূরদৃষ্টির জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানানই আমাদের কর্তব্য।

পূর্ববাঙলার তরুণ কবিদের মধ্যে হাসান হাফিজুর রহমান, আতাউর রহমান, আবদুল গণি হাজারী, মোসলেউদ্দিন, আবুজাফর ওবায়দুল্লাহ (প্রিয়তমাসু, সওগাত : অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯), মাহফুজউল্লাহ (আশ্বাস, দিলরুবা : আজাদী সংখ্যা, ১৩৫৯) প্রমুখ সত্যিই প্রতিশ্রুতিবান কবি। উপযুক্ত অনুশীলনের মাধ্যমে এদের হাতে পূর্ববাঙলার কবিতা সমৃদ্ধ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

যাহোক, প্রগতিশীল গল্প-ধারার পাশে প্রতিক্রিয়াশীল গল্প-ধারাকে আমি যত ম্লান বলে উল্লেখ করেছি, প্রগতি-কাব্যের পাশাপাশি প্রতিক্রিয়াশীল কাব্যধারাকে তত ম্লান বলে মনে হয় না। কাব্যজগতে প্রতিক্রিয়ার শক্তি এখনও বেশ প্রবল। সূক্ষ্ম অধ্যাত্মবাদ আর হতাশা এঁদের মূল পুঁজি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রগতিশিবিরকে সরাসরি আক্রমণের জন্যও এঁরা যথেষ্ট তৎপর। এঁদের কাব্যে উজ্জ্বলতা নেই, কিন্তু সংখ্যাধিক্য আছে। যিনি সম্প্রতি 'হায়াৎ দরাজ খান পাকিস্তানী'—এই ছদ্মনামে প্রগতিশিবিরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ—সেই ফররুখ আহমদ

এবং তাঁর যোগ্য সহযোগী আলি আহসান* প্রতিক্রিয়াশীল কবিদের নেতৃত্বে সমাসীন। এঁদের কাব্যে মৃত্যুর লক্ষণ সুস্পষ্ট। সূক্ষ্ম অধ্যাত্মবাদে আশ্রয় গ্রহণের কারণও এর মধ্যেই নিহিত। প্রগতিশীল কবিদের তথা সাংস্কৃতিক-কর্মীদের নির্মমভাবে এঁদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে হবে, পূর্ববাঙলার কাব্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যুগ-মানসের রূপকল্প বহনকারী প্রগতি-কাব্যের জীবনধর্মী সেই স্বচ্ছ প্রাণ-প্রতিমাকে।

পূর্ববাঙলার প্রগতি-সাহিত্য এখনো শৈশবাবস্থায় একথা সত্যি, কিন্তু তার জয়যাত্রা শুরু হয়েছে। ত্রুটি-মুক্ত সাহিত্য-উপাচার আজও হয়তো পাইনি, কিন্তু জীবনধর্মী চেতনায় ভবিষ্যৎ প্রত্যাশার দিগন্ত-দুয়ার উন্মুক্ত হতে চলেছে। এই সম্ভাবনাকে পূর্ববাঙলার প্রগতি-সাহিত্যিকেরা সার্থকতার প্রান্ত-সীমায় পৌঁছে দেবেন, এটা নিশ্চয়ই আজ আশা করা যায়।"

এই প্রবন্ধটি রচনার কাজ আমি শেষ করেছিলাম ১৯৫৩ সালের ২৫এ আগস্ট। জেল-জীবনের শত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা পূর্ব-বাঙলার সাহিত্য তথা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মূল ধারা, তার দোষ-গুণ, সবলতা-দুর্বলতা অনুধাবন করতে-যে প্রাণপণে চেষ্টা করেছি, আশাকরি এই গ্রন্থের পাঠক তা সহজেই অনুমান করতে পারবেন। জেলখানার নিঃসঙ্গ দূরত্বে অবস্থান করে, কোনো ব্যক্তি-মানুষ বা ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং উপরোক্ত প্রবন্ধে যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবেই পূর্ববাঙলার সাহিত্য-আন্দোলনের প্রায় এক দশকের মূল্যায়ন করা হয়েছে।

---

*আলি আহসান ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল, এই প্রবন্ধ রচনার সময় পর্যন্ত, 'আজাদ' ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় যে-সব রচনা প্রকাশ করেন তাতে তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব সুস্পষ্ট ছিল। আমরা অন্তত তাঁকে সেইভাবেই দেখেছি। আয়ুব-আমলে তিনি ঢাকা বাঙলা আকাদেমীর কর্ণধার রূপেও আমলাতন্ত্রেরই পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তাঁর নেতৃত্বেই অনূদিত হয়েছে আয়ুবের আত্মজীবনী। আজ শুনছি তিনি মোহমুক্ত। শরণার্থী-বুদ্ধিজীবীরূপে তিনি এখন আওয়ামী লীগের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধে তাঁর সহায়তা দান করছেন। এটা আনন্দ-সংবাদ।—লেখক

এ-মূল্যায়ন বাস্তবভিত্তিক। শরণার্থী-বুদ্ধিজীবী হাসান মুরশিদ-এর মতো অতীত ও পরিপ্রেক্ষিত বিচ্ছিন্ন সাবজেক্টিভ চিন্তাভাবনায় তা যে ভারাক্রান্ত নয়, এ-কথা অনায়াসেই বলতে পারি।

আমি পূর্বেই বলেছি, এই প্রবন্ধ রচনার পর অনেক কাল কেটে গিয়েছে এবং কালের ব্যবধানে হয়তো অনেক লেখকের লেখনশৈলী আর ভূমিকারও অদল-বদল ঘটেছে। এ-সম্পর্কে আমি বর্তমানে যতটুকু জানতে পেরেছি তা উক্ত প্রবন্ধের নীচে পাদটীকা সহযোগে তুলে ধরতেও কার্পণ্য করি নি। মোটের উপর, আজ থেকে ১৮ বছর আগে পূর্ববাঙলার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের এই বিচার-বিশ্লেষণের সত্যাসত্য বিচারের ভার আমি সচেতন পাঠকের উপরই ন্যস্ত করতে ইচ্ছুক।

১৯৫৩ সালে আমরা রাজবন্দীরা যেমন জেলের মধ্যে সংঘবদ্ধ হবার চেষ্টা করেছি, তেমনি এই বছর বাইরের রাজনৈতিক জীবনেও শুরু হয়ে যায় প্রচণ্ড ভাঙা-গড়ার খেলা। ভাষা-আন্দোলনের পর মুসলিম লীগ-বিরোধী যে-চেতনা ছাত্র ও যুব-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পূর্ব-বাঙলায় ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হতে থাকে ১৯৫৩ সালে নির্বাচনের প্রাক্কালে সেই চেতনাকে মূলধন করে মুসলিম লীগকে পরাজিত করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতাদের মধ্যেও ওঠে সাজ সাজ রব।

জনাব সুহ্‌রাবর্দি, মওলানা ভাসানী এবং শেখ মুজিবর রহমানেব নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ এ-ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি তৎপরতার পরিচয় দিতে শুরু করে। কারণ, এককালের মুসলিম লীগের দুই প্রধান স্তম্ভ জনাব সুহ্‌রাবর্দি ও মওলানা ভাসানীর মুসলিম জনসাধারণের উপর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এই দুই প্রধান নেতা মুসলিম লীগ-বিরোধী ভূমিকায় সক্রিয়ভাবে অবতীর্ণ হওয়ায় মুসলিম লীগ-শাসনে জর্জরিত মানুষ আশান্বিত হয়ে উঠেছিল।

সুতরাং মুসলিম জনগণের একাংশ তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণের হাতিয়ার হিসেবে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিই আকৃষ্ট হতে থাকে। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পর যাঁদের নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা ও কৃতিত্বে এই সংগঠন মোটামুটি একটা গণ-ভিত্তির উপর দাঁড়ায় তাঁদের মধ্যে মওলানা ভাসানী এবং শেখ মুজিবর রহমানেব কৃতিত্বই সর্বাধিক। জনাব সুহ্‌রাবর্দি প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা ছিলেন, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। অবিভক্ত বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাসেও তাঁর অনেক তীক্ষ্ণবুদ্ধি কর্মতৎপরতার কথা লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু কেন জানি না, এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজনৈতিক নেতাকে বিভাগোত্তর কালের প্রথম কয়েক বছর পাকিস্তানের রাজনীতিতে তেমন কোনো সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখি নি। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করে তাঁর অনুগামী শামসুল হক বিজয়ী হলে তিনি পাকিস্তানের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেন। কিন্তু আকরাম খাঁ-নাজিমুদ্দিন গোষ্ঠী তাঁর এই প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে সচেষ্ট হন। লীগ-সরকার তাঁকে এতই ভয়ের চোখে দেখতেন যে, শামসুল হক-এর নির্বাচনী মামলা পরিচালনার জন্য জনাব সুহ্‌রাবর্দি ঢাকায় এলে ১৯৫০ সালের ১৯এ জুলাই স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী এক নিষেধাজ্ঞা জারী করে তাঁর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেন এবং ২৮এ জুলাইয়ের মধ্যে নির্বাচনী মামলার কাজ শেষ করে তাঁকে পূর্ববাঙলা ত্যাগের নির্দেশ দেন। জনাব সুহ্‌রাবর্দি সেদিন সেই নির্দেশ মতোই কাজ করেছিলেন। লীগশাহীর দাপটে জনাব সুহ্‌রাবর্দির মতো প্রথম শ্রেণীর একজন রাজনৈতিক নেতার যখন এই দশা তখন মওলানা ভাসানী এবং শেখ মুজিবর রহমানকে-যে কী ঝুঁকি নিয়ে মুসলিম লীগ-বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করতে হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। ফলত, আমরা দেখেছি, ১৯৫০ থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে মওলানা ভাসানী এবং শেখ মুজিবর রহমান

একাধিকবার গ্রেপ্তার বরণ করে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে আমাদের সহযাত্রী হয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে আমরা মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের অতীত ইতিহাস কিছুটা স্মরণ করতে পারি। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী মুসলিম লীগের প্রবীণতম নেতা। দেশ-বিভাগের পূর্বে তিনি ছিলেন আসাম প্রদেশের মুসলিম লীগের সভাপতি। মুসলিম লীগের দ্বিজাতি-তত্ত্বের গোঁড়া সমর্থক ও প্রবক্তা রূপে আসামে তাঁর অনুসৃত নীতি অনেক সময় নানা বিপর্যয়ও ডেকে এনেছে। এমনকি, আসামের তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাশ সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপের অভিযোগে তাঁকে কারারুদ্ধ রাখতেও বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু ভাসানী সাহেব মুসলিম লীগের ভ্রান্ত রাজনীতির শিকারে পরিণত হলেও তাঁর শত্রুপক্ষও স্বীকার করেছেন যে, তিনি ছিলেন নিপীড়িত মুসলিম জনগণের, বিশেষ করে নিঃস্ব মুসলিম কৃষক-সমাজের অকৃত্রিম হিতৈষী ও সুহৃদ। এরি ফলে, দেশ-বিভাগের পূর্বে মুসলিম লীগের রাজনীতি বিভিন্ন প্রদেশে মূলত মুসলিম জমিদার-জোতদার-পুঁজিপতি ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও আসামে কিন্তু মওলানা ভাসানী দরিদ্র কৃষকসমাজকে লীগের মধ্যে টেনে এনে সেই সংগঠনকে একটা গণভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছিলেন, আর নিজেও হয়েছিলেন সেই দরিদ্র কৃষককুলের সুখ-দুঃখের অন্তত কিছু পরিমাণ অংশীদার। তাঁর নামের শেষে যে 'ভাসানী' শব্দটি যুক্ত, সেটি তো দরিদ্র মুসলিম কৃষকদের জন্য তাঁর নেতৃত্বে আসামের ব্রহ্মপুত্র নদের 'ভাসানী'-র চর দখলেরই স্মারকচিহ্ন।

দেশ-বিভাগের পর মওলানা ভাসানী আসাম ত্যাগ করে পূর্ববাঙলায় চলে আসেন। কিন্তু সে-সময় আকরাম খাঁ-নাজিমুদ্দিন পরিচালিত লীগের মধ্যে উপদলীয় চক্রান্তে তাঁর মতো মানুষের

কোনো স্থান হয় না। আর 'আজাদী' লাভের পর মুসলিম লীগের অপশাসনে পূর্ববাঙলার সাধারণ মানুষ যেভাবে শোষিত হচ্ছিলেন মওলানা ভাসানীর পক্ষে তাও মুখ বুজে সহ্য করা সম্ভব ছিল না। মওলানা ভাসানী বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বগত তাৎপর্যটি কোনোদিন হয়তো উপলব্ধি করতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর মনে তথাকথিত 'ইসলামী সমাজতন্ত্র' নামক একটি মানবকল্যাণমূলক ধ্যানধারণা সম্ভবত ক্রিয়াশীল ছিল। ফলে, মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যে-উপদলটি বিভাগোত্তর কালেও আবুল হাশেমী এবং সুহ্‌রাবর্দির নেতৃত্বে 'ইসলামী সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার জন্য কর্মতৎপর ছিল মওলানা ভাসানী শেষপর্যন্ত সেই উপদলের সঙ্গেই হাত-মেলাতে বাধ্য হলেন।

আসাম প্রদেশে যিনি ছিলেন মুসলিম লীগের দ্বিজাতি-তত্ত্বের প্রবক্তা, যাঁর নেতৃত্বে অনেক সময় হিন্দুদের বিরুদ্ধেও আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে, পূর্ববাঙলার রাজনীতির ক্ষেত্রে সেই মওলানা ভাসানী কিন্তু প্রথম থেকেই হয়ে উঠলেন অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রধানতম স্তম্ভ। আমার ধারণা, ভাসানী সাহেবের মনে দরিদ্র-নিপীড়িত মানুষের জন্য যে-দরদ ছিল, দেশ-বিভাগের পূর্বে তিনি যে-হিন্দু জমিদার-জোতদারদের দেখতেন দরিদ্র কৃষকসমাজের প্রধান প্রতিপক্ষ রূপে, বিভাগোত্তর কালে সেই হিন্দু জমিদার-জোতদারদের ক্রম-ক্ষীয়মাণ প্রভাব-প্রতিপত্তি লক্ষ্য করে তাঁর রাজনৈতিক রণ-কৌশল স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়। মওলানা ভাসানীর এই পরিবর্তিত রূপ তাঁর অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাঁকে অত্যাল্প-কালের মধ্যেই পূর্ববাঙলার মুসলিম লীগ-বিরোধী জনগণের নেতৃত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যান্য সহযাত্রীদের প্রতিও তাঁর মনকে করে তোলে সহনশীল।

অবিভক্ত বাঙলায় শেখ মুজিবর রহমান ছিলেন ছাত্র-আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় কর্মী। চল্লিশের দশকে মুসলিম লীগের বাড়-বাড়ন্তের আমলে মুসলিম ছাত্রলীগও মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব

বিস্তার করে। যতদূর মনে পড়ে, এই সময় মুসলিম ছাত্রলীগের নেতৃত্ব করতেন শাহ্ আজিজুর রহমান এবং আনোয়ার নামে দুই জন ছাত্রনেতা। মুসলিম লীগের তৎকালীন সভাপতি ছিলেন জনাব আকরাম খাঁ এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন জনাব আবুল হাশেমী। জনাব আকরাম খাঁ ও নাজিমুদ্দিন সাহেবের নেতৃত্বে যেমন একটি উপদলীয় চক্র ছিল মুসলিম লীগের মধ্যে, তেমনি আর একটি উপদলীয় চক্র গড়ে উঠেছিল জনাব আবুল হাশেমী ও সুহ্‌রাবর্দিকে কেন্দ্র করে। ঠিক অনুরূপভাবে মুসলিম ছাত্রলীগের মধ্যেও দুইটি উপদলীয় চক্র সক্রিয় ছিল। আমরা সেই সময় মুসলিম লীগ-নেতৃত্বের মধ্যে জনাব আবুল হাশেমীকে প্রগতিশীল বলে মনে করতাম এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন মুসলিম ছাত্রলীগের উপদলটির সঙ্গে যথাসম্ভব সদ্ভাবও বজায় রেখে চলতাম। যেহেতু ছাত্রনেতা আনোয়ার ছিলেন জনাব আবুল হাশেমীর অনুগামী, সেইহেতু তাঁর সঙ্গেই আমাদের মাখামাখিটা একটু বেশি ছিল।

কিন্তু শেখ মুজিবর রহমান ছিলেন একান্তভাবেই জনাব সুহ্‌রাবর্দির অনুগামী এবং প্রিয়সহচর। বলা যায়, ছাত্রনেতা মুজিবর রহমান জনাব সুহ্‌রাবর্দিরই হাতে-গড়া রাজনৈতিক মানুষ। দেশ-বিভাগের পর ঢাকার ১৫০নং মোগলটুলিকে কেন্দ্র করে জনাব আবুল হাশেমী ও সুহ্‌রাবর্দির অনুগামী উপদলটি মুসলিম লীগের মধ্যে মূলত সুহ্‌রাবর্দির লুপ্তপ্রায় সাংগঠনিক প্রভাব-প্রতিপত্তিকে ফিরিয়ে আনার জন্যই সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। এই উপদলের অধিকাংশই ছাত্র ও যুব-আন্দোলনের কর্মী হওয়ার ফলে সমগ্র পূর্ববাঙলায় অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে প্রথম দিকে এঁদের ব্যাপক-বিস্তৃত তেমন কোনো গণ-ভিত্তিও ছিল না। তবু সরকারী মুসলিম ছাত্রলীগের নেতাদের তুলনায় এঁরা যেহেতু ছিলেন অনেক বেশি দৃঢ় মনোভাব সম্পন্ন এবং মুসলিম লীগের অপকীর্তিগুলির বিরুদ্ধে মুখর, আর তুলনামূলকভাবে গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষ,

সেইহেতু এই উপদলের তরুণ কর্মীরা ছাত্র ও যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে অতিক্রুত বেশ কিছুটা প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হন। শেখ মুজিবর রহমান এই পর্বে তাঁর নির্ভীক মনোভাবের জন্য তাই তরুণ যুবনেতা রূপে স্বীকৃতি পেতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ছাত্র রাজনীতির গণ্ডীর মধ্যে তিনি আর দীর্ঘকাল আবদ্ধ রইলেন না। আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলো। শেখ মুজিবর রহমানও প্রবেশ করলেন প্রাদেশিক রাজনীতির প্রশস্ততম প্রাঙ্গণে। তারপর নিজস্ব কর্মতৎপরতা, নিষ্ঠা আর গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি জয় করে নিলেন পূর্ববাঙলার মানুষের মন। লীগ-বিরোধী আন্দোলনে তাঁকে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, অতিক্রম করতে হয়েছে রাজনৈতিক জীবনের সঙ্কট-সঙ্কুল অজস্র চড়াই উৎরাই। এইভাবেই এককালের তরুণ যুবনেতা ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে উঠে দাঁড়ালেন ভালোবাসার শীর্ষ-চূড়ায়, হলেন সাড়ে সাত কোটি বাঙালির প্রিয়তম 'বঙ্গবন্ধু'।

আমি পূর্বেই বলেছি, ১৯৫০ থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে মওলানা ভাসানী এবং শেখ মুজিবর রহমানকে বেশ কয়েকবার কারাগারে বন্দী-জীবন কাটাতে হয়। আমরাও এই সময় কারাগারে বন্দী ছিলাম। রাজনৈতিক মতপার্থক্য সত্ত্বেও এই দুই নেতা বিনা-বিচারে আটক সমস্ত রাজবন্দীর প্রতি ছিলেন সহানুভূতিশীল। তাঁদের মনোভাবের কিঞ্চিৎ পরিচয় এবার তুলে ধরছি।

সালটা ঠিক আমার মনে নেই। সম্ভবত ১৯৫২ কিংবা ১৯৫৩ সালের কোনো এক সময় শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেপ্তার করে আটক রাখা হয় ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে। ভাষা-আন্দোলনের পর সে-সময় রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী বাইরে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। আমরা বাইরের এই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার জন্য রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীসহ অন্যান্য কতকগুলি সাধারণ গণতান্ত্রিক দাবী নিয়ে অনশন ধর্মঘট করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। শেখ সাহেবও সেদিন এই দাবীগুলির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানান।

আর, ভাসানী সাহেব যখন ১৯৫৩ সালে কারাগারে বন্দী তখন ঐ একই ধরনের দাবীতে তিনি আমাদের সঙ্গে অনশন ধর্মঘটে শামিল হয়েছিলেন। তাঁরই পরামর্শ মতো আমরা ৩৫ দিন ব্যাপী এক নতুন ধরনের অনশন ধর্মঘট পালন করি। এ-ধর্মঘট ছিল ঠিক রোজার মতো। আমরা দিনের বেলায় কোনো আহার্য গ্রহণ করতাম না। প্রতিদিন জেল-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একবেলা র রেশন নিতাম এবং সেই রেশনটুকু দিয়ে তৈরী আহার্য আমরা রাত্রি বেলায় গ্রহণ করতাম। এতে ফল হয়েছিল। বাইরের বন্দী-মুক্তি আন্দোলনে অগ্রগতি ঘটেছিল এবং সেই চাপে অন্তত ভাসানী সাহেব মুক্তিলাভ করে আমাদের মুক্তির জন্য জনগণকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। এ-ছাড়া ছোট-খাটো কয়েকটি দাবীও স্বীকার করে নিয়েছিলেন জেল-কর্তৃপক্ষ। মোটকথা, আওয়ামী মুসলিম লীগের এই দুই নেতা জেলের মধ্যে আমাদের সঙ্গে যেমন ভালো সম্পর্ক রক্ষা করেছেন তেমনি তাঁদের মুক্ত-জীবনে কারারুদ্ধ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতেও চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেন নি। রাজনৈতিক মতপার্থক্য সত্ত্বেও ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার প্রশ্নে এই দুই নেতা ছিলেন আমাদের সহযোদ্ধা।

যাহোক, আওয়ামী মুসলিম লীগের তিন প্রধান নেতা—জনাব সুহ্‌রাবর্দি, মওলানা ভাসানী এবং শেখ মুজিবর রহমানের রাজনৈতিক চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও এই তিন-প্রধানকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে মুসলিম লীগ-বিরোধী আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রাক-নির্বাচনী কর্মব্যস্ততা।

অন্যদিকে শের-ই-বাঙলা জনাব ফজলুল হকও তাঁর বিভাগোত্তর কালের রাজনৈতিক জড়তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বৃদ্ধ বয়সে আর একবার মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। অবিভক্ত বাঙলায় জনাব ফজলুল হক-এর চেয়ে জনপ্রিয় নেতা মুসলিম সমাজে

বোধ হয় আর কেউ ছিলেন না। সাধারণ মুসলমান, বিশেষ করে গ্রামের মুসলিম জনগণ জনাব ফজলুল হক-কে যে কত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, আমার শৈশব-কৈশোরে তা আমি বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর জনাব হক সাহেবের নেতৃত্বে বাঙলাদেশে যে-মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এবং পরবর্তী কালে গঠিত 'শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা'-র আমলে হক সাহেব বাঙলার ঋণ-জর্জর কৃষকসমাজের কল্যাণের জন্য যে-ঋণসালিশী বোর্ড গঠন করেন, আমি নিজের চোখে দেখেছি বাঙলার দরিদ্র কৃষকসমাজ, বিশেষভাবে মুসলিম কৃষকসমাজ তার দ্বারা কী বিপুল পরিমাণে উপকৃত হয়েছেন। জনাব হক-ই প্রকৃতপক্ষে বাঙলার মুসলিম সমাজকে আর্থনীতিক ও রাজনীতিক অধঃপতনের হাত থেকে টেনে তুলতে সর্বপ্রথম এক বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেন। মুসলিম সমাজের সর্বস্তরে তাই তাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল তর্কাতীত। মুসলিম লীগের শাসনকালে এবং দেশ-বিভাগের পর জনাব ফজলুল হক রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না থাকলেও এবং কিছুটা হতাশ হয়ে সাময়িকভাবে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ না করলেও পূর্ববাঙলার সাধারণ মুসলিম জনগণের কাছে তিনি তখনও ছিলেন সর্বাধিক জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব এবং স্বীকৃত নেতা।

এই আবেগপ্রবণ, খাঁটি বাঙালি, বর্ষীয়ান রাজনৈতিক নেতা ১৯৫৪ সালে পূর্ববাঙলার প্রথম সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে বিভক্ত বাঙলার তাঁর সেই পুরনো রাজনৈতিক সংগঠন 'কৃষক-প্রজা পার্টি'-কে ঢেলে সাজালেন। ১৯৫৩ সালের ২৬এ জুলাই ঢাকায় তাঁরই নেতৃত্বে গঠিত হলো 'কৃষক-শ্রমিক পার্টি' নামে নতুন রাজনৈতিক সংগঠন। জনাব হক-এর 'কৃষক-প্রজা পার্টি'-র পুরনো সহকর্মীরা—জনাব আবু হোসেন সরকার, আজিজুল হক, আবদুল হাকিম প্রমুখ অবিভক্ত বাঙলার জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতারা নব গঠিত 'কৃষক-শ্রমিক পার্টি'-তেই যোগদান করলেন। নবজাগ্রত পূর্ববাঙলার রাজনৈতিক তূণীরে সংযোজিত হলো একটি শক্তিশালী মৃত্যুবাণ।

ভাষা-আন্দোলনের পর, ১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাসে তরুণ নেতা মাহমুদ আলির নেতৃত্বে গঠিত 'গণতান্ত্রিক দল'-এর কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এই দলের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক নীতি ও কর্মসূচীর মধ্যে সেদিন মূর্ত হয়ে উঠেছিল পূর্ববাঙলার সবচেয়ে প্রগতিশীল মতাদর্শ। ফলে, মুসলিম লীগের রাজনীতি সম্পর্কে মোহমুক্ত তরুণ কর্মী এবং বামপন্থী চিন্তা-ভাবনার শরিকসহ কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীর একাংশ এই দলকে কেন্দ্র করে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। সেদিন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে 'গণতান্ত্রিক দল' সত্যিই পালন করেছিলেন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।*

এই সময় ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জের মওলানা হাফিজ আতাহার আলির নেতৃত্বে 'নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি' নামে একটি দলও মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বেশ সক্রিয় হয়ে ওঠে। মোল্লা-মৌলবীদের এক বিরাট অংশ ছিলেন এই দলের সক্রিয় কর্মী ও সমর্থক। এককালে মুসলিম লীগকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার পিছনে এঁদেরও দান ছিল যথেষ্ট। কিন্তু নির্বাচনের প্রাক্কালে দেখা গেল, গোঁড়া ধর্মীয় সংগঠন 'নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি' ইসলামের পবিত্রতা রক্ষার জন্য মুসলিম-লীগ-বিরোধী জিগির তুলতে শুরু করেছে। এই দলে কিছু উচ্চ-শিক্ষিত মুসলিম তরুণও যোগ দেন। তাঁদের মধ্যে চট্টগ্রামের ফরিদ আহমদ-এর** নাম সুবক্তা ও দক্ষ সংগঠক হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। আর সব থেকে আশ্চর্যের কথা অবিভক্ত বাঙলায় যিনি ছিলেন মনে-প্রাণে অসাম্প্রদায়িক ও সর্বজনপরিচিত কংগ্রেস-নেতা, সুভাষচন্দ্র পরিচালিত বাঙলার প্রাদেশিক কংগ্রেসের সাধারণ

---

* 'গণতান্ত্রিক দল' এখন পাকিস্তান ডেমোক্রাটিক পার্টিতে রূপান্তরিত। এই দলের নেতা কুখ্যাত নুরুল আমিন এবং মাহমুদ আলি—উভয়েই প্রতিক্রিয়াশীল ভুট্টোর সহযোগী।—লেখক

** ফরিদ আহমদ চট্টগ্রামে রাজাকার ও আল-বদর বাহিনী সংগঠিত করে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করেছে। এই ধর্মান্ধ বিশ্বাসঘাতককে বাঙলাদেশ সরকার সম্প্রতি গ্রেপ্তার করেছেন বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। —লেখক

সম্পাদক, কুমিল্লার সেই বর্ষীয়ান জননেতা জনাব আশ্রাফউদ্দিন চৌধুরীও যোগ দিলেন এই 'নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি'তে। এইভাবে মুসলিম লীগের কাছে এই দলটিও যথেষ্ট আতঙ্কের কারণ হয়ে ওঠে। নির্বাচনের পূর্বে পরিষ্কার বুঝা গেল, পূর্ববাঙলার মুসলিম জনতার উপর মুসলিম লীগের একচেটিয়া আধিপত্যের দিন এবার শেষ। আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, গণতন্ত্রী দল আর নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি যদি যুক্ত মোর্চা গড়তে পারে তবে মুসলিম লীগকে নির্বাচনে পর্যুদস্ত করা খুব একটা কঠিন কাজ হবে না।

নির্বাচনের সময় মুসলিম ভোটাররা উপযুক্ত দলগুলির যে-কোনো একটিকে বেছে নেবে, এটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার ছিল। পূর্ববাঙলায় তখনও যুক্ত-নির্বাচন প্রথা চালু হয় নি। সুতরাং অমুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য যে পৃথক নির্বাচন-প্রথা চালু ছিল এই নির্বাচনের প্রাক্কালে মুসলিম লীগ-সরকার কৌশলে তাদের বিভেদ-নীতি প্রয়োগ করে তাকে আরও ঘুলিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন। মুসলিম লীগ-সরকার বর্ণহিন্দু, তফশিলী হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীস্টান— এই চার ভাগে অমুসলমান নির্বাচকমণ্ডলীকে বিভক্ত করে দিলেন। এই পরিস্থিতিতে মূলত অমুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান— পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে নির্বাচনী কৌশল নিয়ে প্রচণ্ড মতপার্থক্য দেখা দেয়। ফলে, পূর্ববাঙলার জাতীয় কংগ্রেস দ্বি-ধা বিভক্ত হয়ে যায়। মূল কংগ্রেসে রইলেন প্রবীণ নেতা সর্বশ্রী বসন্তকুমার দাশ, সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত (বগুড়া), বিপ্লবী নেতা ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, মনোরঞ্জন ধর (ইনি পূর্ববাঙলায় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন), শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা এবং এদের সঙ্গে যোগ দিলেন যশোহরের প্রবীণ কংগ্রেস-নেতা শ্রীবিজয়চন্দ্র রায় এবং খুলনার কংগ্রেস-নেতা শ্রীক্ষেত্রনাথ মিত্র প্রমুখ আরও কিছু কংগ্রেস-সেবী। কংগ্রেস থেকে যাঁরা ভেঙ্গে বেরিয়ে এলেন তাঁরা গঠন করলেন নতুন দল—'সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট'। এই দলের সঙ্গে যুক্ত

ছিলেন কুমিল্লার প্রবীণ কংগ্রেস-নেতা শ্রীকামিনীকুমার দত্ত, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নোয়াখালির প্রসিদ্ধ নেতা এবং মহাত্মা গান্ধীর নোয়াখালি-পরিক্রমার সঙ্গী শ্রীহারানচন্দ্র ঘোষচৌধুরী, রাজশাহীর প্রবীণ নেতা শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী প্রমুখ আরও অনেকে। এই 'সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট' দলে শ্রদ্ধেয় বিপ্লবীনেতা শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ), মাদারীপুরের নেতা শ্রীফণী মজুমদার, চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতা শ্রীপুলিন দে প্রমুখও পরবর্তীকালে যোগ দিয়েছিলেন বলে জানি। মোটকথা, পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস প্রধানত বর্ণহিন্দুদের মধ্যে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে সংকুচিত করে আনলেন আর সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট-এর কংগ্রেসী নেতারা একটু নমনীয় কৌশল অবলম্বন করে 'তফশিলী ফেডারেশন'-এর নেতা শ্রীরসরাজ মণ্ডল-এর সঙ্গেও একটা নির্বাচনী সমঝোতায় পৌঁছালেন। এমনিতর নানা ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়ে ১৯৫৪ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের রণ-দামামা বেজ উঠলো।

এই সময় গোপন কমিউনিস্ট পার্টি নির্বাচনকে সামনে রেখে পূর্ববাঙলার গণতান্ত্রিক চেতনাকে সুসংহত করার জন্য তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে। কমিউনিস্ট পার্টির অধিকাংশ নেতা ও কর্মী কারাগারে বন্দী থাকা সত্ত্বেও এবং বিভিন্ন জেলায় পার্টির প্রকাশ্য কাজকর্ম দমননীতির দাপটে স্তব্ধ থাকলেও ভাষা-আন্দোলনের পরে গড়ে ওঠা ছাত্র ইউনিয়ন, গণতান্ত্রিক দল এবং পূর্বে গঠিত যুবলীগ-এর মাধ্যমে তারা পূর্ববাঙলার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দাবীর পাশাপাশি ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও রাজবন্দীদের মুক্তির প্রশ্নটিকে একটি প্রধান দাবী হিসেবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়। ১৯৫২ সালে গঠিত 'পূর্ববাঙলা ব্যক্তি-স্বাধীনতা লীগ'ও (East Bengal Civil Liberties League) যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই সংগঠনের সম্পাদক ছিলেন এ্যাডভোকেট মির্জা গোলাম হাফিজ সাহেব।

দ্বিতীয়ত, পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট পার্টির কাছে এ-কথা খুবই

স্পষ্ট ছিল যে, দমননীতিতে পর্যুদস্ত পার্টির একক শক্তির পক্ষে আসন্ন নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি এই নির্বাচনে যদি মুসলিম লীগ-বিরোধী অন্যান্য পার্টিগুলির যুক্তফ্রন্ট গঠিত না হয় তবে যে-বিপুল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তাও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যেতে পরে। তাই প্রথম দিকে যখন আওয়ামী মুসলিম লীগ ও কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতাদের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট গঠন নিয়ে প্রচণ্ড মতপার্থক্য দেখা দিল তখন কমিউনিস্ট পার্টি ছাত্র ও যুব আন্দোলনে তার অনুগামীদের দিয়ে এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তাদের সহযাত্রীদের ঐক্যবদ্ধ করে যুক্তফ্রন্ট গঠনের জন্য এক সক্রিয় রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করেছিল। আরও সঠিকভাবে বলা যায়, ছাত্র-যুবদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বই ভাষা-আন্দোলনের পর পূর্ব-বাঙলার রাজনীতির নিয়ামক শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। এই নবজাগ্রত ছাত্র ও যুবশক্তিই প্রকৃতপক্ষে বর্ষীয়ান নেতাদের সকল কলহ-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে মুসলিম লীগ-বিরোধী ঐক্যবদ্ধ ফ্রণ্টে তাঁদের শামিল হতে বাধ্য করে। তাই নির্বাচনের পূর্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, গণতন্ত্রী দল ও নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি—এই চারটি দলকে নিয়ে গঠিত হয় মুসলিম লীগ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্ট। পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি নিজস্ব নির্বাচনী কর্মসূচীর ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করলেও এবং এই যুক্তফ্রণ্টের শরিক হয়েও যুক্তফ্রণ্ট-ঘোষিত ২১ দফা কর্মসূচীকে সমর্থন করেছিল।

আমরা জেলখানায় বসে নির্বাচনের প্রাক-মুহূর্তে এই রাজনৈতিক ভাঙা-গড়ার খেলা বেশ অধীরভাবেই লক্ষ্য করছিলাম। কারণ, আসন্ন নির্বাচনী জয়-পরাজয়ের সঙ্গে আমাদের ভাগ্যও ছিল বাঁধা। ভাষা-আন্দোলনের পর রাজবন্দীদের মুক্তির দাবী ধ্বনিত হলেও এই নির্বাচনের প্রাক্কালে তা সত্যিই সোচ্চার হয়ে ওঠে। বহু মিছিলও এই সময় কারা-প্রাচীরের পাশ ঘেঁষে পরিচালিত হয়েছে, সম্ভবত রাজবন্দীদের কানে মুক্তির ধ্বনি-তরঙ্গ পৌঁছে দেবার জন্য। দুই-

একজন করে রাজবন্দীও এই সময় থেকে মুক্তি পেতে শুরু করেন।

এই পরিস্থিতিতে ঢাকা জেলে এলেন কমরেড ইলা মিত্র। গুরুতর অসুস্থ। প্রায় মুমূর্ষু তাঁর অবস্থা। সুতরাং এলেন না বলে বলা উচিত—রাজশাহী জেল থেকে তাঁকে বাধ্য হয়ে নিয়ে আসা হলো ঢাকা জেলে, চিকিৎসার জন্য। তখন তিনি প্রায় মৃত্যু-পথযাত্রী।

কমরেড ইলা মিত্রকে ১৯৫০ সালের ৭ই জানুয়ারী গ্রেপ্তার করা হয়। নাচোল-কৃষক-বিদ্রোহের নেত্রী হিসেবে লীগ-সরকারের পুলিশ ও গুপ্তচর বিভাগ যখন ইলা মিত্রকে ধরার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বর্বরতম অত্যাচারে তছনছ করছে নাচোল ও নবাবগঞ্জ থানার সাঁওতাল কৃষক-পরিবারের ঘরবাড়ি, অসংখ্য সাঁওতাল কৃষককে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠাচ্ছে, পুলিশী সন্ত্রাসের বেড়াজালে যখন ঐ দুটি থানা প্রায়-মৃত্যুর প্রহর গুণছে প্রতিটি দিন, তখন আত্মগোপন-কারী নেত্রী কমরেড ইলা মিত্র সাঁওতাল রমণীর ছদ্মবেশে বৃন্দাবন সাহা নামে একজন অতি বিশ্বস্ত কৃষক কর্মীর সহযোগিতায় অন্য নিরাপদ স্থানে পাড়ি জমাবার কালে রোহনপুর স্টেশনে সন্দেহক্রমে ধরা পড়েন। তারপর লীগশাহীর পুলিশ যখন তাঁর ও কমরেড বৃন্দাবন সাহার আসল পরিচয় জানতে পারে তখন তাঁদের উপর নেমে আসে যে-বীভৎস আর নৃশংসতম অত্যাচার, পৃথিবীর সকল দেশের সকল অত্যাচারীর ইতিহাস সেই বর্বরতায় শিউরে উঠে ঘৃণায় মুখ লুকাবে বলে আমার বিশ্বাস।

অথচ, কি অপরাধ করেছিলেন কমরেড ইলা মিত্র? এই প্রসঙ্গে আমি পূর্ববাঙলার লীগ-রাজত্বের সেই অন্ধকারময় যুগে কমিউনিস্ট পার্টির এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে আজ স্মরণ করতে চাই। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, দেশ-বিভাগের পর মুসলিম লীগ-বিরোধী কোনো রাজনৈতিক সংগঠন যখন গড়ে ওঠে নি, পূর্ববাঙলার কংগ্রেস-সংগঠনও যখন গণ-সংযোগ হারিয়ে মৃতপ্রায় এবং শুধুমাত্র আইনসভার চৌহদ্দির মধ্যে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার নিয়মমাফিক

আনুষ্ঠানিক তর্ক-বিতর্কের মধ্যে তাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে সীমিত করে ফেলেছেন, তখন একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিই অসীম সাহসে লীগশাহীর বন্দুক-বেয়োনেট, গ্রেপ্তার-কারাগার অগ্রাহ্য করে পূর্ববাঙলার সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে তাদের বাঁচার লড়াই তথা গণ-আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। তে-ভাগার দাবীতে নাচোলের কৃষক-আন্দোলন তারই একটি বিশেষ প্রকাশ মাত্র।

আমি কয়েকদিন আগে আইনসভার তৎকালীন কংগ্রেস-সদস্য ও এককালের প্রখ্যাত বিপ্লবীনেতা শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী-র স্মৃতিকথা 'পাক-ভারতের রূপরেখা' গ্রন্থখানি পাঠ করেছি। সেই গ্রন্থে শ্রীযুক্ত লাহিড়ী দেশ-বিভাগের পর কংগ্রেস-সংগঠনের রাজনৈতিক কার্যকলাপের পর্যালোচনা কালে আত্মসমালোচনার ভঙ্গীতে আমার উপর্যুক্ত চেতনাকে প্রতিধ্বনিত করেছেন দেখে সত্যিই আমি খুশি হয়েছি। শ্রীযুক্ত লাহিড়ী লিখেছেন :

"দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে পূর্ববঙ্গে যদিও খাতাপত্রে এবং কাগজে-কলমে 'পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস' নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল। তার পক্ষে আর কোনও সংগ্রামী আন্দোলন করা সম্ভবপর ছিল না। কোনও হিন্দু পরিচালিত রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই সম্ভবপর ছিল না ; সেরূপ আন্দোলন করলে ব্যাপক আকারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হওয়ার বিশেষ আশঙ্কা পূর্ববঙ্গের সর্বত্রই তখনও ছিল ; কারণ, তখন পর্যন্ত মুসলমান রাজনীতিকদের মধ্যে কোনও বিরোধী দল গড়ে ওঠে নি। তখন পর্যন্ত সকলেই একটিমাত্র রাজনীতিক দল—'মুসলিম লীগের' সদস্য ; আর সেই মুসলিম লীগ অনবরত জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে চলেছে যে, 'হিন্দুস্থান সরকার' (ভারত সরকারকে মুসলিম লীগ 'হিন্দুস্থান সরকার' বলেই প্রচার করে—তখনও করেছে, আজও সমানভাবেই করে চলেছে) ও হিন্দুরা (পূর্ববঙ্গের

হিন্দুরাও) পাকিস্তানকে ধ্বংস করার চক্রান্ত করছে। 'পাকিস্তান' নামটির উপরে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে তখন তো একটা অত্যন্ত প্রীতি ও ভালবাসা ছিলই, যার রেশ আজও চলছে, সেই অবস্থায় কোন হিন্দু পরিচালিত রাজনীতিক দল যদি কোনও সংগ্রামী আন্দোলন করতো, তার ফল যে কী বিষময় হতে পারতো তা সকলেই বুঝতেন। পাকিস্তান কংগ্রেসের পক্ষে তা আরও সম্ভবপর ছিল না; কারণ, ভারতে শাসন-ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান। পাকিস্তানে যদিও প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয়েছিল—'পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস' বলে, তবু মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করা হয়েছে যে ভারতের কংগ্রেস ও পাকিস্তানের কংগ্রেস একই মুদ্রার এপিঠ, আর ওপিঠ মাত্র। একই উদ্দেশ্য নিয়েই চলে। কোনও রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান যদি জনসাধারণের সত্যিকারের অভাব-অভিযোগ নিয়ে আন্দোলনে না-নামে, তাহলে শুধু ভাল ভাল কথার মালা গেঁথে বক্তৃতা করে চিরকাল জনসাধারণের উপর প্রভাব বজায় রাখতে পারে না। সেই অবস্থায় ক্রমশ সেই সব প্রতিষ্ঠান গণ-সংযোগ হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়। পাকিস্তানে, তথা পূর্ববঙ্গে আমরা কংগ্রেসীরা জনসাধারণের মধ্যে কোনও আন্দোলন গড়ে তুলে তাদের সাথে সংযোগ রাখতে পারি নি। আমরা গণ-সংযোগ যেটুকু রাখতেম, তা হল জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার কথা 'এসেম্বলি'তে তুলে ধরে। এছাড়া আমাদের আর সুষ্ঠু কোন পথ ছিল না। আমরা যখন সাক্ষাৎভাবে সংগ্রামী কোনও আন্দোলন না করে, জনগণ থেকে কিছুটা দূরে সরে পড়ছিলেম, তখন 'কম্যুনিষ্ট পার্টি' কিন্তু দূরে সরে থাকেন নি। তাঁরা এগিয়ে গিয়েছেন, তে-ভাগা আন্দোলনের নেতৃত্ব নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে।"

[পাক-ভারতের রূপরেখা : প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী, পৃঃ ১৭১-৭২]

কমরেড ইলা মিত্র ও তাঁর স্বামী কমরেড রমেন মিত্র নাচোলে

কমিউনিস্ট পার্টি-পরিচালিত এই তে-ভাগা আন্দোলনের নেতৃত্বেই সমাসীন ছিলেন। রাজনীতির ছাত্র মাত্রই বোধহয় জানেন যে, অবিভক্ত বাঙলায় ১৯৪৬-৪৭ সালে কমিউনিস্ট পার্টির গণসংগঠন 'কৃষকসভা'-র নেতৃত্বে জমিদার-জোতদারের অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে সমগ্র বাঙলদেশব্যাপী পরিচালিত হয় বঞ্চিত ভাগচাষী ও ক্ষেত-মজুরদের এক বিরাট গণসংগ্রাম। কৃষকসভার নেতৃত্বে উত্তর বঙ্গের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে—বিশেষ করে দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী আর মালদহ জেলায় এই আন্দোলন দুর্বার জঙ্গী গণ-সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়। দিনাজপুরের ভাগচাষী রাজবংশী সম্প্রদায় এবং রাজশাহী-মালদহের সাঁওতাল ভাগচাষীরা এই তে-ভাগা আন্দোলনে যেন তাঁদের সর্বস্ব পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সশস্ত্র পুলিশ-মিলিটারীর বন্দুক-বেয়োনেটের বিরুদ্ধে সংগ্রামী কৃষকজনতা লাঠি-বল্লম, তীর-ধনুক নিয়ে প্রতিরোধ-সংগ্রাম চালিয়ে যান। আর, এই অসম যুদ্ধে সমীরুদ্দিন, জিতু সাঁওতাল প্রমুখ বীর কৃষক-সন্তানেরা প্রাণ বিসর্জন দিয়ে তাঁদের সহযাত্রী-সহকর্মীদের জন্য রেখে যান এক নতুন সংগ্রামী ঐতিহ্য।

দেশ-বিভাগের আগে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানাটি ছিল সাঁওতাল-অধ্যুষিত। গোদাগাড়ী থানার সাঁওতাল কৃষকেরাও ছিলেন সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারক। দেশ-বিভাগের সময় এই থানা-সংলগ্ন মালদহ জেলার দুইটি সাঁওতাল-অধ্যুষিত থানা—নাচোল ও নবাবগঞ্জ যুক্ত হয় রাজশাহী জেলার সঙ্গে। ইংরেজ-আমলে নাচোল ও নবাবগঞ্জ থানার বিদ্রোহের ঐতিহ্যবাহী সাঁওতাল-কৃষক এবং গোদাগাড়ী থানার সাঁওতাল কৃষক একই তে-ভাগা সংগ্রামে মিলিত হয়ে দেশ-বিভাগের পর ঐ অঞ্চলে গড়ে তোলেন এক শক্তিশালী সংগ্রামের ঘাঁটি। রাজশাহী জেলার কমিউনিস্ট নেতা কমরেড রমেন মিত্র, অনিমেষ লাহিড়ী ও আজহার হোসেন লীগ-সরকারের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এড়িয়ে ১৯৪৯ সালে বিভাগোত্তর কালের তে-ভাগা সংগ্রামে ঐ অঞ্চলে নেতৃত্ব দিতে থাকেন। কমরেড ইলা মিত্র প্রথমে তাঁর স্বামীর

সহযোগীরূপে ঐ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। ক্রমান্বয়ে ত্যাগ ও বৈপ্লবিক কর্মনিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনিও পরিণত হন সংগ্রামী সাঁওতাল কৃষকদের 'রাণী মা'-তে।

এই সময়, ১৯৪৯ সালের শেষ দিকে, নাচোল ও নবাবগঞ্জ থানায় তে-ভাগা আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করলে নাচোল থানার জমিদার রায়বাহাদুর ধরণীমোহন মৈত্র আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। রায়-বাহাদুর মৈত্র ইংরেজ আমলে যেমন ছিলেন ব্রিটিশ শাসকদের খয়ের খাঁ ক্রীড়নক, লীগ-শাসনেও তেমনি তৎকালীন জেলা-শাসক মজিদ সাহেবের প্রসাদপুষ্ট অনুগৃহীত ব্যক্তিরূপেও তিনি ছিলেন কুখ্যাত। আতঙ্কিত জমিদার ধরণীমোহন মৈত্র নাচোল থানার সংগ্রামী কৃষকদের শায়েস্তা করার জন্য জেলা শাসক মজিদ-এর সাহায্য প্রার্থনা করেন। শুনেছি, জেলা-শাসক মজিদ ছিলেন লীগ-সরকারেব অতি বিশ্বস্ত কর্ম-চারীদের অন্যতম এবং এক অত্যাচারী 'সিভিলিয়ান' বাজপুরুষ। আর, এর সঙ্গে সোনায়-সোহাগার মতো যুক্ত হয়েছিল পুলিশের বড়কর্তা, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খাজা সাহাবুদ্দিনের জামাতা-বাবাজীর সন্ত্রাস। রায়বাহাদুর মৈত্র মহাশয়ের প্রার্থনা মঞ্জুর হতে তাই দেরী হয় নি। জেলা-শাসকের নির্দেশে নাচোল থানায় প্রেরিত হয় টহলদারী সশস্ত্র পুলিশবাহিনী। তাবপর সমগ্র নাচোল থানা জুড়ে চলে অকথ্য পুলিশী-তাণ্ডব। সাঁওতাল-কৃষকদের বাড়ীঘর লুণ্ঠিত হতে থাকে, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি—হাঁস-মুরগী, পাঁঠা-খাসি থেকে শুরু করে ধান-চাল, নারীত্বের সম্মান সব কিছুই পুলিশের বুটের তলায় আর ভয়ঙ্কর কালো হাতের শাণিত নখে পিষ্ট এবং ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। সংগ্রামী সাঁওতাল-কৃষক অতিষ্ঠ হয়ে শেষপর্যন্ত বাধ্য হন হাতে হাতিয়ার তুলে নিতে। প্রতিরোধ-সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে এমনি এক প্রতিরোধ-সংঘর্ষে একদিন, ১৯৫০ সালের ৫ই জানুয়ারী নিহত হয় চারজন পুলিশ-পুংগব। নিহত পুলিশের মধ্যে তিনজন ছিল মুসলমান ও একজন হিন্দু পুলিশ।

এই ঘটনার পর পুলিশী-তাণ্ডব সব কিছুর সীমা ছাড়িয়ে যায়। লীগ-সরকারের প্রত্যক্ষ নির্দেশে সাঁওতাল-কৃষকদের বিরুদ্ধে যেন যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। গোটা নাচোল অঞ্চলকে নিষিদ্ধ এলাকা ঘোষণা করে চলতে থাকে লীগশাহীর কৃষক-নিধন যজ্ঞ। এই সময় কত সাঁওতাল কৃষককে-যে হত্যা করা হয়েছে, কত নারীর ইজ্জত লুণ্ঠিত হয়েছে, কত ঘর-বাড়ী পুড়েছে, কত সাঁওতালকে-যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং কত কৃষক-পরিবার পালিয়ে বন-জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন, তার সঠিক কোনো হিসেব জানে না কেউ। বর্বর লীগ-সরকার আইন সভাতেও এর কোনো হিসেব পেশ করে নি, আর করবেও না কোনোদিন। শুনেছি, ফাদার ক্যাটানিও নামে আধারকোঠা গ্রামের এক মহানুভব রোমান ক্যাথলিক মিশনারী সাহেব এই বর্বরতম অত্যাচারের বিবরণ সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। সেই বিবরণ নাকি পাঠানো হয়েছিল ঢাকার তৎকালীন ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারের কাছে এবং তিনিও নাকি তার প্রতিলিপি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নেহরু-র বৈদেশিক দপ্তরের হাতে।

যাহোক, এই সন্ত্রাস আর অত্যাচারের মুখে দাঁড়িয়ে সেদিন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে নিঃস্ব ভাগচাষী কৃষক যে-গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন পাক-ভারতের কৃষক-সংগ্রামের ইতিহাসে তা নিশ্চয়ই স্মরণীয় হয়ে থাকবে।*নাচোল-সংগ্রামের নেতা কমরেড রমেন মিত্র এবং ইলা মিত্রকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরার জন্য পুলিশ আর গোয়েন্দা-বিভাগের কর্মচারীরা তখন হন্যে কুকুরের মতো ঘুরে বেড়িয়েছে। কমরেড রমেন মিত্র শেষপর্যন্ত পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এ-পার বাঙলায় চলে অসেন। আর, কমরেড ইলা মিত্র দু-দিন লুকিয়ে থাকার পর নিরাপদ স্থানে যাওয়ার

---

* নাচোলের মতো ময়মনসিংহ জেলার হাজং এলাকায়, পূর্ব বিয়ানিবাজার-সানেশ্বরে, যশোহরের নড়াইল অঞ্চলে এবং খুলনা জেলার ধানিবুনিয়ায় দেশ-বিভাগের পরে ১৯৪৯-৫ সালে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সশস্ত্র কৃষক-সংগ্রাম পরিচালিত হয়।—লেখক

পথে ধরা পড়েন রোহনপুর স্টেশনে।

সুতরাং এ-হেন ইলা মিত্রকে হাতে পেয়ে লীগশাহীর পুলিশ কি করতে পারে তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য নয়। কিন্তু না, পুলিশের অত্যাচার সম্পর্কে আমাদের কল্পনা যতদূর যায়, তার সব কিছু যোজন যোজন পশ্চাতে ফেলে লীগশাহীর পোষা কুত্তারা কমরেড ইলা মিত্র-র উপর চালিয়েছিল মানব-ইতিহাসের বর্বরতম ঘৃণ্যতম এবং কল্পনাতীত এক নারকীয় অত্যাচার। কমরেড ইলা তাঁর উপর অনুষ্ঠিত বর্বর পাশবিকতার যে-ঘৃণ্যতম বিবরণ রাজশাহী-কোর্টে মামলা পরিচালনার সময় পেশ করেছিলেন, আমি এবার সেই ঐতিহাসিক জবানবন্দীটি এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ

"কেসটির ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। বিগত ৭. ১. ৫০ তারিখে আমি রোহনপুরে গ্রেফতার হই এবং পরদিন আমাকে নাচোলে নিয়ে যাওয়া হয়। যাওয়ার পথে পুলিশ আমাকে মারধোর করে এবং তারপর আমাকে একটা সেলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সবকিছু স্বীকার না করলে আমাকে উলঙ্গ করে দেওয়া হবে এই বলে এস. আই. আমাকে হুমকি দেখায়। আমার যেহেতু বলার মতো কিছু ছিল না, কাজেই তারা আমার সমস্ত কাপড়-চোপড় খুলে নেয় এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গভাবে সেলের মধ্যে আমাকে বন্দী করে রাখে।

আমাকে কোনো খাবার দেওয়া হয় নি, একবিন্দু জল পর্যন্ত না। সেদিন সন্ধ্যেবেলাতে এস. আই.-এর উপস্থিতিতে সেপাইরা তাদের বন্দুকের বাঁট দিয়ে আমার মাথায় আঘাত শুরু করে। সে সময়ে আমার নাক দিয়ে প্রচুর রক্ত পড়তে থাকে। এর পর আমার কাপড়-চোপড় আমাকে ফেরত দেওয়া হয় এবং রাত্রি প্রায় বারোটার সময় সেল থেকে আমাকে বের করে সম্ভবতঃ এস. আই-এর কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে এ ব্যাপারে আমি খুব নিশ্চিত ছিলাম না।

যে কামরাটিতে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো সেখানে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তারা নানারকম অমানুষিক পদ্ধতিতে চেষ্টা চালালো। দুটো লাঠির মধ্যে আমার পা দুটি ঢুকিয়ে চাপ দেওয়া হচ্ছিলো এবং সে সময় চারিধারে যারা দাঁড়িয়েছিলো তারা বলছিলো যে আমাকে "পাকিস্থানী ইনজেকশন" দেওয়া হচ্ছে। এই নির্যাতন চলার সময় তারা একটা রুমাল দিয়ে আমার মুখ বেঁধে দিয়েছিলো। জোর করে আমাকে কিছু বলাতে না পেরে তারা আমার চুলও উপড়ে তুলে ফেলছিলো। সিপাইরা আমাকে ধরাধরি করে সেলে ফিরিয়ে নিয়ে গেলো কারণ সেই নির্যাতনের পর আমার পক্ষে আর হাঁটা সম্ভব ছিলো না।

সেলের মধ্যে আবার এস. আই. সেপাইদেরকে চারটে গরম সেদ্ধ ডিম আনার হুকুম দিলো এবং বললো, "এবার সে কথা বলবে।" তারপর চার-পাঁচজন সেপাই আমাকে জোরপূর্বক ধরে চিত করে শুইয়ে রাখলো এবং একজন আমার যৌনঅঙ্গের মধ্যে একটা গরম সিদ্ধ ডিম ঢুকিয়ে দিলো। আমার মনে হচ্ছিলো আমি যেন আগুনে পুড়ে যাচ্ছিলাম। এরপর আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। ৯. ১. ৫০ তারিখে সকালে যখন আমার জ্ঞান হলো তখন উপরোক্ত এস. আই. এবং কয়েকজন সেপাই আমার সেলে এসে তাদের বুটে করে আমার পেটে লাথি মারতে শুরু করলো। এর পর আমার ডান পায়ের গোড়ালীতে একটা পেরেক ফুটিয়ে দেওয়া হলো। সে সময়ে আধা অচেতন অবস্থায় পড়ে থেকে আমি এস. আই-কে বিড়বিড় করে বলতে শুনলাম: আমরা আবার রাত্রিতে আসছি এবং তুমি যদি স্বীকার না করো তাহলে সিপাইরা একে একে তোমাকে ধর্ষণ করবে। গভীর রাত্রিতে এস. আই. এবং সিপাইরা ফিরে এলো এবং তারা আবার সেই হুমকি দিলো। কিন্তু আমি যেহেতু তখনো কিছু বলতে রাজী হলাম না তখন তিন-চার জন আমাকে ধরে রাখলো এবং একজন

সিপাই সত্যি সত্যি আমাকে ধর্ষণ করতে শুরু করলো। এর অল্পক্ষণ পরই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। পরদিন ১০. ১. ৫০ তারিখে যখন আমার জ্ঞান ফিরে এলো তখন আমি দেখলাম যে আমার দেহ থেকে দারুণভাবে রক্ত ঝরছে এবং আমার কাপড়-চোপড় রক্তে সম্পূর্ণভাবে ভিজে গেছে। সেই অবস্থাতেই আমাকে নাচোল থেকে নবাবগঞ্জ নিয়ে যাওয়া হলো। নবাবগঞ্জ জেল গেটের সিপাইরা জোর ঘুঁষি মেরে আমাকে অভ্যর্থনা জানালো। সে সময় আমি একেবারে শয্যাশায়ী অবস্থায় ছিলাম। কাজেই কোর্ট ইন্সপেক্টর এবং কয়েকজন সিপাই আমাকে একটা সেলের মধ্যে বহন করে নিয়ে গেলো। তখনো আমার রক্তপাত হচ্ছিলো এবং খুব বেশী জ্বর ছিলো। সম্ভবতঃ নবাবগঞ্জ সরকারী হাসপাতালের একজন ডাক্তার সেই সময় আমার জ্বর দেখেছিলেন ১০৫ ডিগ্রী। যখন তিনি আমার কাছে আমার দারুণ রক্তপাতের কথা শুনলেন তখন তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন যে একজন মহিলা নার্সের সাহায্যে আমার চিকিৎসা করা হবে। আমাকে কিছু ওষুধ এবং কয়েক টুকরো কম্বলও দেওয়া হলো। ১১. ১. ৫০ তারিখে সরকারী হাসপাতালের নার্স আমাকে পরীক্ষা করলেন। তিনি আমার অবস্থা সম্পর্কে কি রিপোর্ট দিয়েছিলেন সেটা আমি জানি না। তিনি আসার পর আমার পরনে যে রক্তমাখা কাপড় ছিলো সেটা পরিবর্তন করে একটা পরিষ্কার কাপড় দেওয়া হলো। এই পুরো সময়টা আমি নবাবগঞ্জ জেলের একটি সেলে একজন ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিলাম। আমার শরীরে খুব বেশী জ্বর ছিলো, তখনো আমার দারুণ রক্তপাত হচ্ছিলো এবং মাঝে মাঝে আমি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম। ১৬. ১. ৫০ তারিখে সন্ধ্যাবেলায় আমার সেলে একটা স্ট্রেচার নিয়ে আসা হলো এবং আমাকে বলা হলো যে পরীক্ষার জন্য আমাকে অন্য জায়গায় যেতে হবে। খুব বেশী শরীর

খারাপ থাকার জন্যে আমার পক্ষে নড়াচড়া সম্ভব নয় একথা বলায় লাঠি দিয়ে আমাকে একটা বাড়ি মারা হলো এবং স্ট্রেচারে উঠতে আমি বাধ্য হলাম। এর পর আমাকে অন্য এক বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হলো। আমি সেখানে কিছুই বলি নি কিন্তু সেপাইরা জোর করে একটা সাদা কাগজে আমার সই আদায় করলো। তখন আমি আধা-অচেতন অবস্থায় খুব বেশী জ্বরের মধ্যে ছিলাম। যেহেতু আমার অবস্থা ক্রমাগত খারাপের দিকে যাচ্ছিলো সেজন্যে পরদিন আমাকে নবাবগঞ্জ সরকারী হাসপাতালে পাঠানো হলো। এর পর যখন আমার শরীরের অবস্থা আরও সংকটাপন্ন হলো তখন আমাকে ২১. ১. ৫০ তারিখে নবাবগঞ্জ থেকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে এসে সেখানকার জেল হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হলো। কোনো অবস্থাতেই আমি পুলিশকে কিছু বলি নি এবং উপরে যা বলেছি তার বেশি আমার আর বলার কিছুই নেই।"

কমরেড ইলা মিত্র সমস্ত লজ্জা-সঙ্কোচ দূরে ঠেলে ফেলে তাঁর ঐ জবানবন্দীতে পাক-সরকারের ঘৃণ্য বর্বরতার যে-চিত্র সদিন উদ্ঘাটিত করেছিলেন পৃথিবীর যে-কোনো সভ্য দেশের ভিত্তিমূল তাতে কেঁপে উঠতে পারতো, যে-কোনো বিবেকবান মানুষের মনেও জ্বলে উঠতে পারতো দাউ দাউ ঘৃণার আগুন। কিন্তু লীগ-সরকারের এই কলঙ্কিত কাহিনী সেদিন পূর্ববাঙলার মানুষ ভালো করে জানতেই পারে নি। লীগ-সরকারের আজ্ঞাবহ 'আজাদ' কিংবা 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকা এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব ছিল। কলকাতার 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এই বর্বরতম অত্যাচারের এক আংশিক বিবরণ। আর, ১৯৫০ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী পূর্ববাঙলার আইন-সভায় কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী এ-সম্পর্কে আলোচনার জন্য এক মুলতবী প্রস্তাবের নোটিশ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু নির্লজ্জ লীগ-সরকার সংখ্যাধিক্যের জোরে, তৎকালীন

স্পীকারের সহযোগিতায়, সেই মুলতবী প্রস্তাবটি নাকচ করে দেন।

শুধু তাই নয়, কমরেড ইলা মিত্র-র মামলা পরিচালনার জন্য যাতে কোনো আইনজীবী এগিয়ে না আসেন তার জন্যও শাসন-কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সৃষ্টি করা হয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাপ। এই সেদিন, ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে, আর এক বর্বর জঙ্গীসর্দারের খুনী-বাহিনী হত্যা করেছে যাঁকে, রাজশাহীর সেই বিপ্লবী সুসন্তান বীরেন সরকারই একমাত্র সব ভয়-ভাবনা অগ্রাহ্য করে আইনজীবী রূপে গ্রহণ করেছিলেন ইলা মিত্র-র মামলা পরিচালনার ভার। ভাষা-আন্দোলনের পূর্বে পূর্ববাঙলার লীগশাসনের ইতিহাস—এই ধরনের নানা অত্যাচার-অবিচার আর ঘৃণ্য বর্বরতায় মসীলিপ্ত।

সুতরাং নিষ্ঠুরতম পাশবিক অত্যাচারে পঙ্গু কমরেড ইলা মিত্রকে প্রায় বিনা-চিকিৎসায় ঠেলে দেওয়া হচ্ছিল মৃত্যুর দিকে। এই সময়, ১৯৫৩ সালে, পূর্ববাঙলার নবজাগ্রত মানুষ ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণকারী লীগ-সরকারের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে শুরু করেন। দেশপ্রেমিক রাজবন্দীদের সম্পর্কে তাঁরা সজাগ হয়ে ওঠেন। কমরেড ইলা মিত্র-র উপর লীগশাহীর বর্বরতম অত্যাচারের কথাও আর গোপন থাকে না। কারা-প্রাচীরের আড়াল ভেদ করে সেই কলঙ্কিত কাহিনী দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে পূর্ববাঙলার প্রতিটি জেলায়। পশ্চিমবঙ্গেও এই সময় কমরেড ইলা মিত্র-র মুক্তির দাবীতে কমিউনিস্ট পার্টি সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অসংখ্য সভা-সমাবেশ আর মিছিলে শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্র-র অপূর্ব কণ্ঠে কবি গোলাম কুদ্দুস-এর সেই বিখ্যাত কবিতা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। পূর্ববাঙলার গণতান্ত্রিক মানুষ, ছাত্র-যুবকেরা স্পষ্ট বুঝতে পারেন: 'অপরাধী লীগ সরকার!/অপরাধী নুরুল আমিন!/অপরাধী তাহারি পুলিশ! /খুনী তারা, তারা ব্যভিচারী! /কোর্টে আজ তারাই আসামী!' আর, 'ইলা মিত্র মর্মে মর্মে জানে/যৌন নয়, সমস্যা জমির!'

প্রকৃতপক্ষে, পূর্ববাঙলার জাগ্রত যুবশক্তির কাছে ইলা মিত্র হয়ে

ওঠেন অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংগ্রামী আদর্শের এক জীবন্ত প্রতীক। পূর্ববাঙলার সংগ্রামী জনতার কণ্ঠেও সেদিন ধ্বনিত হতে থাকে কবি গোলাম কুদ্দুস-এর কবিতার পংক্তি: 'ইলা মিত্র তোমার আমার/সংগ্রামের সুতীক্ষ্ণ বিবেক।/ইলা মিত্র দলাদলি, আর/ক্ষুদ্রতার রূঢ় ভর্ৎসনা!/ ইলা মিত্র নারীর মহিম/ইলা মিত্র বাঙালীর মেয়ে!' প্রায়-অজ্ঞাত রাজনৈতিক-কর্মী ইলা মিত্র ইতিহাসের হাত ধরে এইভাবে নিজেই এক ইতিহাস হয়ে যান। আমাদের অতি পরিচিত ইলাদি, আজকের কমিউনিস্ট নেত্রী ইলা মিত্র, পূর্ববাঙলার মানুষের মনে ঠাঁই পান কিংবদন্তীর নায়িকা রূপে।

মৃত্যু-পথযাত্রী সেই কিংবদন্তীর নায়িকা এলেন ঢাকায় কেন্দ্রীয় কারাগারে। আমাদের কাছে যথাসময়ে খবর পৌঁছে গেল। তারপর শুনলাম, ইলাদিকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে জেল-হাসপাতালে। ভীষণ অসুস্থ তিনি। প্রায় কথা বলতে পারেন না। মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন। আমরা অভিজ্ঞতা থেকেই জানতাম, জেল-হাসপাতালে চিকিৎসার কী মর্মান্তিক পরিণাম ঘটতে পারে! কমরেডরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। জেল-কর্তৃপক্ষের কাছে এক স্মারকলিপি পেশ করে অবিলম্বে তাঁকে বাইরের হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা পরীক্ষা করাবার জন্য পাঠিয়ে দেবার দাবী জানানো হলো। বাইরের মানুষদের কাছেও আমরা কমরেড ইলা মিত্র সম্পর্কে পৌঁছে দিলাম সব খবর। নির্বাচনের মুখে এই খবর জানার পর, বাইরের রাজনৈতিক দলগুলিও ইলা মিত্র-র সুচিকিৎসা আর মুক্তির দাবীতে মুখর হয়ে উঠলো; আমরাও বোধহয় একবার কিংবা দুবার ঐ একই দাবীতে জেলের মধ্যে প্রতীক অনশন-ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করলাম।

এই সম্মিলিত চাপের কাছে তখন লীগ-সরকারের নতি-স্বীকার না করে কোনো উপায় ছিল না। ফলে, ইলাদিকে চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরিত করা হলো ঢাকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। একজন কমিউনিস্টকে ঘিরে এই হাসপাতাল অতঃপর হয়ে ওঠে ঢাকার

সংগ্রামী তরুণদের এক বৈপ্লবিক তীর্থক্ষেত্র। আমার মুক্ত-জীবনে শুনেছি, প্রতিদিন দলে দলে বিশ্ববিদ্যালয় আর ঢাকার স্কুল-কলেজ উজাড় করে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী এই হাসপাতালে কমিউনিস্ট-নেত্রী ইলা মিত্রকে একটুখানি দেখার জন্য সেদিন নাকি ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেছে। বৈপ্লবিক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবনত এই তারুণ্য-শক্তিই ১৯৫৪ সালে সাধারণ নির্বাচনের প্রথম সুযোগে লীগশাহীর সুখের মসনদ উল্টে দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন নতুন যুগের নতুন ইতিহাস, এ-কথা আমরা আজ গর্বের সঙ্গে স্মরণ করতে পারি।

কিন্তু কাজটি-যে কত কঠিন ছিল প্রাক-নির্বাচনী ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তা কিঞ্চিৎ অনুমান করা যাবে। মুসলিম লীগ-বিরোধী প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে নির্বাচনী ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে দেখে এবং ছাত্র-যুবদের জঙ্গী-চেতনা প্রত্যক্ষ করে মুসলিম লীগ সত্যিই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। সুতরাং লীগ-সরকার একদিকে তার প্রশাসনিক যন্ত্রকে যেমন নির্বাচনী-স্বার্থে নিরঙ্কুশভাবে ব্যবহার করতে শুরু করে তেমনি অন্যদিকে আবার জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করে প্রচণ্ড ভারত-বিদ্বেষ। এই চক্রান্তের ফলেই ১৯৫৪ সালের ২৬এ ফেব্রুয়ারী, নির্বাচনের মাত্র দশ দিন আগে, মুসলিম লীগ-কর্তৃক ঘোষিত হয় 'কাশ্মীর দিবস' পালনের কর্মসূচী। আর এই সুযোগে নানা মিথ্যা অভিযোগে পূর্ববাঙলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এক বিরাট অংশ, প্রায় বারো শত রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করে আটক রাখা হয় পূর্ববাঙলার বিভিন্ন জেলখানায়।

মনে পড়ছে, এই সময় ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দীরূপে আসেন আদমজী জুট মিলের শ্রমিক ইউনিয়নের প্রথম সভাপতি, পূর্ব-বাঙলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের তরুণ নেতা দেওয়ান মাহবুব আলি। নির্বাচনের প্রাক্কালে গণতান্ত্রিক দলের বরিশাল জেলার নেতা জনাব মহীউদ্দিনসহ আরও অনেক রাজনৈতিক কর্মীকেও আটক রাখা হয় ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে। ইয়াহিয়ার ফ্যাশিস্ত দস্যুদের মারণযজ্ঞ

শুরু হলে অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে জনাব মাহবুব আলি এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে কলকাতায় শরণার্থী রূপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইসময় তার সঙ্গে আমার কয়েকবার সাক্ষাৎকারও ঘটেছে। জেনেছি, বর্তমান বাঙলাদেশের জাতীয় আওয়ামী পার্টির (মুজফ্‌ফর-গ্রুপ) তিনিই ছিলেন সহ-সভাপতি। বাঙলাদেশের মুক্তি-যুদ্ধে বিশ্ববাসীর সমর্থন লাভের আশায় ১৯৭১ সালের মে মাসে বুদাপেস্ত-এ অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি-সংসদের সম্মেলনে তিনি বাঙলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু হায়, এই মহান দেশপ্রেমিক বুদাপেস্ত-সম্মেলন শেষে ভারতের পালাম বিমান-বন্দরে পদার্পণ করেই গুরুতর হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঢলে পড়েন মৃত্যুর কোলে। যে-জনপ্রিয় তরুণ নেতা ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ-প্রার্থীকে বন্দী-অবস্থায় পরাজিত করে পূর্ববাঙলার বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, যিনি ছিলেন স্বাধীন বাঙলাদেশের জাতীয় আওয়ামী পার্টির সহ-সভাপতি, এই যুগসন্ধিকালে যাঁকে আরও বেশি প্রয়োজন ছিল, মুক্তি-পথিক সেই দেওয়ান মাহবুব আলি চিরকালের মতো চলে গেলেন সব কিছুর ঊর্ধ্বে। মুক্তি-যুদ্ধের সফল পরিণতির পর স্বাধীন গণপ্রজাতান্ত্রিক বাঙলাদেশের মেহনতী মানুষ একদিন নিশ্চয় স্মরণ করবে তাঁদের প্রিয়বন্ধু, সহযোদ্ধা দেওয়ান মাহবুব আলির অমর স্মৃতি, এ-কথাটুকু আজ আমি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করতে পারি।

নির্বাচনের প্রাক্কালে আটক-বন্দীদের মধ্যে জনাব মহীউদ্দিনের নাম আমি উল্লেখ করেছি একটি বিশেষ কারণে। পশ্চিমবাঙলার মানুষ হয়তো অনেকেই জানেন না বরিশালের মহীউদ্দিনকে। জানলেও বরিশালের মহীউদ্দিন এতদিনে তাঁদের কাছে মৃত-স্মৃতি মাত্র। কিন্তু আমি জনাব মহীউদ্দিনকে ভুলতে পারি নে কিছুতেই। মহীউদ্দিন আমার মনে পূর্ববাঙলার রূপান্তরিত মানুষের জীবন্ত প্রতীক হয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবেন। দেশ-বিভাগের সময় যিনি ছিলেন ঘোর

লীগপন্থী—দ্বিজাতি-তত্ত্বে বিশ্বাসী তরুণ নেতা, ১৯৫০ সালে বরিশাল জেলার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় যিনি ছিলেন জেলা লীগের সম্পাদক, সেই মহীউদ্দিনও শেষপর্যন্ত তাঁর ভুল বুঝতে পেরে রুখে দাঁড়ান মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে। দস্যু রত্নাকর যেমন বাল্মিকী হয়েছিলেন, একদা ধর্মান্ধ লীগ-নায়ক মহীউদ্দিন তেমনি ভাষা-আন্দোলনের জাদুস্পর্শে জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পরিণত হলেন বরিশাল জেলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রথম সারির নেতায়।

জেলের মধ্যে এই মহীউদ্দীন, গণতান্ত্রিক দলের নেতা পরিশুদ্ধ মহীউদ্দিন, তাঁর অতীত কার্যকলাপ স্মরণ করে অনুতাপ আর অনুশোচনায় ঝর ঝর করে কেঁদেছেন, এ-দৃশ্য না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। জনাব মহীউদ্দীনের সঙ্গে যে-সব কমরেড একত্রে অন্য ওয়ার্ডে বন্দী ছিলেন, তাঁরাই আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন এই রূপান্তরিত মহীউদ্দিনের বিবরণ। নির্বাচনের আগে তাই জনাব মহীউদ্দিনকে আটক রাখতে এতটুকু ইতস্তত করে নি পূর্ববাঙলার লীগ-সরকার। নবজাগ্রত, পরিশুদ্ধ মানুষকেই তো মুসলিম লীগ-এর পাণ্ডারা সে-সময় দেখেছে সব চেয়ে ভয়ের চোখে। জানি নে, বরিশাল জেলার জনাব মহীউদ্দিন এখন কোথায়। এপার বাঙলায় বসে তাঁর সম্পর্কে সর্বশেষ যে-খবর আমি সংগ্রহ করেছিলাম তাতে স্পষ্ট বুঝতে পারি—বেঁচে থাকলে তিনি এখনও লড়াই করছেন তাঁর মাতৃভূমির সর্বশেষ শত্রু ইয়াহিয়ার জঙ্গী-চক্রের বিরুদ্ধে।*

ভাষা-আন্দোলনের এই পরিস্থিতিতে, ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে (৮-১১ মার্চ) অনুষ্ঠিত পূর্ববাঙলার সাধারণ নির্বাচনে যা হবার তাই ই হলো। লীগশাহীর ভরাডুবি ঘটলো। এতবড় পরাজয় সতিই ছিল অপ্রত্যাশিত। কেউ ভাবতে পারে নি, পাকিস্তান-আন্দোলনের স্রষ্টা

---

*আমাদের সৌভাগ্য, জনাব, মহীউদ্দিন তাঁর পরিশুদ্ধ বৈপ্লবিক চেতনা নিয়ে এখনও বেঁচে আছেন। তিনি বাঙলাদেশের জাতীয় আওয়ামী পার্টির (মুজফ্ফর-পন্থী) অন্যতম নেতা। যে-মুষ্টিমেয় নেতা বাঙলা দেশে অবস্থান করে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তিনি সেই বিরল-ব্যতিক্রম দুঃসাহসীদের একজন।—লেখক

মুসলিম লীগ—পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবীকে ৭ বছরের মধ্যে বাস্তবায়িত করে, তার পরবর্তী ৭ বছরের মধ্যেই জনগণ-কর্তৃক এমনভাবে পরিত্যক্ত হবে। কিন্তু এই অভাবনীয় কাণ্ডটিকেও সম্ভবপর করে তুললেন পূর্ববাঙলার জনগণ। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হলে দেখা গেল, মুসলিম লীগ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। আর, যুক্তফ্রণ্টের করায়ত্ত অভাবিত বিপুল বিজয় !

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ববাঙলার সর্বমোট আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯টি। এর মধ্যে মুসলিম আসনের সংখ্যা হলো ২৩৭ এবং বর্ণহিন্দু, তফশিলী হিন্দু, বৌদ্ধ আর খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের জন্য বরাদ্দকৃত আসনের মোট সংখ্যা ৭২টি। জনাব ফজলুল হক, ভাসানী এবং সুহ্‌রাবর্দির নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রণ্ট এই নির্বাচনে বিপুল ভোটে মুসলিম আসনগুলির ২২৩টিতে বিজয়ী হন। বিপর্যস্ত মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯টি আসন। বাকী ৫টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৪টিতে বিজয়ী হলেন নির্দল প্রার্থী আর মাত্র ১টি আসন গেল নবগঠিত খিলাফত-ই-রব্বানী পার্টির হাতে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আসনগুলিতে ১৫ জন বর্ণহিন্দু, ৮ জন তফশিলী হিন্দু, ১ জন বৌদ্ধ, ১ জন খ্রীস্টান—সর্বমোট ২৫ জন নির্বাচিত হলেন পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসের টিকিটে : সংখ্যালঘু যুক্তফ্রণ্ট পেলেন ১০ জন বর্ণহিন্দু, ২ জন তফশিলী হিন্দু এ ১ জন বৌদ্ধ-র আসন নিয়ে মোট ১৩টি আসন। শ্রীরসরাজ মণ্ডলের নেতৃত্বাধীন তফশিলী জাতি ফেডারেশন-এর হাতে গেল ২৭টি আসন ; আর কমিউনিস্ট পার্টি এবং গণতান্ত্রিক দল পেলেন যথাক্রমে ৪টি ও ৩টি সংখ্যালঘু প্রার্থীর আসন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণীয়। গণতান্ত্রিক দল শুধুমাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৩টি আসনেই জয়লাভ করে নি। যুক্তফ্রণ্টের অন্তর্ভুক্ত দল হিসেবে জয়ী ২২৩টি মুসলিম আসনের মধ্যে গণতান্ত্রিক দলের সদস্যরা আরো ১০/১২টি আসনে বিজয়ী হন। আর, কমিউনিস্ট পার্টি সরকারী-

ভাবে সংখ্যালঘু আসনের ৪টিতে * বিজয়ী হলেও গণতান্ত্রিক দলের নির্বাচিত সদস্যদের একাংশ ছিলেন গোপন কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য কিংবা অনুগত সহযাত্রী। অন্য দলের মধ্যেও ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক ও অনুগামী আরও দু-চারজন সদস্য। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচনের সময় কমিউনিস্ট পার্টির এই শক্তি প্রতিফলিত হয়। এঁদেরই সমর্থনে জাতীয় পরিষদের আসনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীরূপে সরদার ফজলুল করিম সহজেই নির্বাচিত হন। ** একজন সুপরিচিত কমিউনিস্ট এই সর্বপ্রথম পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পেলেন।

যাহোক, পূর্ববাঙলার প্রথম সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল যখন ঘোষিত হচ্ছিল, আমরা জেলের মধ্যে তখন আনন্দোৎসবে মত্ত। মুসলিম লীগের এমন শোচনীয় পরাজয় আমাদের কাছে ছিল ধারণাতীত ব্যাপার। আসন্ন মুক্তির প্রত্যাশায় আমাদের মন তখন সত্যিই উদ্বেলিত।

যুক্তফ্রণ্টের এত বড় জয়ের পরেও কিন্তু মন্ত্রীসভা গঠনের কাল বিলম্বিত হলো। নির্বাচনে আওয়ামী মুসলিম লীগই যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে দল হিসেবে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ফলে, সেই পুরনো কোন্দল আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আওয়ামী মুসলিম লীগ চাইলো যুক্তফ্রণ্টের নেতারূপে জনাব সুহ্‌রাবর্দিকে নির্বাচিত করতে। এদিকে সবাই জানতো, নির্বাচনে জয়লাভ করলে বর্ষীয়ান নেতা জনাব ফজলুল হকই হবেন পূর্ববাঙলার মুখ্যমন্ত্রী। এই রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে যেমন বেশ কিছু দিন সময় লগেলো, তেমনি নির্বাচনে নিহত মুসলিম লীগের গলিত

---

* কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচিত আইন-সভার সদস্য: চট্টগ্রামের পূর্ণেন্দু দস্তিদার (জেল থেকে নির্বাচিত) ও সুধাংশুবিমল দত্ত, শ্রীহট্টের বরুণ রায় এবং রংপুর জেলার নীলফামারীর অভয় বর্মন।

** সরদার ফজলুল করিম বর্তমানে ঢাকা বাঙলা একাডেমীর সাংস্কৃতিক বিভাগের অধ্যক্ষ। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাক-সামরিক বাহিনী তাঁকে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী করে রাখে। পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর তিনি মুক্ত হন।—লেখক

শব-দেহ কাঁধে নিয়ে কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার শোকে-দুঃখে যুক্তফ্রন্টকে মন্ত্রীসভা গঠনে আমন্ত্রণ জানাতেও করলেন বেশ কিছুটা টালবাহনা ! অবশেষে ১৯৫৪ সালের ২৫এ মার্চ সেই শুভ দিনটির কথা ঘোষণা করলেন পাকিস্তান-সরকার। ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল জনাব ফজলুল হক-এর নেতৃত্বে গঠিত হলো বহু আকাঙ্ক্ষিত যুক্তফ্রন্ট-মন্ত্রীসভা। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সমর্থন জানিয়ে পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট পার্টিসহ মুসলিম লীগ-বিরোধী দলগুলি বিবৃতি দিলেন। সেই বিবৃতিতে যুক্তফ্রণ্টের ২১ দফার অন্যতম রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীটি অবিলম্বে কার্যকর করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি আহ্বান জানালেন নবগঠিত মন্ত্রীসভার কাছে।

ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে এবার আমাদের দিন-ক্ষণ-পল গণনার পালা। কখন আসবে আমাদের প্রতীক্ষিত মুক্তির ফরমান, তারি জন্য প্রতিটি মনে সংগোপনে শুরু হয়ে গেল শৈশবের আনচান। বাইরে আমরা সেই ভাবটা প্রকাশ্যে দেখাই না কেউ, কিন্তু ভিতরে ভিতরে মুক্তির প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ। খবরের কাগজ এলে আমরা সকলেই হুমড়ি খেয়ে পড়ি। রাজবন্দীদের মুক্তির ঘোষণা দেখার জন্য তন্ন তন্ন করে খুঁজি সংবাদপত্রের প্রতিটি কলাম,প্রতিটি পৃষ্ঠা। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব-দোলায় একদিন কিংবা দু-দিন অতিক্রান্ত হলো। তারপর সংবাদ-পত্রের কালো হরফ আলো করে ৪ঠা কিংবা ৫ই এপ্রিল এলো যুক্তফ্রন্ট-সরকার কর্তৃক মুক্তির আদেশপ্রাপ্ত রাজবন্দীদের প্রথম তালিকা। উল্লাসধ্বনি উঠলো সারা ওয়ার্ড জুড়ে। একজন তাঁর কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তুলে একে একে পাঠ করলেন তালিকাভুক্ত প্রতিটি নাম। এক-একটা নাম পড়া শেষ হয় আর আমরা হাততালি দিয়ে উঠি। দুহাতে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানাই সেই ভাগ্যবান কমরেডটিকে।

ঘরে-ফেরার এই পালায় আমার নামটি ঘোষিত হলো ৭ই এপ্রিল।

একই উল্লাসধ্বনিতে আমিও অভিনন্দিত হলাম। পড়ন্ত বিকেল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে তখন। জেল-নেতৃবৃন্দ আমাকে ডেকে নিয়ে বাইরের মুক্ত-জীবনে কিছু অবশ্য-করণীয় কাজের নির্দেশ দিলেন। স্থির হলো, কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্য কাজের জন্য ঢাকায় যে কমিউন খুলেছে সেখানেই প্রথম উঠবো আমি। কাপড়-চোপড় থলিতে ভরে বিছানা-পত্তর গুছিয়ে নিলাম। এ-এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা! আনন্দ আর বিষাদ একই সঙ্গে আমার মনে তখন তোলপাড় শুরু করেছে।

ইতিপূর্বে অনেক কমরেড মুক্তি পেয়ে চলে গিয়েছেন। জেলখানা প্রায় অর্ধেক খালি। তাঁদের মুক্তির সময়েও দেখেছি কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়তেন তাঁরা। চোখ দুটো ছল্‌ছল্‌ করে উঠতো। আমি ভাবতাম, বড্ড বেশি ভাবপ্রবণ ওঁদের মন। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই ভাবপ্রবণতা আমাকেও গ্রাস করলো। বুঝতে পারলাম, একই রক্ত-মাংস-অস্থিতে গড়া আমাদের সর্বাঙ্গ। একই মানবিক চেতনার আমরা সমান অংশীদার। মুক্তি যত কাম্যই হোক-না কেন, দীর্ঘ-কালের সংগ্রামী সাথীদের বিচ্ছেদ-বেদনাও কম সত্য নয়।

বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এলো। শেষ-চৈত্রের অকাল-বর্ষণ তখনও চলছে। মুক্তি-দূতের কোনো সাক্ষাৎ নেই। ভাবলাম, এই দুর্যোগে আজ বোধহয় জেল-কর্তৃপক্ষ আর ডাক পাঠাবেন না ; কিংবা আমলাতান্ত্রিক গাফিলতিতে হয়তো এখনও ফরমান পৌঁছায় নি জেল-অফিসে। এমনি সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে যখন ঘুর ঘুর করছি এ-বন্ধু ও-বন্ধুর আশেপাশে, তখন ছাতা মাথায় হাজির হলো আমাদের চার বছরের পরিচিত বেহারী জমাদার। একগাল হেসে বল্লোঃ চলিয়ে বাবুসাব, অর্ডার মিল গিয়া।

আবার চঞ্চলতার ঢেউ জাগলো চার দেওয়ালের মধ্যে। একে একে সব কমরেড় এসে ঘিরে দাঁড়ালেন আমাকে। অনিলদা, জ্ঞানদা, মুকুলদা, নলিনীদা, রওশন ভাই, বাসুদা, বটুদা, রতনদা, কামাল,

সন্তোষ বিশ্বাস—সব কমরেড তাঁদের প্রীতি আর ভালোবাসায় আমার সমস্ত মন-প্রাণ কানায় কানায় ভরিয়ে দিয়ে জানালেন তাঁদের বিদায়-অভিনন্দন—লাল সেলাম!

আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো। আগেও দু-দুবার জেলে গিয়েছি। কিন্তু এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই নি। এবারের এই দীর্ঘ কারাজীবনের বর্ণ-গন্ধ-স্বাদ সবই যেন আলাদা। এক ঝম্ ঝম্ বৃষ্টির দিনে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে ঢুকেছিলাম, আর এক অকাল-বর্ষণ মাথায় নিয়ে চোখের জলে ভিজতে ভিজতে ওয়ার্ডের ছোট প্রাচীর পার হয়ে পা বাড়ালাম জেল-গেটের দিকে। যতক্ষণ দেখা যায় ঝাপসা চোখের দৃষ্টি ফেলে বারংবার দেখলাম পিছনে পড়ে-থাকা বন্দী-কমরেডদের মুখগুলো. তাঁরাও বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলেন আমাকে। যে-হাতে তাঁরা রক্ত-পতাকা ওড়াতেন সেই হাত নেড়ে নেড়ে আমার মনের বনে রক্তগোলাপ ফোটাতে লাগলেন তাঁরা। তারপর এক সময় সব কিছু দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল। আমি প্রবেশ কবলাম জেলখানার অফিসে।

জেল-অফিসের নানা ফর্মালিটিজ শেষ করতে বেশ কিছুটা সময় লাগলো। খাতাপত্রে সহি-সাবুদের পর রেল-ভ্রমণের পাশ আর খাই-খরচের টাকাটাও হাতে গুঁজে দিলেন জেল-কর্তৃপক্ষ। ঘরে র তখন আলো জ্বলে উঠেছে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে ঝির ঝির করে। আমি ঝোলাঝুলি কাঁধে তুলে নিলাম। তারপর জেল-গেটের ফোকর পেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম মুক্তজীবনের প্রশস্ত রাজপথে।

ঠিক এই মুহূর্তে কেমন একটা অসহায়তা আমাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেললো। ঢাকার পথ-ঘাট, গলি-ঘুঁজি কিছুই চিনি নে। এই দুর্যোগে পার্টির কমিউনে পথ-চিনে যেতে পারবো কিনা এবং সেখানে পৌঁছুলে কাউকে পাবো কিনা—এই সংশয়-দোলায় দুলতে লাগলো আমার মন। কয়েক মিনিটের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিলাম রাতে আর পার্টি-কমিউনে যাব না। কিন্তু কোথায় উঠবো তাও ঠিক করতে

পারছিলাম না। শেষপর্যন্ত ঢাকার দৈনিক 'সংবাদ' পত্রিকার অফিসে যাওয়ার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করলাম।

জেলে থাকতেই শুনেছিলাম 'সংবাদ' পত্রিকায় চাকরী করেন আমার পূর্ব-পরিচিত কবি-বন্ধু আহসান হাবীব। হাবীব সাহেব ছিলেন 'সংবাদ'-এর সাহিত্য-বিভাগের সম্পাদক। জেল থেকে গোপনে পাঠানো আমার কয়েকটি কবিতাও তখন 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া পূর্ববাঙলার প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী এবং সাংবাদিকদের একাংশও ছিলেন 'সংবাদ'-এর সঙ্গে যুক্ত। ফলে, রাত-কাটাবার জন্য 'সংবাদ' পত্রিকার কথাই মনে পড়লো আমার।

রিক্সায় চেপে অল্পক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম 'সংবাদ' পত্রিকার অফিসে। বংশাল রোডে অবস্থিত 'সংবাদ' পত্রিকার যে-অফিস ছিল আমার মুক্তজীবনের প্রথম আশ্রয়স্থল, যে-পত্রিকা পূর্ববাঙলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পালন করেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, শুনেছি 'ইত্তেফাক' পত্রিকার মতো সেই পত্রিকা-অফিসও আজ ইয়াহিয়ার জঙ্গী-দাপটে চূর্ণ-বিচূর্ণ।

যাহোক, সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে কর্মরত সাংবাদিক-বন্ধুদের কাছে আত্মপরিচয় ঘোষণা করলাম। কবি-বন্ধু আহসান হাবীব তখন অফিসে ছিলেন না। কিন্তু অপরিচিত সাংবাদিক-বন্ধুরা মুহূর্তে আমার আপনজন হয়ে গেলেন। পূর্ববাঙলার মুক্তমানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসায় ধন্য হলো আমার জীবন।

তারপর অনুষ্ঠিত হলো এক অঘোষিত সাংবাদিক সম্মেলন। জেল-নেতৃত্ব আমাকে যে-দায়িত্ব পালন করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন, মুক্ত-জীবনে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অভাবিতভাবে তা প্রতিপালিত হলো। কারারুদ্ধ রাজবন্দীদের পক্ষ থেকে আমি পূর্ববাঙলার গণতান্ত্রিক মানুষদের অভিনন্দন জানালাম, আমার বিবৃতিতে তুলে ধরলাম অবিলম্বে সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবী আর অসুস্থ কমরেডদের সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য। 'সংবাদ' পত্রিকা অফিসে বসে লেখা

সেই বিবৃতিটি আমার চোখের উপর দিয়ে সাংবাদিক-বন্ধুরা প্রকাশের জন্যে পাঠিয়ে দিলেন প্রেসে। পরের দিন দেখেছিলাম, সেই বিবৃতিটি যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে প্রকাশিত হয়েছে 'সংবাদ'-এর পৃষ্ঠায়।

এবার আমার থাকা-খাওয়ার প্রশ্ন তুললেন সাংবাদিক বন্ধুরা। অনেকেই তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত আমার জেলার সাংবাদিক-বন্ধুর দাবীই স্বীকৃত হলো। 'সংবাদ'-এর সহ-সম্পাদক মোহাম্মদ তোহা খাঁর দয়াগঞ্জের বাড়ীতে যেতে হলো আমাকে। তোহা সাহেবের কাছে শুনলাম, তাঁর বাড়ী খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমায়। প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা রেজ্জাক খাঁ সাহেবের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তিনি। সে-রাত্রে হঠাৎ আগন্তুক অতিথির জন্য খাঁ-সাহেবের পরিবার যে-আতিথেয়তা প্রদর্শন করেছিলেন, আজও ভুলতে পারি নি সে-কথা।

খাঁ-সাহেবদের বাড়ীতে আরামদায়ক শয্যায় শুয়েও আমার মুক্ত-জীবনের প্রথম রাতটা নির্ঘুম কেটে গেল। এতকাল পরেও সেই রাতটার কথা স্পষ্ট মনে আছে। জেলখানার নির্জনে চার বছর কাটাবার পর বুঝতে পারলাম রাতের মুক্ত পৃথিবীও কত সরব আর জীবন্ত। প্রতিটি ঝিল্লির স্বর, রাতজাগা পাখির ডাক, নিশাচর জীবজন্তুর চলাফেরার শব্দ আর টেবিল ফ্যানের শন্ শন্ [illegible] ওয়া এত জোরে এবং স্পষ্টভাবে আমার স্নায়ুশিরায় আঘাত করছিল যে, প্রাণপণে চেষ্টা করেও ঘুমাতে পারলাম না এতটুকু। অভ্যস্ত জীবনের দায়মুক্ত হওয়াটা কী ভীষণ কঠিন!

পরের দিন সকালে চা-জলখাবার খেয়ে খাঁ-সাহেব আর তাঁর পরিবারবর্গের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হলাম পার্টি-কমিউন অভিমুখে। জায়গাটার নাম এখন আর আমার মনে নেই। তবে কমিউনের চেহারাটা মনে আছে বেশ। [illegible]তি সামান্য দুখানা ঘর। বোধহয় দড়মার বেড়া দিয়ে ভাগ করা ছিল। দুখানা কিংবা একখানা চৌকি পাতা। দড়িতে ঝুলন্ত দু-একটি জামা-কাপড়ও চোখে পড়েছিল।

কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই কমিউনকে কেন্দ্র করে একটা 'টিম' তখন পার্টির প্রকাশ্য কাজকর্ম পরিচালনা করছিলেন। জেল থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত কমরেডদের কয়েকজনের উপরই প্রধানত ন্যস্ত হয়েছিল এই দায়িত্ব। কমরেড আলি আকসাদ, নুরন্নবী আর মতিন (বগুড়া)—এঁদের কেউ-না-কেউ থাকতেন এখানে। এই 'টিম'-এর নেতা হিসেবে কাজ করছিলেন সম্ভবত কমরেড মির্জা সামাদ। আমি যখন কমিউনে পৌঁছালাম তখন সেখানে ছিলেন কমরেড নুরন্নবী ও শহীদ সাবের। কমরেড নুরন্নবী আমার জেলারই কর্মী। রাজশাহী জেলে গুলি-বর্ষণের সময় তিনি গুরুতর আহত হন। তাঁর একটা পা কেটে বাদ দিতে হয়েছিল। বর্তমানে তিনি কলকাতায় সোভিয়েত তথ্য ও প্রচার বিভাগে কর্মনিরত। আর, শহীদ সাবের ছিলেন তরুণ ছাত্রকর্মী ও উদীয়মান কবি। ঢাকা জেলে তিনি আমাদের সঙ্গে কাটিয়েছিলেন কয়েক মাস। পরে তিনি সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যান। কিন্তু হায়, সেই বিকৃত-মস্তিষ্ক সাবেরকেও শুনলাম হত্যা করেছে নরপশু ইয়াহিয়ার জল্লাদ-বাহিনী, দৈনিক 'সংবাদ' পত্রিকার প্রাঙ্গনে।

যাহোক, কমরেড নুরন্নবী ও শহীদ সাবের-এর সঙ্গে জেলখানার গল্প শেষ হতে-না-হতেই এসে পড়লেন কমরেড মির্জা সামাদ। তাঁর সঙ্গে আমার আগে কোনো পরিচয় ছিল না। তিনি প্রকাশ্যে কাজকর্ম শুরু করার পর তাঁর নামে প্রকাশিত বিবৃতি পড়েছি জেলখানায় বসে। এই প্রথম চাক্ষুষ পরিচয়। কমরেড নুরন্নবী আমার পরিচয় দিতেই জড়িয়ে ধরলেন তিনি। বল্লেন, সকালের 'সংবাদ'-এ তিনি আমার মুক্তির খবর এবং বিবৃতি—উভয়ই পাঠ করেছেন। ঢাকায় কয়েকদিন থাকার জন্য অনুরোধ করলেন তিনি। আমিও রাজী হয়ে গেলাম।

আমাকে ওঁরা কমিউনে না রেখে হাটখোলা রোডে একজন হিন্দু কমরেডের বাড়িতে রাখাই মনস্থ করলেন। ঠিক হলো, আবদুল্লাহ্ আলমুতি এবং মির্জা সামাদ ওখানেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবেন। হাটখোলার ঐ বাড়ীতে কে আমাকে পৌঁছে দিয়েছিলেন

আজ আর তা মনে নেই। কিন্তু ওখানে আবদুল্লাহ আলমুতি আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং পরে যে-কয়দিন ঢাকায় ছিলাম তিনি প্রায় প্রত্যেক দিনই আমাকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরেও বেড়িয়েছিলেন। শুধু দু-দিন, একদিন সকালে এবং একদিন রাত্রিতে, কমরেড মির্জা সামাদ-এর সঙ্গে আমি গিয়েছিলাম মুখ্যমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক-এর সরকারী বাসভবনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীটি তুলে ধরার জন্য এবং পার্টি-নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁদের গোপন আস্তানায়।

কমরেড সামাদ ও আমি যখন পৌঁছালাম মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে তখন সকাল আটটা কিংবা সাড়ে আটটা। দেখলাম, তার মধ্যেই সাক্ষাৎ প্রার্থীর সংখ্যা প্রায় জনসমাবেশের আকার ধারণ করেছে। লোকজনের ভীড়ে আর হৈ-হট্টগোলে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন সত্যিই তখন মেছোহাটা। মনে হলো, মুসলিম লীগের অপশাসনে অবরুদ্ধ মানুষ এতদিনে অবরোধ ভেঙ্গে নতুন মুক্তির স্বাদে যেন দু-কূল ছাপিয়ে উপচে পড়ছে। কোনো শৃঙ্খলা ছিল না কোথাও, কিন্তু সদ্য শৃঙ্খলমুক্ত আমার মন এই আবেগতপ্ত মানুষের সংস্পর্শে খুশিই হয়ে উঠলো। জনাব ফজলুল হক সেদিন অসুস্থ ছিলেন। ডাক্তারের নির্দেশ মান্য করে তাই আমরা নিরাশ হয়েই ফিরে এলাম

পার্টি-নেতৃত্বের সঙ্গেও একদিন রাত্রিতে দেখা হলো। অনেক গলি-ঘুঁজি ঘুরিয়ে কমরেড সামাদ আমাকে নিয়ে গেলেন সেই গোপন আস্তানায়। কমরেড নেপাল নাগ, খোকা রায় কিংবা অন্য কোন্ নেতার সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছিল ঠিক করে আজ আর তা বলতে পারবো না। কারণ, আমার সঙ্গে অতীতে এঁদের কোনো ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না। আত্মগোপনকারী নেতাদের পরিচয় জানার কৌতূহলও দমন করতে হয়েছিল খুব সঙ্গত কারণেই। শুধু মনে আছে, যে-নেতার সঙ্গে আমি সেই রাতে সাক্ষাৎ করেছিলাম তিনি বন্দী-কমরেডদের অবস্থা, বিশেষ করে তাঁদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খুঁটিয়ে

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের আংশিক ইতিহাস। খুলনা শহর শুধু আকৃতিতে বর্ধিত হয় নি, শ্রমজীবী মানুষের ক্রমবর্ধমান বসতি-বিস্তারের মধ্য দিয়ে তার আন্তর্জগতেও জেগেছে গুণগত পরিবর্তনের সাড়া। গোপন পার্টি এই বিরাট দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত সংগঠন তখনও গড়ে তুলতে পারে নি। কিন্তু মুসলিম লীগ-নায়ক, খুলনাব কলঙ্ক আবদুস সবুর খান নির্বাচনে পরাজয় বরণ করেছেন। তাঁর রাজকীয় প্রতিপত্তি যথেষ্ট খর্বিত। আমাদের সুপরিচিত এককালের ব্রীফলেস উকিল, তরুণ জাতীয়তাবাদী কর্মী আব্দুল জব্বার সাহেব এখন জনপ্রিয় আর কর্মব্যস্ত আইনজীবীই শুধু নন, খুলনা জেলার গণতান্ত্রিক দল-এর খ্যাতিমান সভাপতিও বটে।* আর তাঁর সহকর্মী রূপে তিনি পেয়েছেন একদা শহর-মুসলিম লীগেব নেতা ফেরদৌস ভাই এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীদেবেন দাশ প্রমুখ আরও অনেককে। খুলনার প্রবীণ কংগ্রেস-নেতা, আইনসভায় কংগ্রেস দলের প্রাক্তন চীফ হুইপ শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিগত নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন গণতন্ত্রী দল এর প্রার্থী শ্রীদেবেন দাশ-এর হাতে। অতুলদাব কাছে আরও শুনলাম, আমার কলেজ-জীবনের সহপাঠী-বন্ধু আলতাফ গড়ে তুলছে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন আর গফুরও** নাকি শ্রমিকশ্রেণীর জীবনদর্শন গ্রহণ করে রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ। এছাড়া জেলাস্তরে আওয়ামী মুসলিম লীগের শক্তিও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিচিত প্রাক্তন ছাত্রনেতা ও কর্মীদের এক বিরাট অংশ আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করায় খুলনা জেলায় সবুর খান-এর মুসলিম লীগ সদ্য অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত।

খুলনায় দু-দিন যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত কেটে গেল। একে একে দেখা

*আব্দুল জব্বার সাহেব পরবর্তী কালে ভাসানী-পন্থী ন্যাপের জেলা সভাপতি ছিলেন। সম্প্রতি খবর পেয়েছি, পাক-বাহিনীর হাতে এই দেশপ্রেমিক-সন্তান নিহত হয়েছেন।—লেখক

**গফুর এখন আওয়ামী লীগের নেতা। শুনেছি, তারই নেতৃত্বে নাকি সাতক্ষীরার স্টেট ব্যাঙ্কটি লুণ্ঠিত হয়।—লেখক

হলো গণতন্ত্রী দলের নেতা আব্দুল জব্বার, ফেরদৌস ভাই, দেবেন দাশ প্রমুখ আরও অনেকের সঙ্গে। কমিউনিস্ট পার্টির পুরনো নেতা কমরেড শচীন বসু (খোকাদা) আত্মগোপন করে তখন খুলনা জেলার ভাঙ্গা কমিউনিস্ট পার্টিকে সংগঠিত করছিলেন। গণতন্ত্রী দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বুঝতে পারলাম, খোকাদার সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ। বিশেষ করে ফেরদৌস ভাই ও দেবেনবাবু পার্টির সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রেখেই কাজ করছেন। ফেরদৌস ভাই আমাকে গ্রামের বাড়ী থেকে ঘুরে এসে খুলনায় স্থায়ীভাবে কাজ করার জন্য আহ্বান জানালেন। আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতাদের সঙ্গেও অনেক কথা হলো। এঁদের অধিকাংশই আমার পুরনো বন্ধু, ছাত্র-আন্দোলনের সহকর্মী। তারাও খুব হৃদ্যতার সঙ্গে গ্রহণ করলেন আমাকে। আমার পরিচিত তরুণ নেতাদের মধ্যে একমাত্র আমজাদকেই দেখলাম ব্যতিক্রম হিসেবে। আমজাদ নাকি সবুর খানের দক্ষিণহস্তে পরিণত রয়েছে। আয়ুব-আমলে সবুর সাহেব যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, আমজাদ তখন তাঁর এই বিশ্বস্ততার পুরস্কার স্বরূপ পূর্ববাঙলার শিক্ষা-মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেছিল।

এইসব বন্ধুরা এখন কে কোথায় আছেন, জানিনে ঠিক। শুনেছি, জব্বার সাহেব বর্তমানে ভাসানী-পন্থী ন্যাপের জেলা-সভাপতি; আর ফেরদৌস ভাই মুজফ্ফর-পন্থী ন্যাপের নেতা। জঙ্গী-শাসকের জল্লাদ বাহিনী আজ যাঁদের খুঁজে ফিরছে তিনি তাঁদেরই অন্যতম। দেবেন দাশ মহাশয় বিভাগ-পূর্বকালে অন্য রাজনৈতিক দলের নেতা ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল খুবই মধুর। আজ দেবেনবাবু জীবিত না মৃত, আমি তা সঠিক জানি নে। তবে কমরেড শচীন বসু (খোকাদা) সম্পর্কে শুনেছি, তিনি নাকি এখন খুলনা জেলায় হক-তোয়াহা গ্রুপের অন্যতম নেতা। কিছুদিন আগে কমিউনিস্ট পার্টির জনৈক নেতার মুখে শুনলাম, মুক্তি-যুদ্ধে পক্ষাবলম্বনের প্রশ্ন নিয়ে খোকাদার সঙ্গে নাকি হক-তোয়াহার মত-

পার্থক্য ঘটেছে। এ-কথা বিশ্বাস করতে ভালো লাগে যে, খোকাদার মতো পোড়-খাওয়া কমিউনিস্ট নেতা বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মতান্ধতার শিকল কেটে একদিন অবশ্যই বেরিয়ে আসবেন।*

দু-দিনের মধ্যে একটি জেলার রাজনৈতিক রূপান্তরণের পটভূমিকা এবং নতুন সম্ভাবনা সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, মোটামুটি সেটুকু জেনে নিলাম পুরনো বন্ধুদের সহযোগিতায়। কারাগারে বসে প্রধানত তত্ত্বগতভাবে যে-ধ্যান-ধারণা এবং রাজনৈতিক অগ্রগতির ছবি মনের পর্দায় সংগোপনে এঁকেছিলাম, ঢাকা ও খুলনার বাস্তব অভিজ্ঞতায় তাকে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করলাম। দেখলাম, আমাদের চিন্তা-ভাবনা মোটের উপর বাস্তবগ্রাহ্য। মনটা খুশি হলো। এই খুশি-মনের পশরা নিয়েই ছুটলাম গ্রামের বাড়ীর দিকে।

সেই পুরনো নদী-পথ। আশৈশব এই নদী-পথে কতবার যাতায়াত করেছি তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। আমার একান্ত পরিচিত ভৈরব নদ-এর বুক চিরে ছুটে চল্লো মোটর-লঞ্চ। খুলনা শহরের ঘাটে ঘাটে অজস্র নৌকোর মিছিল। আগে আমরা যাতায়াত করতাম গয়নার নৌকোয়। নদী-পরিবহন এখন অনেক উন্নত বলে মনে হলো। খুলনা শহর থেকে বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াতের জন্য মোটর-লঞ্চের ছড়াছড়ি।

লঞ্চ বেশ জোরেই ছুটে চলেছে। আমার মন ছুটছে আরো জোরে। জেলখানা, নতুন বাজার ছাড়িয়ে রূপসার ফেরিঘাট অতিক্রম করলাম। বড় বড় স্টীমার আর পালতোলা নৌকোর সারি চোখে পড়ছে শুধু। এক সময় শ্মশানঘাটও পেরিয়ে এলাম। কৈশোর-জীবনে বন্ধুদের সঙ্গে এই শ্মশানের মাঠে এসে দুচোখ ভরে দেখেছি বিশাল আকাশের নীচে দিগন্ত বিস্তৃত থই থই শস্যের সমুদ্র। পাখ-পাখালি, গাছ গাছালির মমতাময় সেই অপরূপ রূপের জগৎ ছুঁয়ে ছুয়ে কখন যে কৈশোর

---

*কমরেড শচীন বসু (খোকাদা) মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সীমান্ত অতিক্রম করে কলকাতায় চলে আসেন। কিন্তু হায়, এখানেই ১৯৭১ সালের শেষ দিকে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি নীলরতন সরকার হাসপাতালে অকালে প্রাণত্যাগ করেছেন। ১৯৩৪ সালে তিনি কমিউনিস্ট গ্রুপে যোগদান করেন এবং আমৃত্যু খুলনা জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন।—লেখক

অতিক্রম করেছি, আমরা তা টেরই পেলাম না কোনোদিন।

এটা মূলত আমন ধানের এক-ফসলী অঞ্চল। দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখলাম, বৈশাখের রিক্ত মাঠ নদীর চরকে আলিঙ্গন করে ভিখারীর মতো পড়ে আছে। কিন্তু আগে যেখানে মাঠ ছিল, ফসলের ক্ষেত ছিল, সেখানে এবং তার আশেপাশে—অসংখ্য নতুন বাড়ীর চূড়ো নজরে পড়তে লাগলো। বুঝলাম, এদিকের জলাভূমিতেও শহর সম্প্রসারিত হচ্ছে।

এরপর বিশাল নদী। শিবসা না পশর, ঠিক করে বলতে পারবো না। ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি—এটা পশর নদী। সেই বিশাল বিস্তৃত পশর নদী পাড়ি দিয়ে আমাদের লঞ্চ প্রবেশ করলো জলমা-বৈঠকঘাটার খালে।

এককালে এ-অঞ্চলটা ছিল কৃষক-আন্দোলনের শক্ত ঘাঁটি। এরি অপর পারে, বৈঠকঘাটার কয়েক মাইল পশ্চিমে ধানিবুনিয়া। ১৯৫০ সালে এখানেই সংগঠিত হয়েছিল সশস্ত্র কৃষক-সংগ্রাম। এই সংগ্রামের অন্যতম নায়ক অক্ষয়বাবু, হীরালাল বাইন, চাঁদমণিদা—এঁরা সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের পর নিরাপত্তা আইনে ধৃত হয়ে ঢাকা আর রাজশাহীর কেন্দ্রীয় কারাগারে কাটিয়েছেন দীর্ঘকাল। এই সব বিপ্লবী, খাঁটি কৃষক-সন্তানেরা ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির শ্রেষ্ঠতম সম্পদ। কমরেড হীরালাল বাইন-এর শৌর্য-বীর্য আর আত্মত্যাগের কাহিনী লিখেছেন বাঙলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীসত্যেন সেন তাঁর 'মেহনতী মানুষ' ও 'গ্রাম-বাঙলার পথে পথে' গ্রন্থদ্বয়ে। সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে কমরেড হীরালাল বাইন-এর ছেলে রামকান্ত বাইন আর তাঁর ভাই সতীশ বাইন বীরের মৃত্যু বরণ করেন। শুনেছি, ছেলের মৃত্যু-সংবাদ শুনে সেদিন কমরেড হীরালাল বাইন বলেছিলেন: 'ওরা এক ছেলেকে মেরে ফেলেছে সেজন্য হীরালাল বাইন দমে যাবে না। তার এক ছেলে গেছে, আরও ছেলে আছে। আর আমার সব ছেলেও যদি যায়, দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষকের ছেলেরা

থাকবে। ওরা তাদের সবাইকে মেরে ফেলতে পারবে না।”

আমার একান্ত পরিচিত এইসব বীর কৃষক-কমরেডদের কথা ভাবতে ভাবতে পার হয়ে গেলাম জলমা-বৈঠকঘাটার খাল। এরপর সরাপপুরের ঘাট। এখানেই নামতে হবে আমাকে। সরাপপুর গ্রাম ছাড়িয়ে মাইল খানেক দূরেই আমার পিতৃ-পিতামহের বাঞ্ছিত ভূমি—কালিকাপুর গ্রাম।

লঞ্চ থেকে নেমেই দেখলাম কয়েকজন ছাত্র-যুবক অপেক্ষা করছেন আমার জন্য। এঁরা কেউ আমার আত্মীয়, কেউ-বা গ্রামের ছেলে। ১৯৩৯ সাল থেকেই আমি গ্রাম-ছাড়া। শুধু ছুটি-ছাটায় আসতাম গ্রামে। বছরে দু-বার কিংবা তিন বার। এবাব আসছি—দীর্ঘকাল পরে। কুশল বিনিময়ের পর ওঁদের সঙ্গে রওনা দিলাম গ্রাম-অভিমুখে।

আমার সেই চিরপরিচিত গ্রাম। এককালে, তিরিশেব দশকে কংগ্রেস-আন্দোলনের তরঙ্গ-ভঙ্গে এখানেও সাড়া জেগেছিল। শৈশবে একবার দেখেছি. বিশ আইন জারী কবে ব্রিটিশ সরকার কিভাবে তছনছ করেছিল গ্রামের সুখ-শান্তি। জ্যাঠামহাশয়ের কোল থেকে আমাকে টেনে ফেলে দিয়ে সশস্ত্র ইংরেজ পুলিশ কী নিদারুণ নিপীড়নে রক্তাক্তদেহ জ্যাঠামহাশয়সহ গ্রামের আরও অনেককে মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল আমার সম্মুখ দিয়ে। তখন আমার সব কথা বুঝবার বয়স নয়। কিন্তু এই বর্বরতা আমার শৈশব-স্মৃতিতে এক স্থায়ী ছাপ এঁকে দিয়েছিল। ছোটবেলা থেকে তাই ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে আমার মনে বাসা বেঁধেছিল এক সহজাত ঘৃণা আব বিতৃষ্ণা।

সেই ঘৃণার ধনুকে টান টান করে ছিলা বাঁধতে অবশ্যই সময় লেগেছিল। চল্লিশের দশকে, বিয়াল্লিশের আগস্ট-আন্দোলনের আগে, আমার গ্রামে যখন কংগ্রেসনেত্রী কমলা দাশগুপ্ত ও বীণা দাশ, খুলনার কংগ্রেসনেতা জ্ঞান ভৌমিক-এর সঙ্গে যাতায়াত শুরুকরেছেন ঠিক সেই সময় আমি আমার অবুঝ মন নিয়ে তাঁদের পিছু পিছু

ঘুরলেও একচল্লিশ সালের শেষেই কিন্তু ভীড়ে পড়লাম ছাত্র ফেডারেশন-এর দঙ্গলে।

তারপর একটু একটু করে কমিউনিস্ট পার্টির কথা জেনেছি। আর ১৯৪৩ সাল থেকেই হয়েছি কমিউনিস্ট পার্টির প্রায় সকল আন্দোলনের সঙ্গী। আমার গ্রামের কংগ্রেসী-দৈত্যকুলে, বলা যায়, আমিই প্রথম কমিউনিস্ট-প্রহ্লাদ। একটি ভালো ছেলে গোল্লায় গেল, এই ছিল আত্মীয় স্বজনদের সখেদ উক্তি।

এবার সেই গ্রাম আমাকে আদরে বুকে টেনে নিল। হিন্দু-মুসলমান, সবাই। মাত্র মাস দেড়েক ছিলাম গ্রামের বাড়ীতে। কিন্তু এই সময় প্রায় প্রতিটি দিন আমন্ত্রিত হয়েছি স্বগ্রাম এবং পাশের গ্রামের অসংখ্য হিন্দু-মুসলমানের বাড়ীতে। কোনো কোনো দিন মা-দিদিমা রাগ করেছেন। বাড়ীর ছেলে ভালো করে বাড়ীর ভাত খেতে পারছে না, তাই তাঁদের ক্ষোভ।

কিন্তু এত সুখ কপালে সইলো না। আবার সময়ের পাগলাঘন্টি বেজে উঠলো। '৯৫৪ সালের ৩০এ মে কেন্দ্রীয় লীগ-সরকার ষড়যন্ত্র করে ভেঙ্গে দিলেন জনাব ফজলুল হক-এর নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকার। ৯২-ক ধারা প্রয়োগ করে পূর্ববাঙালায় জারী করা হলো গভর্নরের শাসন। ৩১এ মে জনাব ফজলুল হক স্বগৃহে অন্তরীণ-বন্দী হলেন। আর, আওয়ামী মুসলিম লীগের সম্পাদক, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার মন্ত্রী, আজকের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেপ্তার করে পাঠানো হলো জেলখানায়। সমগ্র পূর্ববাঙলা জুড়ে শুরু হয়ে গেল ব্যাপক ধরপাকড়। আমাকেও পুলিশ গ্রামের বাড়ী থেকে ২রা জুন পুনবার নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করলো।

পূর্ববাঙলার বুকে আবার আছড়ে পড়লো অস্থির রাজনীতির ঝড়ো-ঝাপটা। আমি গ্রামে থাকায় গভর্নরের শাসন জারী করে যুক্তফ্রন্ট

সরকারকে ভেঙ্গে দেওয়ার সংবাদ যথাসময়ে পাই নি। পরে শুনেছি, শহরের বন্ধুরা আমাকে সতর্ক করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সেই বার্তা আমার গ্রামের বাড়ীতে পৌঁছুবার আগেই পুলিশী-ক্ষিপ্রতার কাছে আমাকে পরাজয় স্বীকার করতে হলো।

জনাব হক-এর যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভাকে কেন্দ্রীয় লীগ-সরকার-যে সহ্য করতে পারছেন না, এটা অনুমান করা কিছু কঠিন কাজ ছিল না। মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার পর তরুণ মন্ত্রী মুজিবর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে হক সাহেব ৩০এ এপ্রিল শুভেচ্ছা সফরে কলকাতায় এসে যে-সব বক্তৃতা করেছিলেন, তাঁর আবেগপ্রবণ বাঙালি মনকে যেভাবে উন্মুক্ত করে দিয়ে বলেছিলেন: "রাজনৈতিক কারণে বাঙলাদেশকে বিভক্ত করা যেতে পারে কিন্তু বাঙালির শিক্ষা-সংস্কৃতি আর বাঙালিত্বকে কোনো শক্তিই কোনোদিন ভাগ কবতে পারবে না, দুই বাঙলার বাঙালি চিরকাল বাঙালিই থাকবে"—তা সংবাদপত্রে পাঠ করে আমি যেমন খুশি হয়েছিলাম তেমনি এই উক্তির যে-প্রতিক্রিয়া মুসলিম লীগপন্থীদের মধ্যে সেদিন লক্ষ্য করেছিলাম তাতে শঙ্কিত না হয়েও পাবি নি। এর পরেই দেখলাম ষড়যন্ত্রের হাত বহুদূব প্রসারিত হয়েছে। ১৪ই কিংবা ১৫ই মে নারায়ণগঞ্জের আদমজি জুট মিলে বাঙালি-অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা-হাঙ্গামা সেই ষড়যন্ত্রেব চূড়ান্ত পরিণতি। ১৭ই মে দেখলাম পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলি (বগুড়া) এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য প্রধানত কমিউনিস্টদের দায়ী করে এক বিবৃতি দিলেন। আর, ৩০এ মে গভর্নর জেনাবেল গোলাম মহম্মদ এই একই অজুহাতে—'কমিউনিস্ট বিশৃঙ্খলা দমনে ব্যর্থ' জনাব ফজলুল হক-এর মন্ত্রীসভা বাতিল করে দিলেন। কমিউনিস্ট জুজুর অজুহাতে যেখানে একটি নির্বাচিত মন্ত্রীসভা বাতিল হয়ে যায়, সেখানে একজন পরিচিত কমিউনিস্ট আর কী করে মুক্ত আলো-হাওয়ার রাজ্যে অবাধে ঘুরে বেড়াতে পারে!

সুতরাং আমার অতিবৃদ্ধা দিদিমা আর অসুস্থ মায়ের পদধূলি মাথায়

নিয়ে এবং তাঁদের চোখের জলে ভাসিয়ে বিদায় নিলাম গ্রাম থেকে। দারোগার পানসি হাওয়ার তোড়ে জোর ছুটে চল্লো। গ্রাম থেকে থানা ৯ মাইল। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম সেখানে।

ডুমুরিয়া থানার অফিস-ঘরে পৌঁছে দেখি ইতিমধ্যে আরও অনেক পাখিকে ধরা হয়েছে খাঁচায় বন্দী করার জন্য। শোভনার কৃষককর্মী কামাখ্যা চৌধুরী আমাকে দেখে হৈ হৈ করে উঠলেন। ভালো করে তাকিয়ে দেখি ধানিবুনিয়ার সেই প্রিয় কৃষক-কমরেড হীরালাল বাইন আর চাঁদমণিদা-ও যথারীতি পৌঁছে গেছেন থানার হাজতে। আরও কয়েকজন নতুন মানুষ এসেছেন বন্দী হয়ে। নতুন যুগের নতুন কর্মী এঁরা। বুঝলাম, সরকারী আয়োজনে ফাঁক নেই কোনো এবং আয়োজনটা বেশ ব্যাপকই।

২রা জুন সন্ধ্যা বেলায় আমরা স্টীমার যোগে পৌঁছুলাম খুলনা শহরে। তারপর গোয়েন্দা বিভাগের জনৈক কর্তার তত্ত্বাবধানে সোজা হাজির হলাম জেলখানায়। গভর্নরী-শাসনে আবার শুরু হলো আমাদের নতুন বন্দী জীবন।

এই দমননীতি সম্পর্কে যেটা আশঙ্কা করেছিলাম, বাস্তবক্ষেত্রে তা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। দু-একদিনের মধ্যেই খুলনার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বন্দী হয়ে এলেন আরও অনেক নতুন নতুন বন্ধু। প্রাক্তন রাজবন্দীদের মধ্যে পুনরায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন ডা. জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল, অতুল দাশ, কামাখ্যা চৌধুরী, হীরালাল বাইন, চাঁদমণি মণ্ডল, নেপাল দাশ, নিখিল ঘোষ প্রমুখ কম্যিউনিস্ট-কর্মীরা। নতুন বন্ধুদের মধ্যে পেলাম গণতান্ত্রিক দলের সভাপতি আব্দুল জব্বার, আইনসভার সদস্য দেবেন দাশ, মুসলিম লীগ-বিরোধী গণ-আন্দোলনের কর্মী আব্দুল খালেক, এনায়েতউল্লা, হীরু, রওনাক আলি, আমজাদ আলি, মীজানুর, ডাঃ খান সাহেব প্রমুখ আরও অনেককে। মুসলিম জনসমাজের মধ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন-যে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে চোখের সামনে এবার তা আরও

ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করলাম।

কিন্তু খুলনা জেলের নরকগুলজার বেশিদিন স্থায়ী হলো না। জুন মাসের শেষ সপ্তাহে আমাদের কয়েকজনকে জেল-কর্তৃপক্ষ পাঠিয়ে দিলেন রাজশাহীর কেন্দ্রীয় কারাগারে। এবারও সারা পথ জুড়ে প্রচণ্ড বৃষ্টি-বাদল আমাদের অভ্যর্থনা জানালো।

রাজশাহী জেল তখন প্রায় কানায় কানায় পূর্ণ। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার আমলে গত দু-মাসে যে-জেলখানা খালি হতে শুরু করেছিল, বিরানব্বইতন্ত্রী গভর্নরের শাসনে, কালাকানুনের বেপরোয়া প্রয়োগে এক মাসের মধ্যেই তা আবার ভরে উঠলো। সমগ্র পূর্ববাঙলায় এই সময় প্রায় দেড় হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে বিনা-বিচারে আটক রাখা হয়। অনেক নেতা ও কর্মী গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এড়াবার জন্য আত্মগোপনে বাধ্য হন।

এই সময় পাকিস্তানে ষড়যন্ত্রের রাজনীতি আরও কদর্যরূপ ধারণ করে। গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদ পূর্ববাঙলায় পাঞ্জাবের সামন্ততান্ত্রিক ও সামরিক প্রভুদের আধিপত্য নিরঙ্কুশ করার জন্য নতুন গভর্নর রূপে পাঠালেন মেজর জেনারেল ইসকান্দার মির্জাকে। আমরা কারারুদ্ধ অবস্থায় খবর পেলাম, ৫ই জুলাই (১৯৫৪) পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছে। দমননীতির দাপটে যে-কমিউনিস্ট পার্টিকে কার্যত বেআইনী করে রাখা হয়েছিল, এবার তা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হলো মাত্র।

গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদ শুধু পূর্ববাঙলায় রাজ্যপালের শাসন প্রবর্তন করেন নি, তিনি চক্রান্ত করে পাকিস্তানের সংবিধান-সংসদও ভেঙে দিয়েছিলেন। সামরিক একনায়কত্ব প্রবর্তনের কাজে এইভাবে অগ্রসর হয়ে জনাব গোলাম মহম্মদ প্রায় এগারো মাস পরে আবার বগুড়ার জনাব মহম্মদ আলিকে নতুন মন্ত্রীসভা গঠনের নির্দেশ দিলেন। পাকিস্তানী রাজনীতিতে এই ভাঙার কাজ যখন চলছিল তখন জনাব সুহ্‌রাবর্দি অসুস্থ হয়ে বিদেশে চিকিৎসার জন্য

চলে গিয়েছিলেন। এগারো মাসের মধ্যে গভর্নর জেনারেলের নির্দেশে বগুড়ার জনাব মহম্মদ আলি মন্ত্রীসভা গঠনের তোড়জোড় শুরু করলেই স্বদেশে ফিরে এলেন জনাব সুহ্‌রাবর্দি। গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদ চাইলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় জনাব সুহ্‌রাবর্দিকে অন্তর্ভুক্ত করতে। আওয়ামী মুসলিম লীগ-নেতৃবৃন্দও জনাব সুহ্‌রাবর্দিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় যোগদানের সম্মতি দিলেন।

এর প্রতিক্রিয়ায় পূর্ববাঙলার রাজনীতিতে সঞ্চারিত হলো নতুন অস্থিরতা। 'কৃষক-শ্রমিক পার্টি'র নেতা জনাব ফজলুল হকও দাবী করলেন তাঁর দলভুক্ত একজনকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় গ্রহণ করার জন্য। সে-দাবীও স্বীকৃত হলো। জনাব আবু হোসেন সরকার মনোনীত হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্যরূপে।

কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে অপ্রত্যাশিত বাধা সৃষ্টি করলেন পাকিস্তানের সর্বোচ্চ আদালত। সংবিধান-সংসদ ভেঙে দিয়ে গভর্নর জেনারেল যেসব আইন ও আদেশ জারী করেছিলেন তা যেহেতু সংবিধান-সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত ও গৃহীত হয় নি, সেইহেতু ঐসব আইন ও আদেশ বাতিল,—এই রায় দিলেন সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিরা। এরি ফলে নতুন গণ-পরিষদ গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পূর্ববাঙলার আইনসভাকেও বাধ্য হয়ে বাঁচিয়ে তুলতে হয়। কারণ, গণ-পরিষদে প্রতিনিধি নির্বাচনের একমাত্র অধিকারী ছিলেন আইনসভার সদস্যগণ।

নব-নির্বাচিত গণ-পরিষদ সদস্যদের মধ্যে মুসলিম লীগ দলভুক্ত সদস্যগণ ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাঁরা নতুন দলনেতা নির্বাচিত করার জন্য মিলিত হলেন। এই নির্বাচনে বগুড়ার জনাব মহম্মদ আলি পরাজিত হন। গণ-পরিষদে মুসলিম লীগের নতুন নেতার পদ অলঙ্কৃত করেন চৌধুরী মহম্মদ আলি। নতুন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মহম্মদ আলি তাঁর মন্ত্রীসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রূপে নিয়োগ করলেন জনাব ফজলুল হককে, বগুড়ার মহম্মদ আলি যাঁকে 'দেশদ্রোহী' ও

'বিশ্বাসঘাতক' বলে বিশ্ব-সমক্ষে অভিযুক্ত করেছিলেন। পাকিস্তানী রাজনীতির এ-এক বিচিত্র খেলা।

যাহোক, জনাব ফজলুল হক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রূপে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করলে তাঁর দলভুক্ত জনাব আবু হোসেন সরকার হলেন পূর্ববাঙলার মুখ্যমন্ত্রী। পূর্ববাঙলায় আবার পরিষদীয় গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত হলো।

আমরা রাজশাহীর কেন্দ্রীয় কারাগারে বসে পাকিস্তানী রাজনীতির এই টানা-পোড়েন সতর্কতাব সঙ্গে লক্ষ্য করছিলাম। এই সময় যেসব মুসলিম তরুণ কাবাগাবে আবদ্ধ ছিলেন তাঁদেব প্রতিও কমিউনিস্ট-বন্দীরা পালন করেছিলেন সত্যিকারেব বাজনৈতিক দায়িত্ব। খুলনার কমিউনিস্ট নেতা কমবেড কুমাব মিত্র, স্বদেশ বসু, সন্তোষ দাশগুপ্ত, বংপুরের কমরেড শান্তি সান্যাল, কুষ্টিযার কমবেড সুধীর সান্যাল, বগুড়ার কমরেড আব্দুল লতিফ, মোখলেসুব বহমান, ফটিক রায়, রাজশাহীর কমরেড প্রণব চক্রবর্তী, অরুণ মুন্সী, চিত্ত চক্রবর্তী, পাবনার আমিমুল ইসলাম (বাদশা) প্রমুখ পুবনো কমিউনিস্ট-বন্দীবা নবাগত তরুণ মুসলিম বন্ধুদেব মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং তাঁদের মানস-জমিন প্রস্তুতিতে সেদিন সাধ্যমতো সাব-জল সিঞ্চনের চেষ্টা করেছিলেন। এই সমযকাব বন্দী তরুণ ছাত্র ও যুবকর্মীদের মধ্যে গাজিউল হক, কামাল লোহানী, রণেশ মৈত্র, শরীফ, কালাম প্রমুখ আরও অনেকেব নাম আমাব মনেব পর্দায ভেসে উঠছে। যতদূর জানি, এঁদেব প্রায় সকলেই আজ পূববাঙলায তথা স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাঙলাদেশে জঙ্গী-নাযক ইয়াহিয়াব ফ্যাশিস্ত বর্বরতার বিরুদ্ধে মবণপণ সংগ্রামে লিপ্ত।

সম্ভবত, ১৯৫৫ সালের জুন মাসে গঠিত হলো জনাব আবু হোসেন সবকার-এর নেতৃত্বে পূর্ববাঙালার নতুন মন্ত্রিসভা। পূর্ববাঙলায় 'অবাধ গণতন্ত্র বিকাশের জন্য' তিনি রাজবন্দীদের মুক্তি প্রদানের সিদ্ধান্তটি ঘোষণা করলেন। জেলখানায় আবার আমবা নড়ে-চড়ে বসলাম।

তারপর ১৯৫৫ সালের ১৯ই জুন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় মুক্তির নির্দেশ-প্রাপ্ত রাজবন্দীদের তালিকায় দেখলাম আমার নামটিও জ্বল-জ্বল করে জ্বলছে। কিন্তু সংবাদপত্রে নাম ঘোষিত হলেও প্রকৃতপক্ষে আমি মুক্তি পেয়েছিলাম আরও ১৮ দিন পরে।

আমলাতান্ত্রিক অপশাসনের এ-এক কলঙ্কময় কাহিনী। পূর্ব-বাঙলার আমলাচক্র যে-কী অসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিল আমার এই বিলম্বিত মুক্তি তারই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ১৯৫৫ সালের ৫ই জুলাই, অর্থাৎ মুক্তির নির্দেশপ্রাপ্ত রাজবন্দীদের তালিকায় আমার নাম ঘোষণার ১৭ দিন পর, আমাকে স্থানান্তরিত করা হলো খুলনা জেলে। ৬ই জুলাই বেলা ১২টার সময় আমাকে ১৭ই জুনের মুক্তির আদেশনামায় সহি করতে বলা হলো কিন্তু সেদিনও আমাকে মুক্তি দেওয়া হয় নি। পরের দিন, ৭ই জুলাই আমাকে মুক্তি দেওয়া হয়, কিন্তু জেল-গেটেই আমার উপর জারী করা হয় গ্রামে অন্তরীণ থাকার এক আদেশনামা।

আমলাতন্ত্রের এই বেআইনী ঔদ্ধত্যকে মৌলিক অধিকার ও গণতন্ত্র হত্যার এই ঘৃণ্য কার্যক্রমকে আমি সেদিন নীরবে গ্রহণ করতে পারি নি। গ্রামে পৌছেই অন্তরীণ আদেশটি অবিলম্বে প্রত্যাহারের জন্য আমি ৯ই জুলাই জেলা-শাসকের কাছে দাবী জানাই; আর সমস্ত ঘটনা পূর্ববাঙলার জনগণের কাছে প্রকাশ করার জন্য অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও তিক্ত ভাষায় দৈনিক 'সংবাদ'-সম্পাদকের কাছে পাঠাই এক দীর্ঘ খোলা চিঠি। মুখ্যমন্ত্রী জনাব আবু হোসেন সরকার-এর কাছেও ১৯৫৫ সালের ২১এ জুলাই এক চিঠি পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করি: '...এই কি আপনার গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা ?...পূর্ববাঙলার মাটিতে জন্মেছি বলে কি সব অত্যাচার-অনাচার মুখ বুজে সহ্য করতে বলেন আমাকে ?' চিঠিতে 'গণতন্ত্রের এই প্রহসন' বন্ধ করার জন্যও তাঁর কাছে আমি দাবী জানাই।

দৈনিক 'সংবাদ'-এ আমার সেই চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল এবং

মুখ্যমন্ত্রী জনাব আবু হোসেন সরকার-এর নির্দেশে তাঁর সচিব সমস্ত ঘটনাটি তদন্ত করার আশ্বাস জানিয়েও আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন এক চিঠি।

এর পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। মুখ্যমন্ত্রীর সচিব আশ্বাস দিলেও অন্তরীণ আদেশ প্রত্যাহৃত হয় নি। ফলে, অন্তরীণ-আদেশের নির্দেশ অনুযায়ী আমাকে সপ্তাহে একদিন, প্রতি রবিবার, ডুমুরিয়া থানায় স্বশরীরে হাজিরা দিতে হতো। বর্ষাকাল। ডাঙ্গা-পথে এ-সময় যাতায়াত করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। বাধ্য হয়ে আমাকে প্রতি রবিবার নৌকো-মাঝি সংগ্রহ করে গ্রাম থেকে ৯ মাইল দূরের থানায় হাজিরা দিতে হয়েছে। এইভাবে আমাকে পঙ্গু করে রাখতে চেয়েছিল পূর্ববাঙলার তৎকালীন আমলাচক্র।

১৯৫৫ সালের আগস্ট মাসের শেষে আমি গুরুতর আন্ত্রিক পীড়ায় আক্রান্ত হই। গ্রামের ডাক্তার সুচিকিৎসার জন্য আমাকে অবিলম্বে শহরের হাসপাতালে পাঠাবার পরামর্শ দিলেন। এদিকে অন্তরীণের আদেশ বলে জেলা শাসকের বিনানুমতিতে গ্রাম-ছাড়া নিষেধ। জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আমি অন্তরীণ আদেশ ভঙ্গ করলাম, আত্মীয়-স্বজনের সহযোগিতায় পৌঁছালাম শহরের হাসপাতালে। খবর পেয়ে ছুটে এলেন গণতান্ত্রিক দলের নেতা জব্বার সাহেব, ফেরদৌস ভাই, আইনসভার সদস্য দেবেন দাশ আর অতুলদা। তাঁরা আমার সুচিকিৎসার জন্য সেদিন যা করেছিলেন, জীবনে কোনোদিন তা ভুলতে পারবো না।

দিন পনেরো হাসপাতালে থেকে সুস্থ হলাম। আবার ফিরে গেলাম গ্রামের অন্তরীণ-জীবনে। এভাবে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দিন কাটাতে আর ইচ্ছে করলো না। জেলা-শাসককে লিখলাম, পশ্চিমবঙ্গে যেয়ে চিকিৎসা করাবার জন্য আমাকে পাশপোর্ট-ভিসার ব্যবস্থা করে দিতে। এ ব্যাপারে তিনি সম্মতি প্রদান করলেন কিন্তু পাশপোর্ট-ভিসার জন্য আমাকে যথাস্থানে আবেদন পেশ করতে

অনুরোধ জানালেন। অবশেষে পাশপোর্ট-ভিসা সংগৃহীত হলো। ১৯৫৫ সালের অক্টোবরে আমি আমার জন্মভূমির মায়া কাটিয়ে চলে এলাম আমার বর্তমান স্বদেশভূমি এই পশ্চিম বাঙলায়। আমি হেরে গেলাম।

কী মোহিনী মায়ার টানে এখানে এসেছিলাম, আজও জানিনে তা। এখান থেকেই দেখেছি, আমার পূর্ববাঙলার মানুষের সংগ্রামী-চেতনা দিনের পর দিন কত প্রখর হয়েছে। ৯৫৮ সালে আয়ুবশাহী মিলিটারী-ফাঁস হাতে নিয়ে এসেছে। কিন্তু দেখেছি, ১৯৬১ সালে আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে ঢাকায় সংগ্রামী ছাত্রদের তুমুল বিক্ষোভ-মিছিল। ১৯৬৪ সালে দেখেছি, দাঙ্গা বিরোধী অভিযানে মানবিকতার সপক্ষে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের এক অতুলনীয় ভূমিকা। এখানে বসেই শুনেছি, ভাবী বাঙলার স্বাধিকার অর্জনের জন্য ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের ছ-দফা দাবীর বজ্র নির্ঘোষ। আর দেখেছি, মিথ্যা আগরতলা-ষড়যন্ত্র মামলার জাল ছিন্ন করে ১৯৬৯ সালে শ্রমিক-কৃষক মধ্যবিত্ত-ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ শক্তি কেমন করে ছিনিয়ে এনেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে এবং পূর্ববাঙলার কিংবদন্তীর নায়ক মণি সিং সহ কারারুদ্ধ সকল রাজবন্দীকে। ১৯৭০ সালে দেখলাম, আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব আর নজীর বিহীন নির্বাচনী সাফল্য। বিচারপতি থেকে বাবুর্চি পর্যন্ত সকল স্তরের মানুষের ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলনও দেখলাম এই সেদিন, ১৯৭১ সালে। দেখলাম, একজন গণতান্ত্রিক নেতা ইতিহাসের হাত ধরে কেমন করে জনগণমন-অধিনায়ক হয়ে উঠলেন। দেখলাম, জঙ্গী জল্লাদ ইয়াহিয়ার কামান-বন্দুক-ট্যাঙ্ক-বেয়োনেট উপেক্ষা করে, রক্তের বন্যায় ভাসতে ভাসতে ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল কিভাবে ভূমিষ্ঠ হলো আমার জন্মভূমির চির-আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাঙলাদেশ

সরকার। আমি নিশ্চিত জানি, ইতিহাসের অনিবার্য নিয়মে জঙ্গী-জল্লাদ ইয়াহিয়াকে হটতে হবে। আমার জন্মভূমি পূর্ববাঙলা, আজকের স্বাধীন বাঙলাদেশ, আমি জানি, যতদিন প্রয়োজন ততদিন রক্তের ঋণ রক্ত দিয়েই শোধ করবে।

স্মৃতি হয়তো প্রতারণা করে অনেক সময়। কিন্তু আমার স্মৃতিময় বাঙলাদেশ—তার অবারিত মাঠ, সবুজ-সোনায় মোড়া শস্যের সমুদ্র, দুরন্ত যৌবনা নদীর শিরাবহুল বিশালতা, ধূ-ধূ বিস্তৃত বালুচর, কাশের গুচ্ছ, বজ্র-বিদ্যুতের আকাশ-নৃত্য, আর সব চেয়ে শক্তিধর সংগ্রামী মানুষ—এরা কোনোদিনই প্রতারণা করবে না। এই বিশ্বাসেই বেঁচে আছি এবং বেঁচে থাকবো।

———

পরিশিষ্ট

স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলাদেশের মুক্তি-যোদ্ধারা আমাদের ঘরে ঘরে ডাক পাঠিয়েছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের স্বৈরাচারী সমরতন্ত্র ষড়যন্ত্র করে ২৫এ মার্চ মধ্যরাত্র থেকে নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে শোষণ আর অপশাসনে জর্জরিত বাঙলাদেশের মুক্তিকামী গণতন্ত্রপ্রিয় সাড়ে সাতকোটি মানুষের উপর। কি এঁদের অপরাধ? এঁরা চেয়েছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের একচেটিয়া পুঁজিপতি-আমলাতন্ত্র-সমরচক্রের মিলিত শোষণের হাত থেকে মুক্তি। কি এঁদের অপরাধ? এঁরা চেয়েছিলেন বর্বর সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে সার্বজনীন ভোটাধিকারে নির্বাচিত দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জন-প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সরকারের হাতে শাসনভার তুলে দিতে। কি এদের অপরাধ? এঁরা চেয়েছিলেন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের সত্যিকার অধিকার। এঁরা চেয়েছিলেন সামরিক শাসনে ধূলায় লুণ্ঠিত গণতন্ত্রের পতাকাটিকে মানব-মহিমায় রঙিন করে ঊর্ধ্বাকাশে তুলে ধরতে। শুধু মাত্র এই অপরাধেই বাঙলাদেশের সাড়ে সাতকোটি বাঙালির উপর নেমে এসেছে সমরনায়ক ইয়াহিয়ার ফ্যাশিস্ত বর্বরতা। লক্ষ লক্ষ মুক্তি-যোদ্ধার রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে স্বাধীন বাঙলার শহর-গঞ্জ-প্রান্তর।

কে বলে একে গৃহযুদ্ধ? কে বলে একে বিচ্ছিন্নতাকামী মানুষের সাময়িক বিস্ফোরণ? নয়া ঔপনিবেশিকতাবাদী-সমরতন্ত্র তার গণতন্ত্রের মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে এ-যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে একটা সমগ্র জাতির উপর। পাকিস্তানের সংখ্যা-গরিষ্ঠ বাঙালি জাতি কোনোদিন বিচ্ছিন্ন হতে চায় নি। বাঙলাকে ন্যায়সঙ্গত স্বাধিকারের দাবী থেকে বঞ্চিত করার জন্য সংখ্যালঘিষ্ঠ পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থের জঙ্গীচক্রই বরং জোর করে বিচ্ছিন্ন করে নিতে চাইছে পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গণতন্ত্রপ্রিয় সংগ্রামী জনগণকে। এবং তাই তাদের এই বে-পরোয়া মরীয়া আক্রমণ।

আমাদের দেশের সরকার কি চোখে এই ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ করছেন তা আমাদের অজানা। আন্তর্জাতিক নানা বিধিবিধান ও কূটনৈতিক শিষ্টাচারে তাঁদের হাত-পা হয়তো অনেকখানি বাঁধা। তাই তারা উদ্বিগ্ন কিন্তু এখনও

সতর্ক পদক্ষেপপন্থী। কিন্তু স্বাধীন বাঙলাদেশের মুক্তি-যোদ্ধারা বিশ্বের দরবারে তাঁদের এই সংগ্রামকে সঠিক ভাবেই তুলে ধরেছেন। এই মুক্তি-যুদ্ধের মহানায়ক, আপোষহীন জাতীয়তাবাদী নেতা শেখ মুজিবর রহমান শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-বুদ্ধিজীবী, সমাজের সকল অংশকে ঐক্যবদ্ধ করে এক ঐতিহাসিক সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে নির্ভীক কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন: 'আমরা কুকুর-বিড়ালের মতো মরবো না, বাঙলা মায়ের সুযোগ্য সন্তানের মতো লড়াই করেই মরতে চাই।'

এরপর যা অবশ্যম্ভাবী তাই ঘটছে। ফ্যাশিস্ত সমর-দানব ইয়াহিয়া খানের জল্লাদ-বাহিনীর কামান-বন্দুক-মেশিনগান আর বোমার আঘাতে মুক্তি-যোদ্ধা আর নিরস্ত্র সংগ্রামী জনতার বিদীর্ণ দেহগুলি লুটিয়ে পড়ছে ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, খুলনা, যশোহর, কুমিল্লা, রংপুর, শ্রীহট্টের শহরে-বন্দরে। এর কোনো হিসেব নেই। অসংখ্য অগণিত এই মৃতদেহ। দশ হাজার—বিশ হাজার—এক লাখ, পাঁচ লাখ। কেউ জানে না মৃত মানুষের সংখ্যা। হয়তো অনেক বেশি। স্পষ্ট গণহত্যা। মানবদ্রোহী শয়তান সামরিকচক্রের এটা শেষ মরীয়া কামড়। কড়া বিধি-নিষেধের বেড়াজাল ডিঙিয়ে খবর এসেছে ট্যাঙ্কে আর বোমায় বিধ্বস্ত অগণিত জনপদ। হাসপাতাল উড়ে গেছে, ধ্বংস হয়েছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান—বাঙালি জাতির গর্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানেই না একদিন প্রকাশিত হয়েছিল 'বাঙলার ইতিহাস'? এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারেই না একদিন পদচারণা করেছেন 'বোস-আইনস্টাইন থিয়োরী'র অন্যতম জনক বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু। এখানেই না একদিন অধ্যাপনায় রত ছিলেন বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার? এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেই না মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ মানবমহিমায় দীপ্ত ডঃ শহীদুল্লাহ্ আর ডঃ আবদুল হাই? এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত অধ্যাপকদের পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ প্রেরণাতেই না গড়ে উঠেছিল পূর্ব-বাঙলার প্রগতিসাহিত্য আর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিস্তৃত পটভূমি? সামরিক-চক্রের পৈশাচিক নৃশংসতায় সেই বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাঙ্গণ আজ কলুষিত। ফ্যাশিস্তরা যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির শত্রু, এই সত্তরের দশকেও তা পুনর্বার প্রমাণিত হলো।

আমরা রাজনীতির কূট তর্ক বুঝি না। কিন্তু স্পষ্টভাবে বলতে চাই, যে-বীর গণতন্ত্রীরা ১৯৫২ সালে বাঙলা ভাষার সম্মান রক্ষার জন্য ঢাকার রাজপথে রক্ত ঢেলে সেই ভাষাকে রাষ্ট্র-ভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন, তাঁরা আমাদের

ভাই। যে-বাঙলাদেশের মানুষ রবীন্দ্র-নজরুলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার দাবী করেন, তাঁরা আমাদের প্রাণের সহোদর। যে-মুক্তিযোদ্ধারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামে অবতীর্ণ, তাঁরা আমাদের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ সহযোদ্ধা। সুতরাং পরিষ্কার বিবেক নিয়ে মানবতার শত্রু, সভ্যতা ও সংস্কৃতির শত্রুদের বিরুদ্ধে আজ তাঁরা যখন মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত, তখন তাঁদের পাশে আমাদের দাঁড়াতে হবেই।

ফ্যাশিস্ত জল্লাদের গণহত্যার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাতে কোন্ বিবেকবান মানুষ দ্বিধাবোধ করবেন? যদি স্বাধীন বাঙলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের সেই আহ্বান জানান তবে অস্ত্রহাতে তাঁদের পাশে দাঁড়াতেই বা বাধা কোথায়? ১৯৩৬ সালের ১৮ই জুলাই স্পেনের প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য যখন হিটলার-মুসোলিনীর বলে বলীয়ান ফ্যাশিস্ত ফ্রাঙ্কো তার মুর সৈন্যদের নিয়ে আক্রমণ শুরু করে তখন কি আন্তর্জাতিক বাহিনীতে যোগ দেন নি সারা বিশ্বের বিবেকবান মানুষ—শিল্পী-সাহিত্যিক, অভিনেতা-সুরকার, ছাত্র-যুবক, শ্রমিক-কৃষক—সব স্তরের প্রায় চল্লিশ হাজার নর নারী?

আমি তো ইতিহাসের পাতায় স্পষ্ট দেখছি—ফ্যাশিস্ত ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, চেক, সুইস, হাঙ্গেরিয়ান, বুলগেরিয়ান, ইতালীয়ান, সার্ব, মেকসিকান, মিশরী, আরবী, তুর্কি এমনকি ইন্দোচীনের মানুষেরও সেই আন্তর্জাতিক বাহিনীতে যোগদানের কাহিনী।

যাঁরা মানবতার বিবেক, সেই শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরাও তাঁদের কাগজ-কলম, রঙ-তুলি-ইজেল, পিয়ানো-ভায়োলিন-গীটার সাময়িকভাবে দূরে সরিয়ে রেখে হাতে তুলে নিয়েছিলেন রাইফেল ও সঙ্গীন। রণক্ষেত্রে লড়াই করে, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও গণতন্ত্রকে ফ্যাশিস্ত দস্যুদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সেদিন প্রাণ দিয়েছিলেন বিশ্ববিখ্যাত কবি ফ্রেদারিকো গার্সিয়া লোর্কা, বিখ্যাত সুরকার ও বেহালাবাদক পাব্লো কসালস্। ইংলণ্ডে গঠিত 'শাক্লত-ওয়ালা কলাম'-এ যোগ দিয়ে সেদিন স্পেনের রণক্ষেত্রে ছুটে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন প্রখ্যাত নারী-ভাস্কর ফেলিসিয়া ব্রাউন, তরুণ মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী র‍্যালফ ফক্স, ক্রিস্টোফার কড্ওয়েল প্রমুখ আরও অনেক শিল্পী-সাহিত্যিক। আন্তর্জাতিক বাহিনীতে যোগ দিয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক আঁদ্রে মাল্রো, আঁদ্রে মার্তি, জেনারেল লুকাস্ এবং বিশ্ব-বন্দিত মার্কিন সাহিত্যিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে।

আর সেদিনের পরাধীন ভারত কি চুপ করে বসেছিল? ইতিহাস অন্তত সে-সাক্ষ্য দেয় না। ব্রিটিশ সরকার ভারতের মানুষকে আন্তর্জাতিক বাহিনীতে যোগদানের অনুমতি না দিলেও ভারত জুড়ে এই ফ্যাশিস্ত বর্বরতার বিরুদ্ধে সেদিন আন্দোলনের জোয়ার বইয়ে দিয়েছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দসহ শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকের দল।

ফ্যাশিস্ত দস্যুর পৈশাচিক তাণ্ডবলীলা প্রতিহত করার জন্য মানব-প্রেমিক রোলাঁর ঐতিহাসিক আবেদনটি ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়্যু'-র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের হাতে এসে পৌঁছালো এবং সেই আবেদনটি (২০এ নভেম্বর, ১৯৩৬ সালে রচিত) বাঙলাদেশের সংবাদপত্রে ১৯৩৭ সালের ১৭ই জানুয়ারী প্রকাশিত হলো, তখন সারা দেশ-জুড়ে জাগলো এক অপূর্ব সাড়া। মহান রোলাঁ বিশ্বের সৎ-শুভবুদ্ধি সম্পন্ন গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে ডাক দিয়ে বল্লেন:

"মাদ্রিদের ধূমায়িত প্রস্তরস্তূপ হইতে আর্তের ভয়ার্ত ক্রন্দন উঠিতেছে। যে গর্বিতা নারী এককালে অর্ধজগতের অধিশ্বরী ছিল এবং যাহা আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার এক আলোকোজ্জ্বল কেন্দ্র-- আজ আফ্রিকার মুর এবং 'বিদেশী বাহিনী' আসিয়া তাহা অগ্নিতে দগ্ধ করিতেছে ও রক্তের প্লাবন বহাইতেছে।...

"মনুষ্যত্ব! মনুষ্যত্ব! আজ তোমার দ্বারে আমি ভিখারী। এস, স্পেনকে সাহায্য কর! আমাদের সাহায্য কর! তোমাদের সাহায্য কর! কেননা তুমি আমি সকলেই আজ বিপন্ন! ...

"সময় নাই! অতি দ্রুত প্রস্তুত হও! উঠ, জাগ, কথা বল, চীৎকার কর, কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও!...."

মনুষ্যত্বের দ্বারে মহান 'ভিখারী' রোলাঁর এই আহ্বান সেদিন পরাধীন ভারতেও ব্যর্থ হয় নি। 'সময় নাই, অতি দ্রুত প্রস্তুত হও'—ফ্যাশিস্ত দুশমনের বিরুদ্ধে এই ডাকে সেদিন দ্রুত সাড়া দিয়েছিলেন আমাদের মহত্তম সন্তান, মানবতার শ্রেষ্ঠতম পূজারী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩৭ সালের ৩রা মার্চ 'মানবতার বিবেকের কাছে' এক উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছিলেন: "....স্পেনের জনগণের এই ঘোরতর অগ্নিপরীক্ষার দিনে ও দুঃসময়ে স্পেনীয় জনসাধারণ ও জনসাধারণ-প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্রকে সাহায্য করিবার জন্য, অযুতকণ্ঠে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য এবং গণতন্ত্রের সাহায্যার্থ ও সভ্যতার পুনরুদ্ধার-

কল্পে অগ্রসর হইবার জন্য আমি মানবতার নামে দেশের লক্ষ লক্ষ নর নারীকে আহ্বান করিতেছি।”

একদিন যে-ফ্যাশিস্ত বর্বরতার বিরুদ্ধে স্বদেশ ও বিদেশের বরেণ্য সন্তানেরা দলমত নির্বিশেষে মিলিত হয়েছিলেন, প্রসারিত করেছিলেন তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতার হাত, আজ ঘরের দুয়ারে অন্য এক ফ্যাশিস্ত বর্বরতার বিরুদ্ধে যখন সর্বস্ব পণ করে লড়ছেন সেই একই মুক্তিকাম মানুষ, তখন কি আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবো?

না, এ হতে পারে না। বরং পরাধীন ভারতে আমরা যা পারিনি, স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে এবার আমরা তাই-ই করতে চাই। প্রয়োজন হলে এবং স্বাধীন বাঙলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের ডাক দিলে তাদের মুক্তি-সংগ্রামে আমরাও শামিল হতে চাই।

আমি বিশ্বাস করি, স্পেনের গণতন্ত্রীদের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন, জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে চীনের জনগণকে মেডিক্যাল মিশন পাঠিয়ে যাঁরা সাহায্য করেছিলেন, ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে যাঁরা গর্জন করে উঠেছেন —গণতন্ত্রের ঐতিহ্যবাহী আমার স্বদেশভূমির সেই প্রবীণ ও নবীন সহযোদ্ধারা আজ স্বাধীন ও সার্বভৌম বাঙলার ডাকে নিশ্চিত সাড়া দেবে।

ইতিহাসের নতুন পরিপ্রেক্ষিতে আজ যখন পাকিস্তানের জঙ্গী-চক্র একটি সমগ্র জাতির সভ্যতা সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে উদ্যত, তখন মহান রোলাঁর প্রতিধ্বনি করেই আমি পুনর্বার বলি। স্বাধীন বাংলাদেশ ডাক পাঠিয়েছে। সময় নেই। অতি দ্রুত প্রস্তুত হও। উঠে দাঁড়াও, কথা বলো, হুংকার করো, সক্রিয় কর্মপন্থায় অবতীর্ণ হও। জয় স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলাদেশ

চারু ফকীরচাঁদের কথা শুনতে পাচ্ছে না। ফকীরচাঁদ নিজেকে বড় অসহায় ভাবল--এই দুর্দিনে সে যেন আরও স্থবির হয়ে যাচ্ছে, চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলছে, ক্রমশ জীবন থেকে সোনার আপেলের স্বপ্ন ফুরিয়ে যাচ্ছে। এত বেলা হল, তখনও পেট নিরন্ন, সামনের হোটেলটাতে এখন গিয়ে দাঁড়ালে চারু নিশ্চয়ই কিছু পেত, কারণ শেষ খদ্দের ওদের চলে যাচ্ছে। ফকীরচাঁদ অভিমানে নিজেই উঠে যাবার জন্য দাঁড়াতে গিয়ে প্রথম পড়ে গেল, পরে হেঁটে হেঁটে রেঁস্তোরার সামনে ২খন উপাসনার ভঙ্গীতে মাথা হেঁট করে দাঁড়াল, যখন করুণাই একমাত্র জীবন ধারণের সম্বল এবং আর কিছু করণীয় নেই এই ভাব —তখন সে দেখল সব সোনা রূপোর পাহাড় আকাশে। আকাশ গুড় গুড় করে উঠল, মেঘে মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে আর বাতাস পড়ে গেল, দরজা জানালা খুলে গেল এবং বৃষ্টির জন্য সর্বত্র কোলাহল উঠছে।

আর তখনই চার্চের দরজাতে শববাহী শকট মাঠের মসৃণ ঘাস পার হয়ে অন্য এক ইচ্ছার জগতে উঠে যাচ্ছে। ফুটপাথ ধরে অজস্র যাত্রী—গুণে শেষ করা যায় না, ফকীরচাঁদ অন্তত সময়ের প্রহরী হিসেবে গুণে শেষ করতে পারছে না। বাস ষ্ট্যাণ্ডে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা পর্যন্ত কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করল কারণ দীর্ঘ সময় এই অনাবৃষ্টি···ফলে এই নগরীর দূরতম প্রান্ত আর দূরের মাঠ ঘাস সবাই ক্লিষ্ট—সকলে দরজা জানালা খুলে বৃষ্টির জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকল। ফকীরচাঁদ একটু বৃষ্টিতে ভেজার জন্য পথে গিয়ে বসল। আজ অফিস পাড়ায় এই বৃষ্টি উৎসবের মত। সকলে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির জন্য মাঠে এবং ফুলের ভেতর ছুটোছুটি করছিল।

এবং পাগল যে শুধু হাঁকছিল, 'দুঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্দুর', সে শুধু হাঁকছিল, 'কে আসবি আয়, সংক্রান্তির মাদল বাজছে আয়'—সে এখন কিছু না হেঁকে শান্ত নিরীহ বালকের মত অথবা কোন কৈশোর জীবনের স্মৃতিকে স্মরণ করে আকাশে মেঘের খেলা দেখছিল। আর পাগলের পাখির পালক তখন লাঠি থেকে উড়ে গেল—পাগল পালকের জন্য ঝড়ের সঙ্গে ছুটছে।

পাগলিনী নিভৃতে ট্রাম ডিপোর বাইরে লোহার পাইপের ভিতর শুয়ে বৃষ্টির খেলা দেখছিল। সে নখে দাঁত খুঁটছে। পাগলকে ছুটতে দেখে খপ করে পাগলের পা চেপে ধরল এবং বলল, 'গ্যাখ কেমন বৃষ্টি আসছে।'

'হায় আমার পাখি উড়ে গেল, বৃষ্টি দেখে পাখি উড়ে গেল…' পাগল হাউ হাউ করে কাঁদছে।

দীর্ঘদিনের উত্তাপ, অনাবৃষ্টি বৃষ্টির জলে ভেসে গেল। পাগল বৃষ্টি দেখে পালকের কথা ভুলে গেছে। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টির জল ওদের শরীরে মুখে পড়ল। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি হচ্ছিল। চারু ওর ক্লিষ্ট চেহারা নিয়ে কোন রকমে দৌড়ে ফকীরচাঁদের কাছে চলে এল। বৃষ্টির ফোঁটা হীরের কুচির মত ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। পথের যাত্রীরা যে যার মত গাড়ি-বারান্দায়, বাস ষ্টপের সেডে এবং দোকানে দোকানে সাময়িক আশ্রয়ের জন্য ঢুকে গেল—ওরা সকলেই যেন প্রাচীনকাল থেকে কোন বিস্তীর্ণ কবরভূমি হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত—ওরা সবুজ শস্যকণা এই বৃষ্টির জলে এখন ভাসতে দেখল।

পরদিন ভোরে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় বড় বড় হরফে 'কলকাতায় বছরের প্রথম বর্ষণ' এই শীর্ষকে প্রবন্ধ এবং ঠিক প্রথম পাতার ওপরে বড় এক ছবি, আর যুবতী নারী জলের ফোঁটা মুখে চন্দনের মত মেখে নিচ্ছে। অথবা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের ছবি, দুর্গের বুরুজে জালালী কবুতর উড়ছে।

বৃষ্টি সারারাত ধরে হয়েছে। কখনও টিপ টিপ কখনও ঘোর বর্ষণ এবং জোরে হাওয়া বইছিল। ভোরের দিকে যখন কর্পোরেশনের গাড়ি গলা জলে নেমে ম্যানহোল খুলে দিচ্ছিল, যখন ট্রাম-বাস বন্ধ, যখন বৃষ্টির জন্য ছাতার পাখিরা কলকাতার মাঠ পার হয়ে গঙ্গার পাড়ে, অথবা হুগলী নদীর পাড়ে পাড়ে সব চটকলের বাবুরা বাগানে ফুলের চারা পুঁতে দিচ্ছিল তখন বৃদ্ধ ফকীরচাঁদ কলকাতায় গলা জল থেকে আকাশ দেখল। পাশে চারু। সে পেটের নিচে হাত দিয়ে

রেখেছে—ভয়, নিচে যে সন্তান জন্মলাভ করছে, ঠাণ্ডায় ওর কষ্ট না হয়।

পাতলা প্লাইউডের ঘর এখন জলের তলায়। মরা ইঁদুর ভেসে যাচ্ছিল জলে। জানালায় যুবক যুবতীর মুখ—ওরা বৃষ্টির জলে হাত রেখে বড় বড় হাই তুলছিল। কিছু টানা রিক্স চলছে, ট্রাম রাস্তার ওপরে যেখানে জল কম, যেখানে একটা মরা কুকুর পড়ে আছে টানা রিক্সগুলো সেই সব পথ ধরে প্রায় হিক্কা তোলার মত এগুচ্ছে। এই বর্ষায় পীচের পথ সব ভগ্নপ্রায়, মাঝে মাঝে ভয়ানক ক্ষতের মত দাগ, সুতরাং রিক্স চলতে গিয়ে ভয়ঙ্কর টাল খাচ্ছে। বর্ষার জলে পথ ভেসে গেছে বলে সুখী লোকেরা কাগজের সব নৌকা জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। চারু এবং বৃদ্ধ ফকীরচাঁদ সারারাত জলে ভিজে ভিজে শীতে কাঁপছিল। অন্য ডাঙার সন্ধানে যাওয়ার জন্য ওরা গলা জলে নেড়ী কুকুরের মত সাঁতরাচ্ছিল। ওরা আর পারছে না। গভীর রাতে যখন বর্ষণ ঘন ছিল, যখন কেউ জেগে নেই, যখন পথের আলো মৃত জোনাকীর মত আলো দিচ্ছে···চারু অসীম সাহস বুকে নিয়ে ডাঙা জমির জন্য সর্বত্র বিচরণ করতে করতে সামনের চাচ এবং রাজাবাজারের ডিপোতে অথবা জলের পাইপগুলো অতিক্রম করে অন্য কোথাও····চারু পরিচিত সব স্থান খুঁজে এসেছে, ডাঙা জমির কোথাও একটু সে ছাদ খুঁজে পায়নি।

ওরা সাঁতার কেটে ওপারে এসে উঠতেই দেখল বৃষ্টি ধরে আসছে। আকাশের গুমোট অন্ধকারটা নেই এবং কিছু হালকা মেঘ দেখা যাচ্ছে। এ-সময়ে সেই পাগল পুরোপুরি নগ্ন। ভিজে জামাকাপড় গায়ে রাখতে সাহস করছে না। চারু পাঁচিলের সামনে শরীর আড়াল করে কাপড় চিপে নিল এবং ফকীরচাঁদের কাপড চিপে দিল। ফকীরচাঁদ শীতে ক্রমশ আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পাগলিনী জলের পাইপের ভেতর শুয়ে থেকে শুকনো হাড় চুষে চুষে শীতের কষ্ট থেকে রেহাই পাচ্ছে। ওর সব বসনভূষণ পাইপের ভিতর যত্ন করে রাখা। পাগল কিছু কাগজ সংগ্রহ করে মুণ্ডমালার মত

কোমরের ধারে ধারে ধারণ করে যেন কত কষ্টে লজ্জা নিবারণ করছিল। আকাশে হালকা মেঘ দেখে এবং আর বৃষ্টি হবে না ভেবে ঠিক টাকি হাউসের সামনে বাঁ হাত কোমরে অথবা সামনে ··তেরে কাটা ধিন এই সব বোলে পাগল হামেশাই নাচছে—কলকাতা বৃষ্টির জলে ডুবে গেল, আমার পাখি উড়ে গেল ·াতাসে। পাগল এই সব গান গাইছিল।

চারু পাগলের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল এবং একটু ঠেলে দিয়ে বলল, 'এই তুই ফের নেংটো হয়েছিস! তুই ভারি অসভ্য।' বলে খিল খিল করে হেসে উঠল. ফকীরচাঁদ পাঁচীলের গোড়ায় বসে রয়েছে। সে হাসতে পারছে না। থেকে থেকে কাসি উঠছে এবং চোখ ক্রমশ ঘোলা দেখাচ্ছিল। আকাশের মেঘ হাল্কা, হয়ত আর বৃষ্টি হবে না। ফের ট্রাম বাস চলতে স্রুরু করবে অথবা এই সব সারি সারি ট্রাম বাস উটের মত মুখ তুলে 'দীর্ঘ উ টি আছে ঝুলে' বলে সারাদিন মুখ থুবড় থেমে থাকবে। ফকীরচাঁদ শীত তাড়াবার জন্য কাতরভাবে শৈশবের 'অ য় অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে, ইঁদুর ছানা ভয়ে মরে—যা বৃষ্টি শালা কোন ইঁদুরের ছানাকে আর বেঁচে থাকতে হচ্ছে না।' সে দেয়ালে এ-সময় কি লেখার চেষ্টা করল কিন্তু বাতাসে আদ্রর্তা ঘন বলে কোন লেখা ফুটে উঠল না।

ফকীরচাঁদ রোদের জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকল। ফুটপাথ থেকে জল নেমে যাচ্ছে! ট্রাম বাস ফের চলতে স্রুরু করেছে এবং দুপুরের দিকে আকাশ যথার্থই পরিষ্কার—মনে হচ্ছে বৃষ্টি আর হবে না, যেন শরৎকালীন হাওয়া দিচ্ছে। বৃদ্ধ এ-সময় চারুকে পাশে নিয়ে বসল। রোদ উঠবে ভেবে সে চারুকে জীবনের কিছু সুখ দুঃখের গল্প শোনাল। ভিজে কাপড় শরীরে থেকে থেকে শুকিয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় জল কমে গেছে—বৃদ্ধ এবার উঠে দাঁড়াল এবং এক মগ চা এনে পরস্পর ভাগ করে খেল। বৃষ্টি আর আসছে না, বৃদ্ধ অনেকদিন

আগের কোন গ্রাম্য সঙ্গীত মিন্‌মিনে গলায় গাইছে। সে তার স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তির ভিতর থেকে একটা ভাঙা এনামেলের থালা বের করে রেস্তোরা অথবা কোন হোটেলের উদ্বৃত্ত এবং উচ্ছিষ্ট অন্নের জন্য বের হয়ে গেল। জীবনটা এ-ভাবেই কেটে যাচ্ছে—জীবনটা রাজবাড়ির সদরে ঝুলানো এক হাত গণ্ডারের ছবির মত—মাথা সব সময় উঁচিয়েই আছে।

কিন্তু কিসে কি হল বলা গেল না। সমাজের সব ধূর্ত শেয়ালদের মত আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে গেল। ফের বৃষ্টি—বর্ষাকাল এসে গেল। বৃষ্টি ঘন নয় অথচ অবিরাম। ফকীরচাঁদের বসবাসের স্থানটুকু ভিজে গেছে। পাগল পাগলিনীকে আর এ-অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে না। ফকীরচাঁদ উচ্ছিষ্ট অন্ন খেতে খেতে হাঁ করে থাকল—কারণ আকাশের অবস্থা নিদারুণ, আজ সারাদিন বৃষ্টি হবে··· উত্তাপের জন্য ওর ফের কান্না পাচ্ছিল।

চারু পাঁচিলের পাশে ফকীরচাঁদকে টেনে তুলল। এই শেষ শুকনো স্থান। ওর ভিতরে ভিতরে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছিল। তলপেট কুঁকড়ে যাচ্ছে এবং ভেঙে যাচ্ছে। চারু নিজের কষ্টের কথা ভুলে গেল এবং যে-কোনভাবে ফকীরচাঁদের শরীরে উত্তাপ সঞ্চয় হোক এই চাইল। ফকীরচাঁদ শীতের কথা ভেবে মড়া কান্নায় ভেঙে পড়ছে। ফকীরচাঁদ খেতে পারছিল না—কত দীর্ঘদিন থেকে যেন বৃষ্টি আর থামবে না—শীতে শীতে বছর কেটে যাবে। ফকীরচাঁদ বলল, চারু আমাকে নিয়ে অন্য কোথাও চল।'

'কোথায় যাব রে! আমার শরীর দিচ্ছে না রে!' তের বছরের চারু তলপেটে দু হাত রেখে কথাগুলো বলল।

ফকীরচাঁদ পুনরাবৃত্তি করল, 'আমাকে কোথাও নিয়ে চল রে চারু।'

চারু এনামেলের থালা থেকে বাসি রুটি এবং ডাল খাচ্ছিল। ভিজে জবজবে কাপড়। ভিতর থেকে ওর-ও শীত উপাব উঠে আসছে। এবং মনে হচ্ছিল জরায়ুব ভিতর কেউ যেন গাঁইতি মেরে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। চারু নিজের এই কষ্টের জন্য রুটি মুখে দিতে পারছে না এখন এবং ফকীরচাঁদের কথার জবাব দিতে পারছে না।

বাস ট্রাম যাবার সময় কাদা জল উঠে আসছে ফুটপাথে। ফুটপাথ কর্দমময়। ফকীরচাঁদের এখন উঠে দাঁড়াবাব পর্যন্ত শক্তি নেই। সে ক্রমশ স্থবির হয়ে পড়ছে। এখন সর্বত্র যেন বরফের মত ঠাণ্ডা এবং কাকগুলো বিজলিব তারে বসে বসে ভিজছে। থেকে থেকে ট্রাম বাস চলছে এবং ছাতা মাথায় যারা যাচ্ছিল তারা ছাতার জলে আরও দুঃসহ করে তুলেছে ফুটপাত—সুতরাং ফকীরচাঁদ বৃদ্ধ, সুন্দর হস্তাক্ষর ছিল হাতের, পণ্ডিত ছিল ফকীরচাঁদ—প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, তারপব ফকীরচাঁদ পুত্র এবং পরিবারের সকলকে হারিয়ে দীর্ঘসূত্রতার জন্য ফুটপাথের ফকীরচাঁদ হয়ে গেল। ফকীরচাঁদের সংগ্রহ করা শতছিন্ন গেঞ্জি এবং আবরণ এখন কর্দমময়। সে শীতে ফের কাঁপতে থাকল এবং ফের কথা বলতে গিয়ে দেখল দাঁতমুখ শক্ত, শরীর শক্ত এবং অসমর্থ। সে যেন কোনবকমে নিজের হাতটা চারুব দিকে বাড়িয়ে ধরল।

এখন দিন নিঃশেষের দিকে। চারু একটু শুকনো আশ্রয়ের জন্য গোমাংসের দোকান অতিক্রম করে রাজাবাজারের পুল পর্যন্ত হেঁটে গেছে। সর্বত্র মানুষের ভীড় এবং এতটুকু আশ্রয় চারুর জন্য কোথাও পড়ে নেই। সকল ফুটপাথবাসী অথবা বাসিনীরা দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে। সকলেই মাথার ওপর ভাঙা ছাদ পেলে খুশি আর সর্বত্র ওলাওঠার মত মড়কের সামিল পথ ঘাট। সুতবাং চারু ফিরে এসে হতাশায় ফকীরচাঁদকে কিছু বলতে পারল না সে ফকীরচাঁদের পাশে চুপচাপ বসে পড়ল। ঠাণ্ডা লাগার জন্য শীতে এখন সে কাঁপছে।

ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির ছাট সর্বত্রগামী। বৃদ্ধের চুল দাড়ি ভিজে গেছে। রাস্তার আলো বৃদ্ধ ফকীরচাঁদের মুখে—দাড়িতে বিন্দু বিন্দু জল মুক্তোর অক্ষরের মত—যেন লেখা, আমার নাম ফকীরচাঁদ শর্মা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, নিবাস যশোহর—ফকীরচাঁদ উদাস চোখে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে এ-সব ভাবছিল। চোখ ঘোলা ঘোলা ওর, চারু এই বৃষ্টিতে বসেই এনামেলের থালা থেকে ঠাণ্ডা অড়হড়ের ডাল এবং রুটি ফকীরচাঁদের মুখে দিতে গেল। সে মুখে খাবার তুলতে পারছে না—ঠাণ্ডায় মুখ শক্ত। সে শুধু উত্তাপের জন্য হাত দুটো চারুর হাটুর নীচে মসৃণ ত্বকের ভিতর গুঁজে দিতে চাইল।

চারু বলল, 'দাদু তুই ইতর হয়েছিস?' বলে হাতটা তুলে দিতেই দেখল, ফকীরচাঁদের চোখ যেন ঘোলা ঘোলা—ফকীরচাঁদ যেন মরে যাচ্ছে।

সে চীৎকার করে উঠল, 'দাদু! দাদু!'

ফকীরচাঁদ ঈষৎ চোখ মেলে ফের চোখ বুজতে চাইল।

চারু তাড়াতাড়ি একটু আশ্রয়ের জন্য হোক অথবা ভীতির জন্য হোক উঠে পড়ল। বৃষ্টি মাথায় একটু আশ্রয়ের জন্য দোকানে দোকানে এবং ফুটপাথের সর্বত্র এমন কি গলি ঘুজির সন্ধানে সে ছুটে ছুটে বেড়াল। বৃষ্টি ক্রমশ বাড়ছে। ফুটপাথে ফের জল উঠতে আরম্ভ করেছে। আর অধিক রাতে চারু যখন ফিরল, যখন ফের তলপেটে ঈশ্বর কামড়ে ধরছে, শরীরটা নুয়ে পড়ছিল, জলের জন্য ভিতরে ভিতরে ঈশ্বর মোচড় দিচ্ছে এবং ট্রাম বাস চলছে না, ইতস্তত দূরে দূরে কিছু ট্যাক্সী কচ্ছপের মত ভেসে আছে এবং হোটেল রেঁস্তোরার দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কেউ বৃষ্টিতে ভিজে জেগে থাকবার জন্য বসে নেই—চারুর তখন ক্লিষ্ট চেহারা বড় করুণ দেখচ্ছিল। সামনে অপরিচিত অন্ধকার, চার্চের সামনে হেমলক গাছ—লোহার রেলিং টপকে গেলে ছোট ঘর এবং সেখানে কাঠের কফিন মাচানের মত করে রাখা। হেমলক গাছের বড় বড় পাতার

ভিতর জলের শব্দ আর সামনে সব কবরভূমি—চার্চের ভিতর কোন আলো জ্বলছে না· চারু নিঃশব্দে লোহার রেলিং টপকে কাঠের কফিনের ভিতর শুয়ে সন্তান প্রসবের কথা ভাবতেই ফকীরচাঁদের কথা মনে হল—আবার সেই পথ এবং জলের শব্দ চারু ফুটপাথের জল ভেঙে ফকীরচাঁদকে আনার জন্য ধীরে ধীরে রাজবাড়ির সদর দরজায় ঝোলানো এক হাত গণ্ডারের ছবির নিচে দাঁড়াল। ওর অদ্ভুত এক কান্না উঠে আসছে ভিতর থেকে। জন্মের পর এই বৃদ্ধকে সে দেখেছে আর সেই মোষের মত পুরুষটা যাকে সে তার ভালবাসা দিতে চেয়েছিল, যে চুণ গোলা জল ফেলে ঘুঘু পাখিদের উড়িয়ে দিয়েছে সদর দরজায় এক হাত গণ্ডারের ছবির নিচে দাড়িয়ে চারু কাঁদতে থাকল। বৃষ্টির ঘন ফোঁটা, গাছ গাছালীর অস্পষ্ট ছায়া অথবা সাপ বাঘের ডাকের মত ব্যাঙের ডাক আর নগরীর দুর্ভেদ্য স্বার্থপরতা চারুর দুঃখকে অসহনীয় করে তুলছে। চারুর শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এমন কি পাগলেরাও এই বৃষ্টিতে বের হচ্ছে না, পুলিশ কোথাও পাহারায় নেই। চারু একা এত বড় শহরের ভিতর এখন একা এবং একমাত্র সন্তান যে মুখ বের করবার জন্য ভিতরে ভিতরে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। তখনই চারু দেখতে পাচ্ছে পাগল জলের ভিতর হেঁকে হেঁকে যাচ্ছে, 'দু ঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্দুর। 'পিছনে পাগলিনী। আজ এই রাতে দুজনের হাতেই লাঠি। লাঠির মাথায় পাখির পালক উড়ছে।

চারু ফকীরচাঁদের হাত ধরে কফিনের ভিতর ঢুকে প্রসব করার জন্য কাঠের দোকানগুলো অতিক্রম করে গেল। ফকীরচাঁদ দেখল ওদের কাপড় জামা জলে ভিজে সপ সপ করছে। শীত সেজন্য ভয়ঙ্কর। ওরা দুজনে প্রথম জামা কাপড় ছেড়ে ফেলল—এখন ফকীরচাঁদই সব করছে। চারু অতীব দুঃখে এবং বেদনায় একটা খুঁটি ধরে দাঁড়িয়েছিল। ওদের শরীরে কোন আবরণ ছিল না। মাচানের নিচে চারু ঢুকে যেতে চাইল। কিন্তু কফিনের

ভিতরে কে যেন ফিস ফিস করে কথা বলছে। '—কে। কে!' ফকীরচাঁদ চীৎকার করে যুবকের মত রুখে দাঁড়াল।

কফিনের ডালা খুলে মুখ বের করতেই বুঝল সেই পাগল, পাগলিনী। ওরা আশ্রয়ের জন্য এখানে এসে উঠেছে।

ফকীরচাঁদ বলল, 'তোরা সকলে মিলে চারুকে ধর। চারুর বাচ্চা হবে।

ফকীরচাঁক এবং পাগল হেমলক গাছটার নিচে বসে থাকল। পাগলিনী মায়ের মত স্নেহ দিয়ে চারুকে কোলে তুলে চুমু খেল একটা। তারপর কফিনের ভিতর সন্তানের জন্ম হলে পাগলিনী গ্রাম্য প্রথায় তিনবার উলু দিল। সেই শব্দের ঝংকারে মনে হচ্ছিল সমুদ্র কোথাও না কোথাও আপন পথে অগ্রসর হচ্ছে, মনে হচ্ছিল —এই সংসার হাতি অথবা গণ্ডারের ছবির ভিতর কখনও কখনও লুকিয়ে থাকে। শুধু কোন সৎ যুবকের সংগ্রাম প্রয়োজন। পাগল হেমলক গাছের নিচে শেষ বারের মত চীৎকার করে উঠলো—'কে আসবি আয়, সংক্রান্তির মাদল বাজছে আয়।' ফকীরচাঁদ ধূসর অন্ধকারের ভিতর সুন্দর হস্তাক্ষরে শিশুর নূতন নামকরণ করে অদৃশ্য এক জগতের উদ্দেশ্যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

॥ দুই ॥

যে গ্লানিটুকু এই জমির ভিটেমাটির স্পর্শে করুণ হয়ে ছিল, যা কিছু খড়কুটোর চিহ্ন বর্তমান ছিল, বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা এবং ঘূর্ণি হাওয়া সকল গ্লানিকে, সকল চিহ্নকে নিঃশেষে মুছে দিল। এই জমির পাশে সরু কাঁচা পথ—অন্য এক বস্তি। এক বালক জানালাতে প্রত্যাশিত চিত্রের মত। সে ভোর থেকে সকল ঘটনার সাক্ষী ছিল। সুতরাং যখন সব চিহ্ন নিঃশেষে মুছে গেছে, যখন রুগ্ন পাকুড় গাছে শহরের পাখিরা এসে আশ্রয় করছে তখন সে ক্লান্ত গলায় ডাকল, মা, মাগো!

একফালি ঘর। এই প্রথম একফালি বিকেলের রোদ এসে ঘরময় যেন পায়চারি করছে। সে জানালায় বসে বসে প্রত্যক্ষ করছিল সরু কাঁচা পথ অতিক্রম করে সূর্যের আলো ওর ঘরে প্রবেশ করেছে। বৃষ্টির তাজা গন্ধ রোদের রঙে। সে হাত তুলে যেন রোদের রঙকে স্পর্শ করতে চাইল। পাশে হোগলার বেড়া দেওয়া নিকৃষ্ট অবয়বের বস্তি, কিছু পূর্ববঙ্গের মানুষ। ওরা এখন নেই। সরকারের গাড়ি এসে, পুলিস এসে সকল ঘর ভেঙ্গেছে, দানবের মত যন্ত্রটা সারাদিন গর্জন করছিল। কিছু কান্না এবং অস্পষ্ট কোলাহল ভোরের দিকে ছিল, দুপুর পর্যন্ত পথচারীদের একটা সাধারণ রকমের ভিড়—তারপর বৃষ্টি আর বৃষ্টি, ঝড়। উদ্বাস্তু মানুষের স্মৃতিকে লালন করার ইচ্ছায় বৃষ্টি, ঝড় যেন সবুজের ঘর তৈরী করছে মাঠে।

দুপুরের পর পুলিস, গাড়ি এবং পথচারীদের ভিড়টা পাতলা হয়ে গিয়েছিল। সে দেখল—ঝড় বৃষ্টি থামলে অথবা সময় অতিবাহিত হলে একফালি রোদ ওর জানালায় এসে পড়েছে। যে অপার বেদনা ভোর থেকে মনে আশ্রয় করে গুমরে মরছিল, এই উজ্জ্বল আলোকে সে সকল বেদনা নিঃশেষ হয়ে গেল। জীবনের প্রথম এই

উত্তাপ নির্মলকে চঞ্চল করে তুলছে। সে রোদের উজ্জ্বল রঙ দর্শনে হাঁটবার স্পৃহাতে পায়ে হাত রেখে কিছু উচ্চারণ করেছিল। যেন সে বলতে চাইছিল, ঈশ্বর আমি ওদের (উদ্‌বাস্তু) মত এই পথ ধরে অন্য কোথাও হেঁটে যেতে পারি না। ওদের মত নিরুদ্দিষ্ট হতে পারি না। সে তার দেহকে এই রোদের রঙে নিমজ্জিত করার জন্য দেয়াল ধরে উঠতে গিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নিচের মেঝেতে পড়ে গেল।
—মা, ও মা!

চারু বালা অন্য ঘরে প্রসাধনে ব্যস্ত। সুতরাং আয়নায় প্রতিবিম্ব রেখে একমাত্র সন্তানের কণ্ঠস্বর শুনল। এই স্বরে সে যেন নিদারুণ বিরক্ত। সে বলল, 'নিমু তুমি এই অবেলাতে কেন?'

তুমি এস। আমি নিচে পড়ে গেছি! চারুবালা প্রসাধনের কৌটা ঘরের অন্ধকারে লুকিয়ে এবং মুখে হতাশার চিহ্ন এঁকে দৌড় দিল। ঘরে ঢুকে বলল, 'কেন, কেন তুমি ফের দাঁড়াবার চেষ্টা করলে?' চারুবালা তাড়াতাড়ি নির্মলকে কোলে তুলে নিল! বড় ভার এই শরীরের। সে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে নির্মলকে তক্তপোশে তুলে দিয়ে বলল, 'জানালায় বসে থাক। দাঁড়াবার চেষ্টা করো না। ভগবান চোখ তুলে তাকাবেন।'

এ-সময় অন্যান্য ঘরে, অথবা গলির মোড়ে এবং অন্য অনেক অন্ধকারে সকল বালার দল প্রসাধনে ব্যস্ত। ওরা চুরি করে কেউ ঘরে কেউ শহরের আলোয় আলোয় সঙ্গী খুঁজে খুঁজে অভাবে অনটনে ইচ্ছার পরমায়ুকে বাড়াবে। যখন চারুবালার একান্ত ত্বরান্বিত হওয়ার কথা তখনই কিনা এইসব বিরক্তিকর ঘটনা। অথচ জানালায় রোদ চারুবালার খুশী হওয়ার কথা—দীর্ঘ পনের বছর ধরে ঘর-সংলগ্ন জীর্ণ দেয়ালগুলি এই ঘরে সূর্যের উত্তাপ প্রবেশ করতে দেয়নি।

চারুবালা বলল, 'নিমু এই ঘরে এত রোদ।'

নির্মল চারুবালার বুকের কাছে মুখ রেখে বলল 'মা, আমরা কবে যাব? কখন তুমি আমাকে জলছত্র করে দেবে?'

চারুবালা কোন জবাব না দিয়ে উঠে গেল। নির্মল তেমনি জানালাতে বসে থাকল। বৃদ্ধ ফকিরচাঁদ বারান্দায় কাক তাড়াবার মত শব্দ করছে। পাশের ঘরে প্রতিদিনের মত তেমনি খুটখুট শব্দ তারপর দূরে দূরে যুবতীর কণ্ঠস্বর, ইতস্তত ফিসফিস কথাবর্তা, বড় রাস্তায় মোটর বাস ট্রামের শব্দ এবং রেলপুলে একটা এনজিন চলতে চলতে থেমে গেল। মা এ-সময় ফকিরচাঁদকে বললেন, আমি যাচ্ছি . কৌটায় সন্দেশ আছে। ওকে দিও। নির্মল দেখল, তখন দূরে পার্কের বিচিত্র সব গাছগুলোতে সূর্যের শেষ রঙ। আকাশে কিছু পাখি উড়ছে। এতবড় আকাশ তার জীবনে এই প্রথম। এতবড় আকাশ দেখে মায়ের বর্ণিত সেই সবুজ প্রান্তরের কথা মনে হল, তরমুজ খেতের কথা মনে হল। বড় রাস্তার ধারে ছোট্ট নীল রঙের বাড়ি। কয়েদবেল অথবা কামরাঙ্গা গাছের ছায়া, নির্জন প্রান্তরে ছোট নদী ফটিক জল—দূর থেকে আগত সব তীর্থ-যাত্রী, নির্মল জলছত্র খুলে তৃষ্ণার জল দিচ্ছে সকলকে। এতবড় আকাশ দেখে ওর ফের হাটতে ইচ্ছা হল। মাগো, আমাকে তোমার সেই ফেলে আসা দেশে নিয়ে চল।

নির্মল ওর পঙ্গু পা দুটোতে ভালবাসার হাত রাখল। মা চলে গেছেন। বড় রাস্তার বাস ধরে মা কোথায় চলে যান। কারখানার ঘড়িতে সাতটা বাজে, আটটা বাজে, দশটা বাজে—নির্ম ঘুমোতে পারে না। মার জন্য কষ্ট হয়। মা আসবেন। দরজার শব্দ হবে। না খুব আস্তে কড়া নাড়বেন। নির্মল জানালাতে বসে থেকে বড় রাস্তার সব গাড়ির শব্দ শুনে কখনও উৎকর্ণ কখনও উদ্বিগ্ন। নদমার পচা গন্ধ এই ঘরে এবং সর্বত্র—জানালায় বসে বিকেলের গাঢ় রঙ দেখে নির্মল এইসব ভাবল। ঘর-সংলগ্ন উদ্বাস্তু পল্লীর কোন চিহ্ন নেই। সামনে একটা মাঠের সৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টির জন্য মাঠ, ঘাস এবং পথ ভিজা।

এই মাঠে নির্মল সোনাপোকা উড়তে দেখল। তখন বড় রাস্তায় একটা বাস ভয়ানক-ভাবে ফুঁসে উঠল। রাস্তায় কোলাহল। লোক-জন ছুটছে। বস্তির সকল নারী-পুরুষ রাস্তার মোড়ে এসে ভিড় সৃষ্টি করছে। এবং কোন দুর্ঘটনার কথা সকলের মুখে মুখে। নির্মলও যতটা পারল জানালা দিয়ে গলাটা বের করে বড় রাস্তাটা দেখতে চাইল। অংশত দৃশ্যমান রাস্তার উপর ইট-পাটকেল ছুঁড়ছে, যেন কারা। বাস-ড্রাইভার ছুটে পালাচ্ছে। পুলিশের গাড়ি ছোঁ মেরে লাশটা নিয়ে পথটাকে নির্জন করে উধাও। আবার ট্রাক বাসের শব্দ। লোক চলাচল করছে। নির্মল পা দুটোতে ভালবাসার হাত রেখে বলল, ফকিরচাঁদ আমার এই ঘর ভাল লাগছে না। আমি কোথাও চলে যাব ফকিরচাঁদ। যেন আরও বলার ইচ্ছা : আমার এই পঙ্গু পা নিয়ে নির্জন কোন প্রান্তরে লাল নীল কাঠের ঘরে দূর থেকে আগত তীর্থযাত্রীদের জন্য জলছত্র খুলব। ফকির-চাঁদ তুমি শুধু মাটির বড় বড় জালাতে জল ভরে রাখবে।

কিছুক্ষণ আগে সূর্য ডুবে গেছে। ঘরে ঘরে কেরোসিনের আলো। বড় রাস্তায় লাইটপোস্টের আলো নর্দমা অতিক্রম করে কোনো কোনো ঘরের দাওয়ায় এসে পড়েছে। পচা গন্ধটা অনবরত এই বস্তি-অঞ্চলকে আবিলতায় ঢেকে রুক্ষ এবং রুগ্ন করে রাখছে। অথচ চায়ের দোকানে ভাঙ্গা টেবিলে সংবাদপত্র এবং বুভুক্ষু লোক সব এই সংবাদপত্র পাঠে জঠরে মন্দাগ্নি সৃষ্টিতে সচেষ্ট। সন্ধ্যার পর বস্তির সদানন্দ শ্রমিক খড়ম পায়ে খট খট করে নির্মলের জানালা অতিক্রম করবে। চায়ের দোকানে বসে উচ্চস্বরে পত্রিকা পাঠ করবে। নির্মল সল্প আলোতে বসে এই সংবাদপত্র পাঠে উত্তেজিতদের বিঘ্ন সৃষ্টিকারীদের কথাবার্তা কিছু শুনতে পাবে। পৃথিবীতে এত সব হচ্ছে অথচ আমার পা দুটো ভাল হচ্ছে না কেন ? মা রোজ এত রাত করে আসে কেন ? মানুষের পরমায়ু বাড়ছে (সদানন্দের পত্রিকা পাঠ থেকে সে ধরণীর সকল খবর রাখছে) অথচ আত্মহত্যা, অকালমৃত্যু, কমছে না, আমরা সকলে খেতে পাচ্ছি না, ফকিরচাঁদ

নির্মল টগরের দিকে চোখ তুলে তাকাল। মা বলেছে আমি নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠব। ডাক্তার বলেছেন, আমাকে খুব ভাল খেতে দিতে হবে। মা তার জন্য প্রাণপাত করছেন।

—সকলে যে বলছে তুমি ভাল হবে না। টগর কথাটা পুনরাবৃত্তি করল।

—কেন ভাল হব না। জানালা ছেড়ে সরে দাড়াও, ঘরে আলো ঢুকতে দাও।

টগর, জানালা থেকে সরে দাড়াল এবং আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি ভাল হলে আমি খুব খুশী হব।'

সবুজ ঘাস এখন এই মাঠে। কিশোর-কিশোরীরা নাচতে নাচতে ছুটছে। টগর ওদের ভিতর রাণীর মত। শহরের এই ঘন বস্তি-অঞ্চলে ছোট একখণ্ড জমি আবিষ্কার করে ওরা এসেছে। একটি বড় পাকুড়গাছ এবং রাজ্যের বিচিত্র পাখির আশ্রয়—এই অঞ্চলকে স্বার্থপর দৈত্যের হাত থেকে কোন এক ঈশ্বর যেন নিয়ত রক্ষা করছেন। নির্মলের ইচ্ছা হল জানালা অতিক্রম করে ঘাসের নরম আশ্রয়ে অথবা কলের শব্দ শোনার জন্য দু পায়ে ভর দিয়ে কিংবা রুগ্ন পাকুড়গাছটার নিচে বসে সকল পাখির ডাক শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে। নির্মল জানালাতে হাত রাখল। সকল কিশোর-কিশোরীরা ওর হাত স্পর্শ করে চলে যাচ্ছে, আবার ফিরছে, ঘোড়ার মত ছোট ছোট পায়ে কদম দিচ্ছে। রোদ তক্তপোশ থেকে দেয়ালে উঠে যাচ্ছে। পা দুটোকে সে শুইয়ে রাখল রোদে। সূর্যের উত্তাপে প্রাণ সঞ্চারের আশায় সে বসে থাকত। যখন ওরা ছুটছে যখন ওরা বুড়ি স্পর্শ করার জন্য প্রাণপণ ছুটছে তখন নির্মল উত্তেজিত হতে থাকে। আহা ওদের দু পায়ে ঘোড়ার পায়ের মত সামর্থ্য। ওরা যত ছুটছে নির্মল তত এক প্রগাঢ় অনুভূতি। উত্তাপে কাঁপতে থাকল। আকাশ এত নীল, পথ এত শব্দময়, কারখানার পাশে এক পাগল চিত্রকর। এই জানালায় নির্মলের মুখ তারপর

বড় রাস্তা ধরে বাস, ট্রাক ছুটছে।

—এই বিকেলে গগনভেরী পাখিদের ডাক কোথাও শোনা যাচ্ছে না গো। ফকিরচাঁদ বারান্দায় বসে কাঁদবার ভঙ্গীতে কথাগুলো বলল।

টগর জানালায় এসে বলল, 'রাজা, সন্ধ্যা হয়েছে, এবার আমরা যাব।'

সন্ধ্যা হল বলে সকলেই চলে গেল। সেই বুড়ো মানুষটা শুধু বসে আছে। এটা ভাদ্র মাসই হবে, কারণ মাঝে মাঝে গরম কম মনে হচ্ছিল। আকাশ মাঝে মাঝে নীল অথবা একান্ত স্বচ্ছ। আর আশ্বিনের মাঝা-মাঝিতেই নির্মল একদিন দেখল টগর মাঠে নেই। সকলে এল অথচ টগর এল না। ভেবেছিল টগরকে আজ সহসা সুখবর দিয়ে খুশী করবে। টগর আমি ভাল হয়ে উঠছি, পায়ে যেন শক্তি হচ্ছে। নির্মল কোথাও ঢাকের শব্দ শুনল। কোথাও ঢোল বাজছে। আশ্বিনের মাঝমাঝি—অনেক দূরে সানাই বাজছে। প্রতিমা বোধনের বাজনা বাজছে অথচ টগর মাঠে নেই। এই ক'মাস প্রতি বিকেলে নির্মল টগরের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকত—কখন বিকেল হবে, কখন পাখ-পাখালীরা রুগ্ন পাকুড় গাছটায় এসে আশ্রয় নেবে এবং সকল ছেলেমেয়ের দল হইহই করতে করতে ছুটবে, নাচবে, খেলার ভিন্ন ভিন্ন আনন্দ প্রকাশ করে এই মাঠের নির্জনতাকে ভেঙ্গে দেবে। নির্মল সহসা ভাবল কবে যেন টগর বলেছিল, বিদ্যাসাগরের জন্ম মেদিনীপুর বীরসিংহ গ্রামে।

তখন ছোট একটি ছেলে এসে নির্মলের জানালায় দাঁড়াল; বলল, 'টগর বাঁচবে না। ওর কলেরা হয়েছে।' সেই বিকেলে কিছু শ্রমিক এল কাঁটাতার নিয়ে। কিছু থাম গেঁথে দিল মাঠের চারপাশটাতে। ওরা বুড়ো লোকটাকে টেনে হিঁচড়ে চায়ের দোকানের সামনে রেখে গেল। তারপর কাঁটাতার দিয়ে মাঠটাকে ঘিরে ফেলল। বস্তির উলঙ্গ শিশুরা, কিশোর-কিশোরীরা বিষণ্ণ

চোখে এই সব ঘটনা দেখছে—কোন প্রতিবাদ করতে পারছে না। প্রিয় মাঠের এই দুঃসহ বন্ধনে ওরা কেমন এক দুঃখবোধে পীড়িত হতে থাকল। ওরা একটু হেঁটে এসে নির্মলের জানালায় ভিড় করল। বলল, 'তুমি কিছু বলছ না। ওরা যে কাঁটাতার দিয়ে মাঠকে ঘিরে দিল।'

নির্মল কোন জবাব দিল না, সে সকলের মুখ দেখছে শুধু। এ দুঃখ তার নিজেরও। সকলের মুখ দেখে সে বিহ্বল হতে থাকল। টগব নেই। টগরের কলেরা হয়েছে। সোনাপোকা উড়ছে না মাঠে। বৃদ্ধ লোকটি চায়ের দোকানে বসে অশ্লীল কথাবার্তা বলছে। সতুকা আসছেন খড়ম পায়ে। এখন তিনি উচ্চস্বরে পত্রিকা পাঠ শুরু করবেন। বড় রাস্তার মোড়ে গাড়ি পার্ক কবাব শব্দ। একজন বাজাবাহাদুরের মত ব্যক্তি গাড়ি থেকে নেমে মাঠেব চারপাশটা ঘুরে ঘুরে দু'আঙুলে তুড়ি মারছেন। হাতে হীরেব আংটি। মুখ শরীর কোলা ব্যাঙের মত করে রেখেছেন।

ওরা জানালায় ফের মুখ তুলে বলল, 'দেখেছ, দৈত্যের মত লোকটা কেমন বড় বড় হাই তুলছে!' বলে ওরা হাসতে থাকল। দৈত্য ব্যক্তিটি পঙ্গপাল আসছে ভেবে বিরক্ত। হাতের তুড়ি থামিয়ে কিঞ্চিত সাহস সঞ্চয় করছেন। এবং পঙ্গপাল অতিক্রম করে যেতেই চায়ের দোকানে আবছা অন্ধকার থেকে বৃদ্ধ লোকটি খ্যাক করে উঠল। ব্যাঙের মত মুখব্যাদন করে তাড়াতাড়ি গাড়িব ভিতর ঢুকে কোঁচা ঝাড়তে থাকলেন তিনি।

চায়ের দোকানী বলল, 'আমাদেব বুড়োকর্তা পাগল হয়ে গেল গো!'

তখন ঢাকের শব্দ, ঢোলের শব্দ বাজছিল। অনেক দূরে সানাই বাজছে। প্রতিমা বোধনের বাজনা। ট্রামগাড়ি, বাসগাড়ি—বড় রাস্তার দু-পাশে জনতার ভিড়, জানালায় নির্মলের মুখ, স্বার্থপব দৈত্যের গাড়ি বড় রাস্তা ধরে অন্য কোথাও চলে যাচ্ছে—এই

শুভদিনে জমিতে কাঁটাতারের বেড়া। আকাশ নীল স্বচ্ছ অথচ এইসব মানুষের গতানুগতিক জীবনের মধ্যেও টগর হাসপাতালে শুয়ে বাঁচবার স্বপ্ন দেখছে। এখন কেমন আছে টগর! সে কি ঢাকের শব্দ, ঢোলের শব্দ আমাদের মত শুনতে পাচ্ছে! অদূরে সানাই যদি কখনও বাজে—অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী টগরের যদি কখনও বিয়ে হয়! নির্মল নিজের পায়ে হাত রাখল।

জানালা থেকে এক সময় সব দৃশ্য মুছে গেল। ফকিরচাঁদ এ-ঘর সে-ঘর ঘুরে লণ্ঠন জ্বেলে দিল, নির্মল সেসব লক্ষ করছে না। টগর হাসপাতালে, ভগবান, টগর যেন বাঁচে। দৈত্যের মত লোকটাকে ঈশ্বর সুমতি দিক, ফের সোনাপোকা উড়ুক মাঠে, মাঠের ঘাসে ঘাসে সবুজ গন্ধ থাকুক—নির্মল এইসব ভেবে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। সে দেয়ালে এক হাত রেখে একটা বালিশে হাঁটু গুঁজে দিল। তারপর অন্য পা সামনে রেখে তীরন্দাজের মত বসল। কিন্তু কিছুতেই দাঁড়াতে পারল না। সে কাঁপতে কাঁপতে নিচে গড়িয়ে পড়ল।

নির্মল মাকে বলল, মা আমাকে বিদ্যাসাগরের জীবনী কিনে দিও।

নির্মল জানলায় বসে আছে। সরু কাঁচাপথ অতিক্রম করে কাটাতারের বেড়া, মাঠ, রুগ্ন পাকুড়গাছ—পাখিরা গাছ থেকে পালিয়েছে। একটা যন্ত্র মাঠটাকে কাদন থেকে . ষ বেড়াচ্ছে। যন্ত্রটা মাটির অতলে পাথর ঠকে উপরে উঠে আসছে। দুপুর পর্যন্ত ট্রাকে ইট এসেছিল, পাথর চুন এসেছিল। এই মাঠে সারাদিন সারামাস ধরে একটি অদ্ভুত রকমের বিরক্তিকর আওয়াজ। জানালাতে এখন রোদ। নির্মল অন্যান্য দিনের মত পা রাখল রোদে। টগর বেঁচে নেই। টগরের স্মৃতি ওর জানালাতে রঙিন, ওর বাঁশির মত নাকে মুখে স্পষ্ট প্রতিবাদ, বড় অট্টালিকার চাপে আমরা ছোট মানুষেরা হারিয়ে যাচ্ছি গো। নির্মল জানালাতে হাত রেখে রোদের ভালবাসাটুকু নিল। এই রোদে যেন সে টগরকে প্রত্যক্ষ করছে, এই রোদ টগরের প্রতিবিম্ব যেন। জানালার কাঠে হাত বুলাল এবং

একসময় করুণ কণ্ঠে জানাল—তোমরা আমার এই রোদটুকু কেড়ে নিও না গো।

আর তখন চারুবালা বাসের এক কোণে বসে প্রতিদিনের মত আজও দেখল কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট ধরে জনতার ভিড়—ওর বাসটা ট্রামগাড়ি অতিক্রম করে বিডন স্ট্রীট পার হলে পার্কে বিদ্যাসাগর, পাখিরা ঈশ্বরচন্দ্রের মাথায় ময়লা ফেলে নিচে ভদ্রলোকের ছড়ানো ছিটানো চানা খাচ্ছে। সে এতদিন এই পথে রোজ যাচ্ছে অথচ আজ প্রথম দেখল বিদ্যাসাগরের চোখে পিচুটি, মুখে দাড়ি। সহসা মনে হল—বিদ্যাসাগর সারাদিন সারামাস বসে বসে নির্মলের মতই পঙ্গু। এবং আজ কেন জানি চারুবালার ঈশ্বরচন্দ্রের মা হওয়ার শখ জাগল। ভাবল, প্রতিরাতে ফিরবার সময় একবার করে পাখিদের মলমূত্রে তৈরি ওঁর চোখের পিচুটি এবং মুখের আবর্জনা সাফ করে দিয়ে যাবে।

চারুবালা বাস থেকে নেমে পড়ল এবং হনহন করে ইংরেজী সিনেমা পার হয়ে একটা বড় গলিতে ঢুকে গেল। পরিচিত পানের দোকান থেকে মিষ্টি পান খেল একটা। দোকানীর সঙ্গে কিছু হাসি বিনিময় হল। তারপর নির্ধারিত ঘরে ঢোকার আগে জনতার ভিড়ে একটু দাঁড়াল। চারুবালার চুল সুন্দর করে জড়ানো। ঘাড় মসৃণ এবং নরম। তেলের গন্ধ শরীরে। একটি মির্জাপুরী পুরানো সিল্ক চারুবালার শরীরের প্রতিটি ভাঁজকে তীব্র তীক্ষ্ণ করছে। চারুবালার চোখে কাজল। বৃহৎ অট্টালিকার ফাঁক দিয়েও আকাশ স্পষ্ট অথচ নিচে দুটো নগ্ন বালক-বালিকা ভাঙ্গা টিনের থালা থেকে বাসি রুটির টুকরো, পায়েস কিছু মটরের ডাল তুলে খাচ্ছে। জনতার শরীরে বিলাসী দ্রব্য, কাচ মোড়া দোকানে কত উপকরণ জীবনধারণের, ট্রাম বাস নিয়ন আলো, মাঠে অশ্বারোহী দল কদম দিচ্ছে তারপর দূরে দূরে জনতার ভিড়। এবং চারুবালা এ সময় কি ভেবে দুটো পয়সা ছুঁড়ে দিল টিনের থালাতে তারপর ভিড় থেকে সরে পড়ল।

ফিরতি পথে কিন্তু চারুবালার নিজের কথাই মনে থাকল না কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে—কোন ইচ্ছার অস্তিত্বে সে এভাবে ছুটছে? অথচ একই পথ। নির্জনতা শুধু এখন পথের সবত্র। ইতস্তত ট্যাক্সি এবং শেষ বাস শহরের চলে যাচ্ছে। পার্কে বিদ্যাসাগর তেমনি পঙ্গু। জনতার ভিড় ব্যতীত সব দৃশ্য সকল একইভাবে দৃশ্যমান। বিদ্যাসাগরের পায়ের কাছে নগ্ন দুই শিশু ঘুমিয়ে আছে চারুবালা জননী হবার ইচ্ছার কথা আদৌ স্মরণ করতে পারছে না। অন্যান্য দিনের মত সে দৃশ্য সকল দেখতে দেখতে অথবা চোখ বুজে পড়ে থেকে ট্যাক্সিতে গীর্জা, রঙ্গমঞ্চ প্রভৃতি অতিক্রম করছে কেবল।

ঘরে ফিরে দরজায় মৃদু আঘাত করল চারুবালা। ফকিরচাঁদ উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। উঠোন পার হয়ে বারান্দায় উঠে দরজা দিয়ে দেখল চারুবালা, নির্মল ঘুমিয়ে আছে। চারুবালা আজ ভাল করে স্নান করল। ফকিরচাঁদকে বলল, আমার খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়। চারুবালা নিচে বিছানা করল না আজ। নির্মলের পাশে একটু জায়গা করে শুয়ে পড়ল এবং নির্মলের শরীর থেকে ঘ্রাণ নিতে গিয়ে কাতর আবেগে বলে উঠল, 'ভগবান, আমি যে আর পারছি না'

পরদিন নির্মল বলল 'মা চল আমরা এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাই।'

চারুবালা চা খেতে খেতে হাসল। কেন ভাল লাগছে না?

—না মা, আমার ভাল লাগছে না। মাঠে কত বড় বাড়ি হচ্ছে, বাড়িটার জন্যে আমার জানালায় রোদ আসবে না আর।

চারুবালা এবারেও হাসল। তুমি ভাল হয়ে ওঠ তারপর আমরা চলে যাব।

—আমরা সেই কাঠের ঘরে চলে যাব না মা?

চারুবালা জবাব না দিয়ে লক্ষ্মীর পটের দিকে তাকাচ্ছে।

—সেখানে ছোট্ট নদী থাকবে, তরমুজ খেত থাকবে না মা? আমি জলছত্র দেব না মা?

দরজার বাইরে বৃদ্ধ ফকিরচাঁদ বলছে, গগনভেরী পাখি থাকবে সেখানে চারু ?

চারুবালা বলতে চাইল যেন সবই থাকবে, শুধু আমি বুঝি থাকব না।

তারপর নির্মল নিজের চোখের উপরই দেখল, ইট কাঠ পাথরের বিরাট প্রাসাদ এই সবুজ ঘাসের উপর তৈরী হচ্ছে। এই প্রাসাদের মত বাড়িটা ওর জানালার এতটুকু রোদকে নিঃশেষে মুছে দিল। শ্রমিকেরা ছাদ পিটাচ্ছে এবং অশ্লীল গান গাইছে। নির্মল চারুবালাকে বলে চার চাকার একটা কাঠের গাড়ি তৈরী করাল। ফকিরচাঁদকে গাড়িটা ঠেলে দিতে বলল রাস্তায়। তারপর বড় রাস্তায় উঠে বৃষ্টিতে ভিজে সকল শ্রমিকের সঙ্গে গলা মিলিয়ে দেবার স্পৃহাতে চোখ তুলতেই দেখল—স্বার্থপর দৈত্য গাড়ি থেকে নামছে, দূরে তার মা। চায়ের দোকানে সাত পাঁচ রকমের লোক এবং ওদের মুখে ভিন্ন ভিন্ন কথা। নির্মল মুখ ফিরিয়ে নিল। দেখল, বস্তির সকল উলঙ্গ শিশুরা ওকে ঘিরে হইচই করছে। ওরা লাফাল, নাচল। সে কাঠের বাক্সটার মধ্যে বসে আছে। সকলে মিলে টানছে গাড়িটাকে। গাড়িতে বসে নির্মলের মনে হল, গাছ ফুল পাখি অথবা এই পথ অথবা নির্জন নিঃসঙ্গ প্রান্তর, কবমচা গাছে হলুদ রঙের ফুল এবং এই উলঙ্গ শিশুদের ঘিরে নতুন এক সংসার পত্তন করলে কেমন হয় !

রাতে নির্মল জানালাতে বসে দেখল প্রাসাদের সকল কক্ষে আলো। সদর দরজাতে জনসমাগমের ভিড়। হরেক রকমের বাজী পুড়ছে। দেয়ালে দেয়ালে নকশী কাঁথার মত আলোর ফুলকি। বিদেশী সংগীতের মদিরতা বস্তি অঞ্চলের সকল ইচ্ছাকে আচ্ছন্ন করে রাখছে। নির্মল মার জন্য প্রতীক্ষা করছে জানালায়। ভাল লাগছে না বলে বিদ্যাসাগরের জীবনী পড়ছে। রাত বাড়ছে, ঘন হচ্ছে এবং গভীর হচ্ছে। মা তখনও ফিরছেন না। বড় রাস্তা ধরে শেষ বাস কখন চলে গেছে। হোটেলের আলোতে নির্মল

পড়ল ভগবতী দেবী, বীরসিংহ গ্রাম। নির্মল বালিশে মুখ ঢেকে আজ কাঁদল।

সে রাতে চারুবালা আর ফিরল না। এক অদৃশ্য শক্তির চাপে চারুবালা আর ফিরতে পারল না।

॥ তিন ॥

সে এ-সময় আর মনে করতে পারল না—কোথায় যেন সেই নাটক, নাটকের পাত্রপাত্রীরা সব গণ্ডার হয়ে যাচ্ছে, শরীরে সবুজ রঙ এবং গায়ের চামড়া ক্রমশঃ ভারী হয়ে যাচ্ছে, নাটকের করুণ পরিণতি—বেরিনজার কাঁদছে। বেরিন্‌জার চুল ছিঁড়ছিল, বেরিন্‌জার হাত ছুঁড়ে বলছিল, ঈশ্বর আমি মানুষের মত বাঁচব। আমি গণ্ডার হব না। আমাকে গণ্ডার করে দিওনা ঈশ্বর।

সেই দৃশ্যের ভিতর ইন্দ্র টেবিল এবং ফোনের নম্বরটা দেখল। টেবিলের উপর স্তূপাকার ফাইল এবং ক্যাশবুক। কিছু ডেবিট ভাউচার, ক্রেডিট ভাউচার—দোয়াতদানীতে নানা রকমের কলম। জানালা কাচ দিয়ে মোড়া। পাখাটা ভাল ঘুরছে না সুতরাং সে নিজেই জানালাটা খুলে দিল। ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে ঢোকায় ওর জ্বর জ্বর ভাবটা কম। অথচ বারবার সেই মুখ টেবিলের অন্যপাশ থেকে উঁকি দিতে চাইছে সুতরাং ওর ভয় করছিল।

সরু রাস্তা—খাজ কাটা ইট দিয়ে তৈরী। দুজন জোয়ান লোক একটা ঠেলা গাড়ী টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কারখানার কারিগরেরা নর্দমাতে ছেপ ফেলে সদর দরজায় ঢুকে গেল। সদর দরজাতে ঘণ্টা পড়ছে তারপর মেশিনের শব্দ। প্রেস মেশিন এবং লেদের আওয়াজ ভেসে আসছিল। জানালার কাঁচে ইন্দ্র সুপারভাইজার ভাদুড়ীবাবুর মুখ দেখল। তিনি হন্তদন্ত হয়ে অফিসের দিকে

আসছেন। তিনি অফিসের দরজাতে এসে বললেন, স্যার আসব?

—আসুন।

—সাতজন কামাই করেছে স্যার।

—কি করব।

—লোকের দরকার স্যার।

—লোক খুঁজুন। নিয়োগপত্র দিচ্ছি।

—লোক পাওয়া যাচ্ছে না।

—এত কম মাইনেতে লোক পাওয়া উচিত নয়।

ইন্দ্র ইচ্ছা করেই এবার মুখটাকে আরও তেতো করে রাখল।

সদর দরজা অতিক্রম করলে শিউপূজনের মুখ। সে ভাঙা টুলে বসে হাত পা চুলকোচ্ছিল। ওর চোখমুখ টোপা কুলের মত। হাতে ঘা। পায়ের ঘা ভয়ঙ্কর সাদা। একদিন শিউপূজন ব্যাণ্ডেজ খুলে পাটা ইন্দ্রকে দেখিয়েছিল—ঘন সাদা রঙের ঘা, ক্ষত স্থানটুকুতে অবিরাম দুর্গন্ধ। হাতের আঙুল পায়ের আঙুল মরে যাচ্ছে। শিউপূজন হাত নেড়ে বলছিল, বাবু বাচতে বড় ইচ্ছা। বাচতে বড় সখ যায়। সুতরাং শিউপূজন কিছু ঠেলাগাড়ী—তার ভাড়া আদায়, টিনের একটা ছোট ঘর এবং অন্য অনেক কিছু নিয়ে শিউপূজন মনে হয় ভালই আছে। ইন্দ্র মনে মনে শিউপূজনকে এ-সময় ঈর্ষা করতে থাকল।

ফোনটা বাজছিল—ইন্দ্র ইচ্ছা করেই হাত বাড়াল না। কারণ ইন্দ্র জানত—সেই আগরয়ালা যার কয়েক হাজার টাকা কোম্পানীর কাছে অগ্রীম দেওয়া আছে, সে ফোন করছে। ইন্দ্র বোতামে হাত রাখল। পিয়নকে বলল, দেখ কে ডাকছে। আগরয়ালা হলে বলবে আমি বাইরে গেছি।

কিন্তু সে বলল, স্যার বাড়ী থেকে ফোন। দিদিমণি ফোন করছে।

ফোনটা হাতে নিয়ে ইন্দ্র বলল, বল।

—আমার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।

—সেত আসবার সময় দেখে এলাম।

—দাদা এসেছেন। আমি বরং দু দিন মার কাছে থেকে আসি।

—সেত ভাল কথা। যাও। সে ফোনটা নামিয়ে রাখল। জীবনে নিরাপত্তাবোধ অধিকতর মনে হওয়ায় সে মুখটা আর ব্যাজার করে রাখল না। সুতরাং স্ত্রীর মুখ মনে পড়ছে। অথচ কেন জানি এখন আর বিবাহিত জীবনের পূর্বে প্রথম পরিচয়ের স্মৃতিটুকু আনন্দ দান করে না। প্রেম ভালবাসা যেন মৃত্যুর মত দুঃখজনক······সে একবার রথের মেলায় রথে চড়তে চেয়েছিল, সে একবার নাঙ্গলবন্দের বান্নিতে একটা ভৈরবীর উরু দেখেছিল আর সে একবার দূরে কোন মুসলমান যুবককে গোহত্যা করতে দেখে, শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যার দান ···এক কন্যা রাঁধে বাড়ে আর এক কন্যা খায় অন্য কন্যা নাচতে নাচতে বাপের বাড়ী যায় এই সব দৃশ্যের ভিতর স্ত্রীর অস্তিত্ব এবং প্রেম সম্পর্কিত ঘটনা কোন উত্তেজনা বহন করছে না। সীতার সুন্দর চোখ এবং শরীর এখন কালো, ফ্যাকাশে তার গরুর লেজের মত হালকা।

ছোট কারখানা। ইন্দ্রকেই প্রায় সব দেখাশোনা করতে হয়। দুজন সহকারী। ওরা অন্য ঘরে লেজার পোষ্টিং চেক করছে। একজন কেরাণী কাণপুর পার্টির ষ্টেটমেন্ট অফ একাউন্টস করছে। ইন্দ্র কেরাণীবাবুকে ওর ঘরের দিকে আসতে দেখে মুখটা ফের গম্ভীর করে ফেলল।

—স্যার সব পার্টিদের ষ্টেটমেন্ট অফ একাউন্টস ত্রিশ তারিখের ভিতর দেওয়া একেবারেই অসম্ভব।

—কেন।

—স্যার আমি একা।

—সুভাষকে সঙ্গে নেবে।

—স্যার একটা কথা বলতে চাইছি।

—বল।

—আজ যদি একটু আগে ছাড়তেন।

—কি দরকার পড়ল হঠাৎ?

সে লজ্জিত মুখ করে রাখল। সুতরাং ইন্দ্র বলল, যাবে। কেরাণীবাবুটি নেমে গেলেন। টিনের কারখানা থেকে হাপরের শব্দ আসছে। এই অঞ্চলে সব বস্তিঘর। দূরে কোথাও বচসা হচ্ছিল। কিছু লোক জমেছে—সে তার কাঁচের জানালা দিয়ে সব দেখতে পেল এবং বড় উলঙ্গ মনে হচ্ছে এই পথ, দূরের বেশ্যালয়। সেখানেও সে ভীড় দেখতে পেল। কোন বেশ্যা রমণীর মৃতদেহ নিয়ে ঝগড়া—চারজন মাতাল পুরুষ সেই মৃতদেহ এবং ঝগড়াকে বহন করে চলে যাচ্ছে। সে দেখল রমণীর কপালে সিঁদুরের টিপ এবং সতীমায়ের মত মুখ এবং চোখ গাভীন উটের মত। ওরা চারজন। ওরা শববাহী এবং ওরা কাঁদছিল।

বাইরে কে যেন বলল, মাগী সারাজীবন সৎ থাকতে চেয়েছিল।

কে যেন বলল,আমরা সকলে মিলে মাগীকে অসতী করলাম।

দরজা পার হলে বাঁদিকের পথ ধরে বস্তিবাসীরা হাঁটছে। বস্তিবাসীদের স্ত্রীগণ পুরুষগণ বাইরে এসে দাঁড়াল। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছিল। সূর্য উঠছে না কতদিন থেকে। সহরময় জলের প্লাবন। মেয়েরা হেঁটে যাচ্ছিল। কাপড় হাঁটুর উপর তুলে হাটছিল। সাদা ডিমের মত হাঁটুর নিচে কামনার ঘর, বড় মসৃন এবং উজ্জ্বল—সে এ-সময় দুহাঁটু ভাজ করা একটা ব্যাঙের মত ছবির উপর আকাশের প্রতিবিম্ব দেখতে পেল। মাতাল পুরুষগণ চলে গেছে এবং পিছনে বেশ্যা রমণীদের মিছিল—তাও নিঃশেষ সুতরাং ইন্দ্র দু'হাতের অঞ্জলীতে মুখ ঢেকে বলল, ঈশ্বর আমাকে এই শহরের কোলাহল থেকে কোন শান্ত নির্জনতায় নিয়ে চল। সেই পুরুষটির গণিকা হয়ে আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

ইন্দ্র ক্যাশবুকের উপর মাথা রেখেছিল। ফোনটা বাজছিল। অবিরাম যেন বাজবে। সে ফোনটা তুলে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন।

—আমাদের ডিজাইনটা।

—একটু ধরুন। জগৎ! জগৎ! ইন্দ্র জগৎকে ডাকতে থাকল।

পিয়ন জগৎকে ডেকে দিলে বলল, ধর্মবীর কোম্পানীর ডিজাইনটা হয়েছে?

—স্যার কোন্ ডিজাইনটার কথা বলছেন?

—আরে গঙ্গা যমুনা পাউডারের।

—হাতে দু'টো ব্লকের কাজ ছিল স্যার।

ইন্দ্র জানত চান্স দিলে জগৎ অন্য অনেক মিথ্যা কথা বলবে। অন্য অনেক অজুহাত দেখাবে। সুতরাং পার্টির কাছে কথা ঠিক রাখাব জন্য বলল, আজ ওটা ওভার টাইমে করে দেবে। করে দিতে হবে। যাও। এবার ইন্দ্র ফোনটা অন্যমনস্কভাবে রাখার আগে বলল, কাল [illegible]। ডিজাইনটা এ্যাপ্রুভ করলে আমরা কাজে হাত দেব। তারপর উইক্‌লি প্রোগ্রাম দেখে বুঝল চোরাবাজার থেকে টিন তুলতে হবে ফের সুতবাং দ্বিগুণ টাকার দরকার। সুতরাং সে একটা সেলফ্ চেক কাটল এবং ডায়াল ঘোরাল। —হ্যাল্লো পি, সি, আর, সি, এ?

—হ্যা স্যাব।

—আপনাদের ব্ল্যাক প্লেট আছে?

—আছে।

—কত গেজের?

—পঁয়ত্রিশ, ছত্রিশ এ্যাসর্টেড।

—দাম কি নিচ্ছেন?

—পুরো দুই স্যার।

—পঞ্চাশ কমবে না?

—হয় না স্যার। কিছু তবে থাকবে না।

ইন্দ্র ওর সহকারী রামপদকে ডাকল। বলল, এটা এখন ভাঙ্গিয়ে

আনবেন। রামপদ চলে যাচ্ছিল, ইন্দ্র বলল, পনের তারিখে একষট্টির সেলট্যাক্স কেস আছে। কাগজ-পত্র সব ঠিক করে রাখবেন। ডিক্লারেশন যেখানে যা বাকি আছে আদায় করে নিন। তের তারিখের ভিতর সব আমার কাছে প্রডিউস করবেন। সহকারীটি মাথা নামাল এবং সম্মতি জানাল। আর ঠিক এ-সময়েই দরজার বাইরে দারোয়ান—পাশে রাস্তা এবং ভীতিকর কর্পোরেশনের বাবুটি আসছেন।

লোকটি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র বলল, দেখুন আমি এখানে নতুন। কার কি প্রাপ্য এখনও ঠিক জেনে নিতে পারিনি। আপনারা সেদিন টাকা চাইলেন দিতে পারলাম না। ব্যাপারটা আমার ঠিক জানা ছিল না।

বাবুটি অসভ্যভাবে হাই তুলছিলেন। একটি কর্কশ কণ্ঠ গলা থেকে বের হতে থাকল। জ্বর জ্বর ভাবটা ফের ইন্দ্রের মাথায় চাড়া দিয়ে উঠেছে। গর্ত ধরে অজগর সাপেরা বাবুটির মুখে ঢুকে যাচ্ছে। সুতরাং ওর শরীর গোলাচ্ছিল। তবু কোন রকমে গলা সাফ করে বলল, আমি এ-ব্যাপারে ওপরয়ালার সঙ্গে পরামর্শ করেছিলাম।

—তিনি কি বললেন ?

—আপনারা পেয়ে থাকেন।

—থাকি মানে, প্রত্যেক বছর পাচ্ছি। আপনি নতুন ম্যানেজার এবং এ-লাইনেও নতুন।

—সব খবর রাখেন দেখছি।

—সব খবর রাখতে হয় স্যার। চোখ কান খোলা রেখে কাজ করতে হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, বেশ ত ছিলেন। এখানে মরতে এলেন কেন।

বড্ড ব্যক্তিগত। সুতরাং ইন্দ্র ফের মুখটা ব্যাজার করে রাখল। ওপরয়ালার মুখ ওকে ভয়ার্ত করেছে। বাবুটিকে শাসনের ভঙ্গীতে কিছু বলতে পারল না। বরং সে খুশী খুশী মুখ রেখে বেল টিপল।

বাবুর জন্য চা এবং মিষ্টি আনতে বলল। আর বাবুটির দিকে চেয়ে বলল, একশ থেকে একেবারে তিনশ করে দিলেন। গতবারও ত হেলথ লাইসেন্স এর জন্য পঞ্চাশ টাকা দিয়েছি। রেকর্ড তাই বলছে।

—আপনার সঙ্গে দেড়শ টাকায় রফা হতে পারে। দু'বছরের জন্য তিনশ টাকা দেবেন। পরে আমাদের পঞ্চাশ করে দিলেই চলবে। এ-বাদে আর কিছু করণীয় নেই।

ইন্দ্র কপালটা টিপে ধরল। জ্বরটা আবার যথার্থই আসছে। ওর এ-সময় অযথা চীৎকার করতে ইচ্ছা হল অথবা কাছাকাছি কোথাও যদি কোন বেশ্যালয় থাকে এবং এই কুষ্ঠরোগী শিউপূজন—বড় পীড়াদায়ক সব কিছু। সুতরাং সবুজ ধানের জমি দেখার জন্য যেন সে জানালাতে মুখ রাখল অথবা সামনে পিছনে কিছুই নেই—অন্তহীন এক অন্ধকার ওকে জীবনের গাফিলতি নামক পাপের ভাণ্ডারে কেবল নিক্ষেপ করছে অথবা দূরে বেশ্যা মেয়েদের চীৎকার এবং কারখানার পাঞ্চ মেশিনের ভয়ঙ্কর আওয়াজ ওকে পাগলা কুকুরের মত তাড়া করছে। ওর সেই নাটকের কথা মনে হল, নাটকে বেরিনজার কাঁদছে, ঈশ্বর আমাকে গণ্ডার কোরনা। আমাকে মানুষ রাখ।

বাবুটি বলল, আপনার শরীর ভাল নেই মনে হচ্ছে।

ইন্দ্র বাবুটির মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, না ভালই আছে। সে দেখল, অজগর সাপের লেজটা বাবুর মুখের ভিতর নড়ছে। লেজ ধরে সাপটাকে টেনে বের করবার স্পৃহাতেই সে যেন উঠে দাঁড়াল। তারপর বাবুটির মুখের অবয়বে সে যেন পড়তে পারল, না, ওটা ঠিকই আছে, ওকে টানবেন না, তবে অনর্থ ঘটবে। সুতরাং ইন্দ্র বসে পড়লে বাবুটি বললেন, চোখ লাল, কাল রাত্রে ঘুম হয়নি বুঝি!

—না ঘুম হয়েছে। ইন্দ্র আর অন্য কোন কথা বলল না। স্ত্রী বাপের বাড়ি যাচ্ছে, ছেলে দুটো যাচ্ছে। স্ত্রীর রুগ্ন শরীর ও কাশে, চোখের নিচটা সর্বদা ফুলে থাকে এবং এই দৃশ্য ইন্দ্রকে শুধু কাতর করছে।

একটা পুরো প্যাকেট পানামা ইন্দ্র টেবিলের উপর রাখল। বাবুটি উদাসীন ভাবে বলল, পানামা চলে না স্যার। উইলস্। সে নিজের প্যাকেট থেকে উইলস্ বের করল। তারপর উদাসীন-ভাবেই সিগারেট টেনে রিঙ ছুঁড়তে থাকল। ফাঁকে ফোকরে দু'-একটা কথা ছুঁড়ে দিল। বলল, বড্ড প্যাচপ্যাচে বৃষ্টি। আর ভাল লাগছে না। একটু রোদের দরকার।

ইন্দ্র কথাটাতে সায় দিল, একটু রোদের দরকার। সে জানালার কাঁচে হাত রাখল—একটু রোদ উঠুক এবার। দীর্ঘদিনের প্যাচপ্যাচে বৃষ্টি ইন্দ্র সহ্য করতে পারছে না। সে ক্যাশ থেকে দেড়শ' টাকা গুনে টেবিলের ওপর রাখল।

বাবুটি বলল, বড় খাম আছে আপনাদের ?

—আছে।

—টাকাগুলো খামে পুরে দিন।

—আপনি একবার গুনে দেখবেন না!

বাবুটি এত জোরে হেসে উঠল, এত জোরে হাসতে থাকল যে ইন্দ্র নিজেকে বড় অসহায় বোধ করতে থাকল।

বাবুটি বলল, এ-ব্যাপারে এই প্রথম।

ইন্দ্র কোন উত্তর করল না। নির্বোধের মত চোখ করে রাখল।

বাবুটি সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গীতে বলল, সব ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যাবে।

ইন্দ্র মাথা নিচু করে রাখল, জীবনে সৎ হবার সকল প্রয়াস এক অতর্কিত আক্রমণে নিঃশেষে যেন মুছে যাচ্ছে। এ-সময় সেই বিদ্যালয়ের সম্পাদকের মুখটি মনে পড়ল—ঠিক যেন এই বাবুটির মত —একটা বড় অজগর সাপ গিলে বসে আছে। ইন্দ্র লেজ ধরে টানতেই সম্পাদক মশাই বলেছিল, ওটা টানবেন না। অনর্থ ঘটবে।

ইন্দ্র বলেছিল তা হয় কি করে।

সম্পাদক বলেছিল, সরকার থেকে অনুমোদিত টাকা ফলস্ ভাউচার করে খরচ দেখান এবং টাকাটা তুলে নিন। তারপর

আমার নামে ডোনেশন দেখান। ল্যাটা চুকে গেল। এবং বাবুটির মুখের অবয়বে যেন এই কথাগুলি লেখা ছিল—বিদ্যালয়ের বিশ হাজার এবং জেলা সমাহর্তাকে সভাপতি নির্বাচন—কিছু হোলসেল ডিলারসিপ, ব্যবসায়ী লোক আমি, সুতরাং ব্যবসাটা ভাল বুঝি।

—আমার দ্বারা এ-কাজ হবেনা। ইন্দ্র যথার্থই লেজ ধরে টান মারল।

—তবে চলে যেতে হবে। ব্যবসায়ী সম্পাদক অমায়িক হেসে বলেছিল কথাটা। প্রভাব এবং প্রতিপত্তির কাছে ইন্দ্র হেরে গেল। অথবা সে জানত সততার জন্য সকলের সহযোগিতা সে পাবে। এবং মনে হল সততা নামক বস্তুটিকে হাড়ির ভিতর রেখে সকলে সাপের খেলা দেখাচ্ছে। সে জীবন ধারণকে সুতরাং কুৎসিত ভাবল। গ্রামের নির্জনতা এবং সবুজ সব ধানের গাছ, হিজলের শ্যামল রঙের প্রকাশ পরিত্যাগ করে এই জনজীবনে সৎলোক হবার-প্রয়াসে ফের ঝাঁপ দিল। সে 'সততার জন্য যুদ্ধ' এই বিজ্ঞাপন পিঠে মেরে কোন অশ্বারোহী পুরুষের মত লম্ফ প্রদান করতে চাইল। অথচ সব কিছুই কৌশলের দ্বারা অর্জিত, বাবুটির কোন দুঃখবোধ ছিলনা এবং পরিশ্রমী পুরুষের মত মুখ করে রেখেছেন—যেন ঘুষের নিমিত্ত প্রাপ্য টাকা পরিশ্রমের দ্বারাই অর্জন করতে হয়। বাবুটির পিয়ন পর্যন্ত সৎব্রাহ্মণের মত চোখ মুখ প্রফুল্ল রেখে বাইরে দারোয়ানের সঙ্গে গল্প করছিল এবং ইন্দ্র ভোরে একজন অশ্বারোহী পুরুষকে উত্তরে চলে যেতে দেখেছিল, একজন কুকুরয়ালা ভদ্রলোককে দক্ষিণে চলে যেতে দেখেছিল…এইসব দেখে স্ত্রীর রুগ্ন শরীর · আমরা ·· ···আমরা তারপর আর কিছুই মনে হচ্ছিল না তার।

বাবুটি এবার খচ খচ করে কি লিখল। তারপর হেলথ লাইসেন্স ইস্যু করে, ট্রেড লাইসেন্স পরে পাঠিয়ে দেব এমত বলে বাবুটি উঠবার সময় বলল, দেখলেন স্যার সূর্য উঠে গেছে।

ইন্দ্র দেখল কারখানার টিনের চাল অতিক্রম করে সূর্য যথার্থই উঠে আসছে। একটা অশত্থগাছ ছিল, কিছু কাক ছিল—ডালে ওরা

কা কা করে ডেকে উঠল। শিওপূজন ওর খাটিয়াতে শুয়ে পড়েছে। ভাঙ্গা চালের নিচে ছোট সঁাতে সঁ্যাতে ঘর। বাইরে কল এবং কল থেকে জল পড়ছে। শিয়রে ওর তুলসীদাসী রামায়ণ। আর ওর রক্ষিতা গত সালে মারা গেছে। ঘরে নেহেরুর একটা ছবি টাঙানো ছিল সুতরাং এই ঘবে নানা রকমের দুর্গন্ধ এবং রক্ষিতার শাড়ীতে কোমল হলুদ দাগ। যখন ঘায়ের গন্ধে ঘুমোতে পাবে না, যখন মাংস খসে খসে শরীর থেকে পড়ে অথবা ওষুধেব জন্য শারীরিক কষ্ট তখনই ওর রক্ষিতাকে মনে হয় এবং শাড়ীতে কোমল হলুদের দাগ ·· কত সযত্নে সে এই ভালবাসার নিদর্শনকে তুলে রেখেছে।

ইন্দ্র দেখল সূর্যের আলোতে জনালাব কঁাচে সেই কোমল হলুদ দাগ। সে সেই কোমল হলুদ রঙেব ভিতর মুখ গুঁজে বসে থাকল। জ্বর জ্বর ভাবটা কেটে যাচ্ছে। অনেক কাজ টেবিলেব উপর। ফাইলেব স্তূপ। সে এক এক করে দেখছিল এবং দুঃখিত হলে সূর্যের কোমল হলুদ রঙ পান করছিল।

সে ফাইলের ভিতর কতক্ষণ মুখ গুঁজে ছিল, কতক্ষণ চিঠিব পর চিঠি, দলিল দস্তাবেজ দেখতে দেখতে এক শীর্ণ নদী রেখা, ছোট বড় টিন কাঠেব ঘব অথবা দুরন্ত বর্ষাকালে ঘন বর্ষণের ভিতব কোড় পাখীর ডাক শুনে—এই জীবন বড় কষ্টদায়ক, জীবনকে বহন করা কঠিন এবং ইচ্ছার দ্বারা আমরা সকলেই পরস্পরেব নফর সেজে আছি এমত এক চিন্তা···ইন্দ্র মুখ তুলে দেখল পিয়ন টেবিলের উপব স্লিপ রাখছে। ইন্দ্র বলল, আসতে বল।

—রাম রাম ববুজী।

—রাম রাম। বসুন।

—বাবুজী হামি বসবে না। একঠো হিল্লে কবে দ্যান।

—আমি ত এব আগেও বলেছি শেঠজী।

—আরে বাবুজী আপ লিবেন নাত হামরা যাব কোথা।

—কি করি বলুন শেঠজী ?

—পুরানা ম্যানেজাব সাবত বাবুজী বন্দোবস্ত লিতেন।

—অন্য কথা বলুন।

—ব্যাওসা বন্ধ হয়ে যাবে বাবুজী।

—কিছু করবার নেই।

সুতরাং শেঠজী মুখটা করুণ করে রাখল।

ইন্দ্র ফের বলল, কোম্পানীর দৌলতে অনেক টাকা কামিয়েছেন। এবার কোম্পানীকে কিছু দিন। ইন্দ্র এইটুকু বলে চুপ করে থাকল এবং কাজের চাপ ভয়ানক, কাজের জন্য কথা বলার ফুসরত কম, সুতরাং নির্দিষ্ট সময় পার হলে ইন্দ্র ঘাড় তুলে বলল, আর কি বলার আছে বলুন।

—বহুৎ দীগকত মে গীব যাবে বাবু।

ইন্দ্র ফের অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। বলল, শেঠজী আপনাদের জন্য কাঁচা চালান করি, আপনাদের জন্য অন্যনামে বিল করি, আর কত খাতির ০ ন

—এটাত বাবুজী সকলেই দিচ্ছে। আপনি দেবেন না লেকিন দোসরা কোম্পানী দেবে। বাবুজী···বলে সে ফের চোখ মুখ করুণ করে রাখল। —রেট থোরা কম করুন। পাশবুক খুলে দিচ্ছি।

আবার সেই জ্বর জ্বর ভাবটা গ্রাস করতে থাকল ইন্দ্রকে। জানালায় এখন নরম হলুদ রঙটা নেই। বরং সূর্যের তেজ তীক্ষ্ণ। সূর্য মাথার ওপর উঠে গেছে। কাকগুলি অশত্থের ডালে ঝুলছিল। খাবার অন্বেষণের জন্য ভিখারী রমণীগণ এই পথ ধরে হেঁটে গেল। ইন্দ্র বলল, ব্যবসা আপনার সঙ্গে হবেনা শেঠজী। আপনি যেতে পারেন। এবং শেঠজী যখন নেমে গেল 'গীদর' এই শব্দটি ইন্দ্রকে স্পর্শকাতর করল। লোকটা টাকার গীদর। এত অর্থের প্রাচুর্য তবু ঘুরে আসবে ফের করুণ মুখ নিয়ে বসে থাকবে। ওর মনে হল এক লিলিপুট অশ্বারোহী ফণিমনসার নিচে আশ্রয় চেয়েছিল, গাছের এক তীক্ষ্ণ কীট ওকে দংশন করেছিল—অশ্বারোহী পুরুষটি তখন উত্তরে ছুটছেন হে ঈশ্বর, মধ্যযুগীয় নাইটদের মত পাপ অন্বেষণ করে—কোন হ্রদের তীরে আমরা ভালবেসে যে অজগর সাপকে

এতদিন লালন করেছি তাকে বজ্রমের দ্বারা নিহত করুন। ইন্দ্র বলল, আমি আর পারছি না। সে টেবিলের ওপর মাথা রাখল। শিবঠাকুর, বিয়ে, তিন কন্যার দান, অথবা সবুজ ধান্য তুফানীর চরে এবং পাখপাখালী সকলেই উড়ে গেছে। শুধু এই নগরীর ইটকাঠ এবং সংসার সমুদ্রের তিক্ত স্বাদ সে বহন করে চলেছে।

এ-সময় সুহাস এল। বলল, স্যার ষ্টেট ইনস্যুরেন্স থেকে সো-কজ করে একটা চিঠি দিয়েছে।

—কেন ?

—কয়েকজন ওয়ার্কার নেওয়া হয়েছে। ওদেব ডিক্লারেশন পাঠাতে দেরী হয়ে গেছে।

—কেন দেরী হল ?

—স্যার যারা নতুন আসে তাদের অনেকে দু-চাব দিন কাজ করেই চলে যায়।

—এটা যথার্থ উত্তর হল না সুহাস।

ইন্দ্র চিঠিটার সব অংশই পড়ল। তাবপর বলল, তাত লেখা নেই। ওরা বলেছে প্রায়ই ওদের ডিক্লারেশন পাঠাতে তোমারা দেরী কর।

সুহাস চুপ করে থাকল।

—লিখে দাও আর হবে না। এ-জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। ইন্দ্র এইটুকু বলে ক্ষান্ত থাকল না। সে জানালার কাঁচ দিয়ে কারখানার ভিতরটা দেখার চেষ্টা করল। কারণ জানালা অতিক্রম করলে বড় উঠোনের মত ফাঁকা জমি এবং এখানে সাধারণতঃ পেকিং-এর কাজ করা হয়, পরে ঘর, বড় বড় জানালা—জানালার ভিতর থেকে মেসিনের কিছু কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে। কিছু কিছু শ্রমিকের মাথা দেখা যাচ্ছে। ইন্দ্র এতদূর থেকেও ধরতে পারল কাজের কোথায় ফাঁকি যাচ্ছে, কোথায় একটি শ্রমিক এখন মালপত্রের ভিতর ঘুপটি মেরে আছে অথবা দিন শেষে উৎপাদনের

হিসাব এবং পরবর্তী সিফটের জন্য চিন্তা এইসব ইন্দ্রকে ক্লান্ত করছিল।

ইন্দ্র বলল, সততার জন্য কোথাও আর যুদ্ধ হচ্ছে না। ইন্দ্র উঠে দাড়াল। সারাদিন এই চেয়ার, মেসিনের শব্দ, ডেবিট ক্রেডিট এবং ভিন্ন ভিন্ন রকমের সমস্যা ওকে কাঠের পুতুল করে দিচ্ছিল। সে কিছুতেই তার কবিতার মত সুখকে আর বাঁচিয়ে রাখতে পারছে না। স্ত্রীর রুগ্ন মুখ সুতরাং ওকে দুঃখিত করে রাখল। সে ওর ঘর থেকে নেমে হেঁটে যেতে থাকল। চারপাশে রঙের গন্ধ, বার্নিশের গন্ধ, সে এইসব অতিক্রম করে প্রিন্টিং রুমে ঢুকে দেখল, গ্যাস চেম্বারের দরজা খোলা, পাশে ছোট্ট ঘরটাতে আর্টিস্টরা বসে ব্লক এবং প্রুফ পেপারে ট্র্যান্‌স্‌ফার তুলছে। এই দৃশ্যটুকু ওর ভাল লাগল। এখন এই ঘরে কাজের নিমিত্ত সকলেই সংগ্রাম করছে যেন কোন তুষার প্রান্তরে ঈশ্বরকে অনুসন্ধানের জন্য নগ্ন শরীরে ওরা হেঁটে যাচ্ছে। ওর দুঃখিত চোখ এবং ঘুষ দেবার নিমিত্ত অপরাধবোধ তুষার প্রান্তরে একটি লাল গোলাপের মত ফুটে আছে। সে হেঁটে গিয়ে ওটাকে কিছুতেই ছুঁতে পারল না।

আর্টিস্টদের একজন অনুপস্থিত। সুতরাং ইন্দ্র প্রশ্ন করল, সূর্য আসেনি?

—না স্যার সূর্য ক্রমশঃ ফুলে যাচ্ছে।

—ডাক্তার কি বলছেন?

—কি বলবেন স্যার! ভেজাল তেলের জন্য এমন হয়েছে।

—খুব ফুলে গেছে!

—হ্যাঁ, স্যার। ঠিক একটা ফোটকা মাছের মত।

ইন্দ্র আর দাঁড়াল না। কাজের ক্ষতি হচ্ছিল। অথচ এইসব ঘটনাই চারিদিকে ঘটছে। দৈনন্দিন এক খবর—মাছ চাল তেল এইসব নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি…মানুষ ক্রমশঃ গবাক্ষ পথে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির জল ধরে রাখার চেষ্টা করছে। সে মনে মনে বলল, এখন সেইসব মধ্যযুগীয় নাইটগণ কোথায়—যারা খেতখামারে এবং

পাহাড়ের উৎরাইয়ে পাপ অন্বেষণ করে বেড়াত। অথবা ইন্দ্র এইসব ঘটনা চোখের সামনে ঘটতে দেখে শুধু হেঁটে বেড়াল। তারপর উঠোনের ওপর যেখানে অশত্থগাছটা ছায়া দিচ্ছে সেখানে দাঁড়িয়ে সহরের বাস ট্রাম দেখতে দেখতে ভাবল এই নগরীর সমস্ত দেহে পোকা এবং মহাব্যাধিতে আক্রান্ত রমণীর মত শুয়ে আছে। সেখানে সে শেঠজীর মুখ দেখতে পেল। সুতরাং ইন্দ্র লোকটার ওপর দুঃখিত হবে কি করুণা বর্ষণ করবে বুঝতে পারল না। কারণ রেলগাড়ী চড়ে স্ত্রী এবং সে যদি কোন দিন, কোন ঘন বর্ষণের পর সবুজ দুর্বাঘাসে পা রাখতে পারত—যদি মানুষেরা শুধু চাষবাস করত অথবা বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান এই গান মানুষকে সরল সহজ করে তুলতে পারত আর জটিল যুদ্ধক্ষেত্রে এখন স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ এই পতাকার বিনিময়ে সত্তার জন্য যুদ্ধ এই পতাকা সকলে বহন করত। সুতরাং ইন্দ্র ওপরের দিকে তাকাল—অশত্থগাছে একটা কাঠবেড়ালী ক্লপ ক্লপ শব্দ করে শুধু লাফাচ্ছে। ইন্দ্র বিস্মিত হল গাছে এখনও কাঠবেড়ালীরা ক্লপ ক্লপ করে ডাকে, এখনও বিচিত্র পাখীরা পাতায় পাতায় উড়ে বেড়ায়। সে কাঠবেড়ালীকে অনুসরণ করে চলল। সূর্য টিন সেডের অন্যপাশে ফের হেলে গেছে। রোদের মিষ্টি ছায়া গাছের পাতার ভিতর এবং নিচে ছড়িয়ে পড়ছে। কাঠবেড়ালীটাকে অনুসরণ করতে গিয়ে দেখল তার সেই গ্রাম্যজীবনের প্রায় সব রকমের পাখীরাই এখানে ইতস্ততঃ বসে আছে অথবা উড়ে উড়ে ডালে ডালে কিচ কিচ শব্দ করছিল....।

—স্যার গাছে কি দেখছেন?

—দেখেছ সুহাস কত পাখী!

সুহাস এই কথায় লজ্জিত মুখ করে রাখল। সে হাসল এবং বলল, স্যার এরা ত এখানেই থাকে।

—গাছটাতে কত পাখী। ইন্দ্র একই কথার পুনরাবৃত্তি করল। তারপর সুহাসের মুখ দেখল এবং বলল, আমি ছুটি নেব সুহাস। আমি মার কাছে যাব।

সুহাস কি বলবে ভেবে পেল না।

সুতরাং সুহাস অন্যকথা বলল, স্যার টাকা ক্যাশ করে আনা হয়েছে। তারপর সুহাস সমবেদনার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকল।

—আমার খুব ইচ্ছে হয় সুহাস কোন এক নির্জন মাঠের ভেতরে মিশে যাই।

গাছের ছায়া ওদের শরীরে এবং মুখে। একজন শ্রমিক বের হবার মুখে ইন্দ্রকে অভিবাদন জানাল। সুহাস তেমনি মুখে সমবেদনার চিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইন্দ্র নিজের এই আবেগটুকুর জন্য এখন সংকোচিত। দূরে জলকলের শব্দ। কোথাও যেন বড় হরফে লেখা পূর্ণ ফোটকা যাচ্ছ। সে নিজের ঘরে ফিরে গেল। সুহাস কিছু বলল না। টাকার বাণ্ডিলগুলো গুনে দেরাজের ভিতর ঢুকিয়ে হাতের বিড়টা আঙ্গুলে ঘোরাতে থাকল এবং অন্যমনস্কতার জন্য গোপনায় ফাইলের লেখা সব অস্পষ্ট। বড় কর্তা এ-সময় আসেন। তিনি তাঁর ঘরে ঢুকে গেলেন। এতক্ষণ ইন্দ্র সকলের কৈফিয়ত তলব করছিল এখন বড় কর্তা তাকে তলব করবেন। ইন্দ্র তৈরী হচ্ছিল। তখন সদর দরজাতে সিগারেটের ঘণ্টা পড়ছে। তখন শিউপূজন ঘরে শুয়ে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়ছে। তখন সূর্য অনেক নিচে নেমে গেছে। বেশ্যা মেয়েরা সাজ গোজ করে দরজায় দরজায় পুতুলের মত পাখী অন্বেষণ করছে। এবং ইন্দ্র এই ঘরে বসে বড় কর্তার ডাকের জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকল যেন ঘুষ, বেসাদারী বুদ্ধি, কোম্পানীর কাগজপত্র এবং বেঁচে থাকার জন্য কৌশল সবই আয়ত্তে আনার চেষ্টা।

একসময় বড় কর্তা বললেন, তুমি দুঃখিত হবে জানতাম। প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হবে।

ইন্দ্র চেয়ারে বসে থাকল। কোন কথা বলল না।

—কত নিল শেষ পর্যন্ত?

—তিনশ।

—আগে পঞ্চাশেই হত। এ-সব লোকাদের হাতে রাখতে হয়

তা ছাড়া জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে, সুতরাং ওদের দোষ কি।

—না কোন দোষ নেই।

বড় কর্তা কি ভেবে বিরক্ত হলেন।—অত খুঁতখুঁত করলে কাজ করতে পারবে না। নিজের জন্য করছ না, কোম্পানীর জন্য করছ।

—তা ঠিক বলেছেন স্যার।

বৃদ্ধ ব্যক্তিটি এবার সোজাসুজি তাকালেন ইন্দ্রের দিকে। বললেন, ইন্দ্র, সততার কথা সব বাবারাই বলে থাকেন। তারপর তিনি খচ্ খচ্ করে একটা চিঠি লিখলেন। বললেন, ওটা কাল ডেভালাপমেণ্ট উইং—দিল্লীতে পাঠিয়ে দেবে।

এখন বৃদ্ধের গোঁফ ঘোড়ার লেজের মত দেখাচ্ছিল। কপালটা চক্‌চক্ করছে। তিনি ফের বললেন, ডেভালাপমেণ্ট উইং-এর ফড়েদের প্রতি বছর মোটা টাকা দিতে হয়। সাহেবসুবোরা নিজের হাতে এ-সব নেন না। ওদের অনেক লোক আছে। না দিলে তুমি ইমপোর্ট লাইসেন্স পাবে না। কোম্পানী বসে যাবে।

—ইন্দ্র বলল, এ-সব কোন হেড-এ দেখানো হয়!

—ট্রেড চার্জেস বলে লিখবে।

—এত টাকা ট্রেড চার্জেস! অডিট?

বৃদ্ধ বললেন, সকলেই সব জানে এবং এ-ভাবেই সংসার চলে আসছে।

ইন্দ্র চেয়ারে বসে থাকল। বৃদ্ধ অন্যান্য সব খাতাপত্র বিল দেখছিলেন। ইন্দ্র ফের সেই জ্বর জ্বর ভাবটা অনুভব করছে। সৎলোকের মুখ আজকাল ভেড়ার মত দেখাচ্ছে এমত একটা বিজ্ঞাপন সে যেন কোথায় দেখেছে। সে উঠে দাঁড়াল। নিজের মুখ দেখল আয়নাতে। সংসার এ-ভাবেই চলে আসছে—আয়নায় সে বৃদ্ধের মুখ দেখতে পেল, আয়নার ও-পাশে সে বিস্তীর্ণ মাঠ দেখল। মাঠে এক অশ্বারোহী পুরুষ এখন কদম দিচ্ছে যেন। এবং এ-সময়ে ভয়ঙ্কর ক্ষুধা, নানা রকম কাজের ভিড়ে দুপুরে খাওয়া হয়নি।

সুতরাং সে একা একা পথে নেমে গেল।

ট্রামে ভীড়। বাসে ভীড়। মানুষগুলো ইঁদুরের মত ঝুলছে। ফুটপাথে রান্না হচ্ছে—কচ্ছপের মাংস। এবং মেয়েটি জল তুলে রাখছে। বৃষ্টি হলে প্লাষ্টিকের চাদরে সব ঢেকে পার্কের ঘরে আশ্রয় নেবে। কচ্ছপের মাংস এখন গন্ধ ছড়াচ্ছে এই ভেজা ফুটপাথে। এক পশলা বৃষ্টির জন্য এখন এই মেয়ের সংসার বড় দুঃখজনক। রাস্তার অন্য পাশে আবর্জনা। সেখানে দু'জন মানুষ সারাদিন ধরে পরশ পাথর খুঁজছে। মাংসের গন্ধ, আবর্জনার গন্ধ আর কিছুদূর হেঁটে গেলে বাসী গো-মাংসের গন্ধ এই সহরকে নিদারুণ লজ্জার হাত থেকে যেন রক্ষা করছে। ইন্দ্র হেঁটে যেতে থাকল। সেই চারজন মাতাল পুরুষের সঙ্গে দেখা হল। ওরা বলল, স্যার কথাটা কি সত্যি?

ইন্দ্র দাঁড়াল।

—স্যার এবার বেটাদের জুচ্চুরি বন্ধ হয়ে যাবে।

ওরা বেশ্যা মেয়ের মৃতদেহ বহন করেছে। ওরা কাঁদছিল। এখন ওরা চেঁচাচ্ছে।—সব চোর সব মাতাল, সব লম্পট আর চোরা কারবারীর এবার গর্দান। এবার সরকার বাবাজী উল্টাবে।

একটা লোক ফিস ফিস করে বলল, স্যার নেতাজী আসছেন।

যে লোকটা বেশী কেঁদেছিল সে বলল, শৈলমারীতে আছেন তিনি।

ইন্দ্র ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হেঁটে যাবার সময় ...কগুলিকে বলল, ভাল করে স্নান করবে আজ। কাল সারাদিন রো· থাকবে। এবং সহসা মনে করতে পারল দেরাজে তালা দেওয়া হয়নি যেন! এতগুলো টাকা! সে পায়ে শক্তি পাচ্ছিল না। ফেরবার উপায় নেই। বৃদ্ধ এখনও সেখানে আছেন। সে হাত উল্টে ঘড়ি দেখল। তিনি আরও এক ঘণ্টার মত থাকবেন। সুতরাং সে ফোন করতে পর্যন্ত সাহস পাচ্ছে না। হয়ত ব্যাপারটা জেনে গেছেন, হয়ত টাকা আর কেউ সরিয়ে ফেলেছে এবং বৃদ্ধ এখন অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে ইন্দ্রকে খুঁজছেন। আর ইন্দ্র এখন এক পরিচিত প্রকাশকের ঘরে বসে বিষণ্ণতায় ভুগছিল এবং খুব অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। চাবি, ঘোলাটে দৃশ্য

—সে ফের নিজের ব্যাগ দেখল। চাবি দেখে, দেরাজে তালা আছে কি নেই এবং অন্যমনস্কতার জন্য সব খোলা রেখে চলে আসা—ওর ভাল লাগছিল না। সে ফোন করতে পারছে না, যেতে পারছে না। —ওপরয়ালা ভয়ানক ক্রুদ্ধ হবেন—এত অন্যমনস্কতা! সে ঘড়ি দেখল। এখন সাতটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি, তিনি আটটায় উঠবেন। সুতরাং ইন্দ্র আটটা বাজলে একবার ফোন করবে অথবা যাবে। সুতরাং মুখে ভয়ানক অপ্রসন্ন ভাব, প্রকাশক ব্যক্তিটি বললেন, তোমাকে বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

ইন্দ্র খুব জোরে হাসবার চেষ্টা করল। নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে চাইল। কারণ সরেজমিনে তদন্ত—তখন আপনি প্রকাশকের ঘরে, তখন আপনি চুপচাপ এবং কথা বলতে পারছিলেন না। এতগুলো টাকা চুরি করে বোকা বনে গেছলেন।

সুতরাং ইন্দ্র বিভিন্ন রকমের সব কথা বলল, যা শুনে সকলেই প্রাণ খুলে হাসতে পারল। অপ্রসন্ন মুখ অথবা শরীর নিয়ে কেউ বসে থাকল না।

কাচারির দারোগা বাবু বলছিলেন—আসামী রোজ এত কথা বলে না। আসামী রাত সাতটার সময় এই এই কথা বলছিল। তাকে অন্যান্য দিনের মত সরল অথবা অকপটচিত্ত মনে হচ্ছিল না। নিজের দুর্বলতাকে পরিষ্কার করার জন্য কিছু পান করেছিলেন··· সো মাই লর্ড··· ইন্দ্র এ-সময় উকিলের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। সুতরাং ইন্দ্র নিজেকে ঘাসের মত অশালীন ভেবে আপাতত কি করা কর্তব্য সব ভুলে প্রায় পাগলের মত কখনও উত্তেজিত, কখনও নির্মল শুভবোধের দ্বারা খুসি অথবা চোখের ওপর রক্ষিতার কোমল হলুদ দাগ আর কি হতে পারত· অশ্বারোহী পুরুষেরা কি আর ফিরে আসবেন না? সে উঠে পড়ল। সে একটু নির্জনতার জন্য হাঁটতে থাকল আর সে হাঁটতে হাঁটতে কোন রক্ষিতার ঘরে গিয়ে উঠতে চাইল।

তখন গীর্জার ঘড়িতে ঘণ্টা বাজছে। ইন্দ্র পাগলের মত

দৌড়তে থাকল। সে আবার শুনল গীর্জার ঘড়িতে কারা যেন কেবলই ঘণ্টা বাজিয়ে যাচ্ছে। সে টেলিফোনে এবার ডায়াল করল, হেল্লো হেল্লো !

—আমি জগদীশ স্যার।

—দেখত দেরাজে তালা দিয়েছি কিনা !

—আছে স্যার।

—তুমি সুখী হও। ইন্দ্র আর কথা বলতে পরল না। সমস্ত ক্লান্তি এই জীর্ণ জীবনের মাঝে ঝরে ঝরে পড়ল।

॥ চার ॥

পরদিন ইন্দ্র ছুটি চাইল বড় কর্তার কাছে।

তিনি বললেন, হঠাৎ ছুটি !

ইন্দ্র বলল, বাড়ি যাব। অনেকদিন বাবা মাকে দেখিনি।

—মা বাবাকে এখানে নিয়ে এস। ওঁদের কলোনীতে ফেলে রেখে কি হবে? বড় কর্তা খুব যত্নের সঙ্গে উপদেশ দিলেন।

—ওদের এই সহর পছন্দ নয়।

—কেন এত বড় সহর, এত সুখ ! তোমার বাসাটাও যথেষ্ট ভাল।

—বাবা দেশ ছাড়বার সময় কিছু বীজ এনেছিলেন স । বাড়ীতে যত রকমের ফলের গাছ ছিল সব রকমের। তিনি তাদের এখানে এনে বড় করেছেন। এইটুকু বলে সে ছুটির দরখাস্তটা টেবিলে পেশ করল।

বড় কর্তা বললেন, বেশ যাবে। কাল চার্জ রামপদকে বুঝিয়ে দাও। তিনি এবার দরখাস্তটার সব পড়লেন। পরে চশমার ফাঁকে বললেন, পনের দিনের ছুটি?

—হ্যা স্যার।

—ছেলে পিলে সঙ্গে যাচ্ছে?

—না, ওরা মামার বাড়ীতেই থাকবে।

অন্ধকার বলে কিছু দেখা যাচ্ছে না। শুধু লোহার ঘটাং শব্দ। চারু দরজার পাশে এক কোণায় পা দু'টো জড়ো করে যেন আকাশ দেখছিল। ইন্দ্র বাইরে হাত রেখে বাতাসের স্পর্শ এবং দূরের সব আলোকিত সহরের ভেতর সেই সব মুখ দেখতে দেখতে ভাবল এই ট্রেনে চড়ে আমরা কোথাও চলে যাচ্ছি। সে চারুর মুখ দেখল— সুন্দর, সতেজ এবং ফুলের মত শরীর চারুর।

ওদের ট্রেনটা একটা ছোট স্টেশন অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে। সব স্টেশন ট্রেনটা ধরছে না। বড় বড় স্টেশন ধরবে—সে এটা জানত। দু একজন যাত্রী উঠলে অস্বস্তি থাকত না—বরং সে আত্মীয়ের মত কথা বলতে পারত। সুতরাং সে কোন কথা বলতে পারল না। সে শুধু বসে অন্ধকারে ঘটাং ঘটাং শব্দ শুনল। সে বসে বসে দূরে গাধার ঘোড়ার অথবা মানুষের মাথায় ঈশ্বরকে চেপে যেতে দেখল। বাইরে অন্ধকার বলেই ঐ-সব দৃশ্য ওর চোখে এত স্পষ্ট ছিল, এত প্রকট ছিল।

চারু দেখল, বাবুজী বড় বেশী মুখ বাইরে ঠেলে দিয়েছেন। বড় বেশী আত্মমগ্ন। বাবুজী সৎ ব্যক্তি এবং মহৎ। সব সে জানে। সুতরাং সে বলল, বাইরে মুখ রাখবেন না। চোখে ময়লা পড়বে।

ইন্দ্র মুখ ভিতরে এনে বলল, আমাকে কিছু বলছেন ?

—বাইরে মুখ রাখবেন না। কয়লা চোখে পড়তে পারে।

—একটু চোখ বুজে ছিলাম।

চারু অন্য কথা বলল, ভোর হয়ে যাবে পৌঁছতে।

ইন্দ্র বলল, স্টেশনে আপনার লোক থাকবে বোধ হয়।

—থাকবে। চারুর চোখ দুটো চক চক করছিল। পাথর বাটির মত চোখ কালো এবং ঘন। ভ্রু মোটা। রঙ কচি আপেলের মত। ট্রেন যেহেতু চলছে এবং প্রকৃতির জলজগন্ধ যেহেতু ভেসে আসছিল আর অনেকদিন পর রাতের মাঠ অতিক্রম করতে পেরে এতদিনের সঞ্চিত গ্লানি সব মুছে যাচ্ছিল। আর এই জন্যই হয়ত ইন্দ্র

প্রগল্‌ভতায় সরব হতে চাইছিল। প্রাণের আবেগে সে তার মুখোস যেন ধরে রাখতে পারছে না—তার বলার ইচ্ছা, দেখেছেন কি নির্জন এই মাঠ! চারিদিকে জোনাকী উড়ছে। ট্রেনের চাকায় গান। সে যেন বলতে চাইছে, আমি গান জানি না চারু, গান জানলে চাৎকার করে এই কামরায় শুধু গান গাইতাম। কারণ এই গান সকল মাঠ অতিক্রম করে, সকল গ্রাম অতিক্রম করে জীবনের সকল ব্যর্থতাকে জয় করার জন্য ছুটত।

তখন চারু বলল, বেশ লাগছে এই ট্রেনের গান।

—বড় অদ্ভুত!

—অনেকদিন পর মামার বাড়ি যাচ্ছি। ট্রেনে চড়লেই জীবনের সব দুঃখ কেমন মরে যায়।

ইন্দ্র এই কথা শুনে সহজ হতে পারল। সে তার মুখোস পাশে রেখে গ্রামের মানুষ হয়ে গেল। সরল অকপট চিত্তে সে বলল, আমি গ্রামের মানুষ। মফঃস্বল সহরে পড়াশুনা করেছি। পড়ার জন্য এই কলকাতায় কিছুদিন ছিলাম। তখন আমার জীবনসংগ্রাম ছিল না কলকাতার দুঃখকে তখন ছুঁতে পারিনি।

চারু বুজার এই কথাগুলোকে যেন ছুঁতে পারল না। সুতরাং সে বলল, বাবু জী ?

ইন্দ্র বলল, আমি মার কাছে যাচ্ছি।

চারু বলল, আপনার মা জানেন, আপনি তার কাছে যাচ্ছেন ?

না, জানাবার সময় পেলাম না। যেন সে এখন কোন যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সংগ্রামী সৈনিকের মত কথা বলছে অথবা সারা জীবন সংগ্রামের পর একটু শান্তির আশ্রয়ের জন্য এখন যেন সে ছুটছে। সে ফের বলল, আমি মার কাছে যাচ্ছি। জীবন ধারণের জন্য আমরা বড় অসাধু হয়ে পড়েছি—সে এ-কথাও বলতে চাইল। কিন্তু চারুর মুখ এখন প্রবীণ মানুষের মত এবং চোখের কোণে, একটু শ্লেষ তাকে আর কিছু প্রকাশ করতে দিল না।

চারু বলল, আপনি দেখছি খুব মা পাগল।

ইন্দ্র এই কথার কোন জবাব দিল না। বরং সে উঠে দাঁড়াল। এইমাত্র ওরা একটা বড় স্টেশন ছেড়েছে। এইমাত্র রাম সিং দিদিমনির তদারক করে গেল আর এইমাত্র স্টেশনের আলোগুলো একে একে সব মরে গেল। সুতরাং ইন্দ্র উঠে গিয়ে দরজায় দু'হাত রেখে দাঁড়াল। ওর অন্য পাশে বড় আয়না। আয়নায় প্রতিবিম্ব এবং সেই প্রতিবিম্ব থেকে ভয় পেয়ে চারু ডেকে উঠল, বাবুজী··· বাবুজী! সে কেমন আর্তনাদ করে উঠল।

ইন্দ্র ছুটে এসে প্রায় ওর পাশে বসল। চারুকে বিচলিত দেখে বলল, কি হয়েছে!

—আপনি ওখানে দাঁড়াবেন না বাবুজী। পড়ে গেলে অনর্থ ঘটবে।

ইন্দ্র হাসল। —ও সেজন্য! সে বলল আমার দু হাতে বড বেশী শক্তি। আমি শক্ত হাতে সব ধরে রেখেছি।

চারু ক্লান্ত গলায় বলল, আমরা সব শক্ত হাতে ধরে রাখতে পারছি কৈ? আমরা·· আমরা·· । সে আর কিছু বলতে পারল না। সে জানালায় মুখ ডুবিয়ে দিল। সে অন্ধকারে ভাঙ্গা চাঁদেব রেখা দেখতে পেল দূরে। আলো আসছে অথবা যেন আলোর ঘর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সে কোন কথা না বলে জানালায় মাথা রাখল। পাশে ইন্দ্র। ওর বলিষ্ঠ প্রত্যয়বোধ পর্যন্ত মেয়েটিকে সুস্থ রাখতে পারছে না। ইন্দ্র চারুর এই ক্লান্তির জন্য অযথা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছে। চারু এখন কোন কথার জবাব দিতে পারছে না। ইন্দ্র তার সন্তানদের জন্য যে আহার্যটুকু সংগ্রহ করেছিল তাই তুলে দিল চারুর হাতে। বলল, খান শক্তি পাবেন।

—চারু বলল, এ যে চকোলেট।

—খান, শক্তি পাবেন।

—বাচ্চাদের জন্য নিয়ে যাচ্ছেন?